চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পরিচয়

১) প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা

ক) রামায়ণ

খ) মেঘদূত

গ) মহাভারত

ঘ) উপসংহার

২) রবীন্দ্র - সমালোচনা

ক) কথাসাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

খ) কবি রবীন্দ্রনাথ

৩) ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের সমালোচনা

৪) আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনা এবং অন্যান্য ।

চতুর্থ অধ্যায়
বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা পরিচয়

বুদ্ধদেবের বহুমুখী সাহিত্যকর্মের মধ্যে শুধুমাত্র সমালোচনা কীর্ত্তি ও যে কোনো সাধারন লেখকের সমগ্র কীর্ত্তির তুলনায় ঈর্ষণীয় হতে পারে। সমালোচনায় তিনি বহু বিচিত্র প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন, বিভিন্ন সাহিত্যে, বিভিন্ন যুগে বিচরণ করেছেন। প্রসঙ্গের বৈচিত্র্যে সঙ্গতি দিয়েছে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর সমালোচনা কর্মকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় —

ক) প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা,

খ) রবীন্দ্র-সমালোচনা,

গ) ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের সমালোচনা

ঘ) আধুনিক বাঙালিকবি ও বাংলা কবিতার সমালোচনা, এবং অন্যান্য সমালোচনা।

প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা

বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩) গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনামূলক নিবন্ধগুলির পরে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার প্রথম সূচনা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। 'উত্তরচরিত' এবং 'দৌপদ্রী' প্রবন্ধ দুটি ছাড়াও 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের কথা এখানে স্মরণ করা যায়। অবশ্য শেষোক্ত রচনাটি নানা কারনে প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা নয়।[১] বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁর মনীষার এবং প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইদানিং পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ধরনের তথ্যাশ্রিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচন শুরু হয়েছে এ তাই।

বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক। মন ছিল প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানমুখী। পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রত্যক্ষ ফল ছিল এসব লেখায়। সাহিত্য বিচারকে কখনো বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে মনের লীলায় পরিণত করেন নি তিনি। সাহিত্যকে দেশ-কালের উর্দ্ধোত্তি তুলে দেন নি। বরং পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মতো ভাবতেন - 'সাহিত্যও নিয়মের ফল'।[২] এই ধারনা থেকে প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে ও প্রাচীন সমাজের নিয়ম খুঁজতেন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যকে এই সমাজের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে ভিন্ন রীতির প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনা দেখা গেল। তিনি এমন অনেক কবিতাও লিখেছেন যাতে এদেশের প্রাচীন সাহিত্য - ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের কাব্যলোক উদ্ভাসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনায় ভক্তি বিনম্র ও সংবেদনশীল মন নিয়ে এগিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, সাহিত্য সমালোচনা হল প্রাচীন কবির কাব্যপূজা।[৩] সাহিত্যের বিচার অপেক্ষা তার ব্যখ্যাই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে। তাঁর এ সব সমালোচনার অধিকাংশই আত্মভাবমুখ্য রচনা বা সৃজনধর্মী সমালোচনা। এ জাতীয় সমালোচনার দৃষ্টান্ত 'মেঘদূত', 'রামায়ণ'। 'রামায়ণে' ভাবসর্বস্বতার ভিতরেও মাঝে মধ্যে যুক্তির রেখাপাত লক্ষ্য করা যায়।[৪] কিন্তু 'মেঘদূত' সর্বত্রভাবেই ভাবনির্ভর সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় জীবনের পূর্নতা, আদর্শ লক্ষ্য করেছেন উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, কালিদাসের নাটকে। আনন্দ, ত্যাগ, সত্য, সৌন্দর্য ও শান্তি এসব যাবতীয় গুনাবলীর মূল উৎস সন্ধান করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে। 'রামায়ণ' সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন —

> যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খন্ডতার সুষমা, সমস্ত
> বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন
> ... 'রামায়ণ' সেই অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে।[৫]

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বে ঐক্যচেতনা প্রবল ছিল। সবকিছুকে একটি ঐক্যবোধে সমন্বিত করে দেখবার বাসনা ছিল তাঁর। আধুনিক জীবনের নানা বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেই ঐক্যানুভূতি অবারিত ছিল না। তাই মাঝে মাঝে তাঁকে অতীত জীবনের মধ্যে সেই ঐক্য খুঁজতে হচ্ছিল। 'মেঘদূত' সম্পূর্ণতঃ সেই ঐক্য ও ঐক্যবিচ্ছিন্নতার আলোচনা। এখানে রবীন্দ্রনাথ একেবারে মেঘদূত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কাল সম্পর্কে আবেগ প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি 'মেঘদূত' কাব্যের কোনো ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ণ করেন নি। কাব্যের টীকা-টিপ্পনীও রচনা করেন নি। 'মেঘদূত' কাব্য তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তাই তিনি মুগ্ধ চিত্তে ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্যের প্রবন্ধগুলিতে কেবল মুগ্ধতাবোধ নেই, আছে রোমান্টিক কবির সৃজনধর্মিতাও। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যগুলি অবলম্বন করে আত্মজগৎ সৃজন করেছেন। সেজন্য এখানে যুক্তিপরম্পরার পরিবর্তে তীব্র অনুভূতির গুরুত্ব। বঙ্কিমের ইতিহাস বা সমাজনির্ভর বস্তুমুখ্য সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের হাতে ভাবমুখ্য হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যের পুণনির্মান করেছিলেন আত্মভাবনার দর্পনে। বুদ্ধদেব এই দুই পথ-ই পরিহার করে গেলেন। কিন্তু সম্পূর্ন পরিত্যাগ করতেও পারলেন না। তাঁর লেখায় নিজের ভাবনার আরোপ এল কালিক দৃষ্টিকোণের ব্যবহারে। প্রাচীন ভারতের সবই মহিমাময় একথা তিনি মনে করেন নি। নিজেই একজায়গায় লিখেছেন —

> তৎকালীন মনীষীরা যেন ধরে নিয়েছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে
> যা কিছু ছিলো, তাই মহিমান্বিত; তাঁরা অতীতকে শ্রদ্ধা করতে
> শিখিয়েছিলেন, যাচাই করতে শেখান নি।[৬]

তাঁর মতে, "এই মনোভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ।"[৭] এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেন নি। সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন; কাটা ছেড়া করে দেখা পছন্দ ছিল না তাঁর। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু প্রাচীন সাহিত্যকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করেছেন। নিছক আত্মগতভাবে তার পুর্ননির্মান করেন নি।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের তিনটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল —

ক) 'রামায়ণ' (১৯৪৭) খ) 'মেঘদূত' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা প্রবন্ধ 'সংস্কৃত কবিতা' ও 'মেঘদূত' (১৯৫৭)
গ) 'মহাভারতের কথা' (১৯৭৪)

প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি সমালোচনার মধ্যে পার্থক্য দশ বছরের আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় রচনার মধ্যে পার্থক্য সতের বছরের। এককথায় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধ লেখার জন্য তিনি ২৭ বছর সময় নিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর চিন্তা চেতনার বহু পরিবর্তন হয়েছে। এজন্য শেষ রচনাটি নানাদিক থেকে পূর্ণায়ত এবং গভীর। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে সেজন্য 'রামায়ণ' প্রসঙ্গ প্রথমে উল্লেখ করা হল।

। ক ।

'রামায়ণ' (১৯৪৭) বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার আগে থেকেই রাম-রাবণের পুরাণ প্রসঙ্গ নিয়ে, বুদ্ধদেব যে ভাবছিলেন, এর প্রমান পাওয়া যায়। 'রামায়ণ' বা 'মাইকেল' (১৯৪৬) প্রবন্ধ ছাড়াও 'রামায়ণে'র কাহিনী নিয়ে তিনি 'রাবণ' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। 'আমার যৌবন' গ্রন্থে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন —

> আমার 'রাবণ' নাটক আমার ঢাকা জীবনের সর্বশেষ রচনা ...
> সবই বলা যায় গতানুগতিক - আমার নতুনত্ব শুধু এটুকুতে যে
> আমার রাবণ পুরোপুরি একটি দুরাত্মা নন্, সীতাকে হরণ করে
> এনে এখন চান হৃদয় দিয়ে জয় করতে - তাঁর মনের একটি অংশে
> তিনি ভাবপ্রবণ।[৮]

এই রাবণকে তিনি বলেছেন 'প্রথাচ্যুত রোমান্টিক রাবণ'।[৯] এমন মনে করা, যেতে পারে যে,

> বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ'কেন্দ্রিক ই পুরাণ চেতনাই পরবর্তী কালের
> পুরাণ অবলম্বী রচনা গুলির অঙ্কুর পর্ব।[১০]

আর তাই বলা যায় প্রথম জীবনের রামায়ণ সম্বন্ধীয় চিন্তা চেতনার স্মৃতি হয়তো শেষ পর্যন্তও তাঁর মনে ক্রিয়াশীল ছিলো।

বুদ্ধদেব বসুর 'রামায়ণ' সমালোচনাকে সূত্রাকারে সাজালে এরকম হতে পারে -

১. কাব্য হিসেবে 'রামায়ণ'
২. কৃত্তিবাস-বাল্মীকির 'রামায়ণে'র পার্থক্য
৩. রাম চরিত্রের আধুনিক ব্যাখ্যা
৪. 'রামায়ণে'র অসংগতি, এবং
৫. 'রামায়ণে'র নবমূল্যায়ণ।

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ'কে দেখতে চেয়েছেন একটি সম্পূর্ন রচিত কাব্য হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিগত রামায়ণস্মৃতি-ছন্দের আনন্দ, কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম

> সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ'।[১১]

কবিতা হিসেবে 'রামায়ণ' তাঁকে অভিভূত করেছিল। বুদ্ধদেবের নিজের কথা

> কবিতার যাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।[১২]

রাজশেখর বসু অনুদিত 'রামায়ণে'র কাব্য সৌন্দর্য, কবিত্বময় বর্ণনার অংশগুলিও বুদ্ধদেবের কবিমনকে আকৃষ্ট করেছে। কবিতার সেই আকর্ষনেই তিনি কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' পড়লেন। বাল্মীকি 'রামায়ণে'র সারানুবাদ পাঠ করলেন। তাই কৃত্তিবাসে এসে বাল্মীকির কবিত্বময় বর্ণনার অংশগুলি বর্জিত হলে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। কৃত্তিবাসের রচনায় রামের দেবায়ণ ছিলো প্রধান লক্ষ্য। ফলে কবিত্বময় বর্ননার অংশগুলি তিনি অনায়াসে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের কাব্যমূল্যকেই গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। একারনে রামায়ণ পাঠের ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের কাব্যকে তাঁর যথেষ্ট মনে হয় নি। রবীন্দ্রনাথও 'রামায়ণে'র কাব্যমূল্য স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে,

> এই 'রামায়ণ' কথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর
> সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে;
> কেবল যে ইহাকে শিরোধর্যে করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের
> মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে,
> ইহা তাহাদের কাব্য।[১৩]

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবোধচন্দর সেনও লিখেছেন —

> 'রামায়ণ' কথা এইভাবে নানা জাতির চিত্তকে রসসিক্ত করিয়াছে।
> বিশ্বমানবের সাহিত্যরস পিপাসু মনের জন্য রাম কথা এক অক্ষয়
> রসভান্ডার রূপে বিরাজমান।[১৪]

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ডকেও যথেষ্ট কবিত্বমন্ডিত রচনা বলেছেন। রাজশেখর বসুর মতে, বাল্মীকি 'রামায়ণে'র কতক অংশ পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন - উত্তরকান্ড। 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ড যে প্রক্ষিপ্ত, সে বিচার ঐতিহাসিকের বা ভারতবিদের বিচার। বিচারে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ন, কাব্য নয়। সেখানে লক্ষনীয় প্রাচীন কাব্যের মূল নির্ণয় করে তার রূপ ঠিক করা। একে Textual সমালোচনা বলা চলে। রাজশেখর বসু যখন এই উত্তরকান্ডকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করেন, তখন তিনি এই ঐতিহাসিকের যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। ঐতিহাসিকের বিচারে 'রামায়ণে'র মূল ক্ষেত্র যে লঙ্কা, তারও স্থান বিচার হয়েছে। 'রামায়ণ' কাব্যও এইরকম একটি স্বয়ংসম্পূর্ন রচনা নয় বলেই তাঁদের মত। Winternitz বলেন, এগুলি,

> Accumulations of very diverse poems of unequal
> value, which have arisen in the course of centuries
> owing to continual interpolations and alternations.[১৫]

রাজশেখরের বক্তব্যও বুদ্ধদেব মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছে - লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষার পর সীতা যদি অযোধ্যায় ফিরে এসে ঘরকন্না করে বাকি জীবন কাটাতেন, 'রামায়ণে'র সমাপ্তি যদি একরম হতো, তাহলে সমগ্র ভারতীয় জীবনে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 'রামায়ণে'র প্রভাব এমন ব্যপক, এমন গভীর হতে পারতো না। যে সীতার জন্যে এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এমন সুদীর্ঘ ও সুতীব্র

উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হ'লো, ছাড়তে হ'লো স্বেচ্ছায়,

এই কথাটাইতো রামায়ণের আসল কথা।[১৬]

অর্থ্যাৎ একজন আধুনিক মানুষের কাছে বিরহ বা বিচ্ছেদ বেদনার তীব্র আবেদন যতটা মূল্যবান সেই আলোকেই বুদ্ধদেব কাব্যের পরিণতি বিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এক অর্থে 'মেঘদূত' কাব্যে মানুষের চিরন্তন বিরহের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের আলোচ্য বিষয় ও সেই বিরহ তত্ত্ব - সীতাকে পেয়েও হারানোয় 'রামায়ণে'র মহত্ত্ব বিচার। অবশ্য একথা ও ঠিক বুদ্ধদেব যে খুব যুক্তিপূর্ণভাবে তথ্যপ্রমাণ সহকারে 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ড সম্পর্কে এমন একটা কথা বলেছেন তা নয়। এ তাঁর ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশ বা Reflection মাত্র। বুদ্ধদেবের বক্তব্য উত্তরকান্ত যে কবির রচনা তিনি বাল্মীকি না হোন্ উত্তরকান্ড 'বাল্মীকি-প্রতিম'[১৭] নিশ্চয়ই। একথা স্বীকার করা এজন্যই অসম্ভব যে আদিকবির সঙ্গে উত্তর কবির ভাবনার অনৈক্য। কিন্তু যে কালে বুদ্ধদেব বসু কাব্য হিসেবে 'রামায়ণ' পাঠ করছেন সে কালের সাহিত্য গঠন বোধ থেকেই এরকম ধারনায় তিনি স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছেন। এ থেকে বুদ্ধদেবের চিন্তার দুটি চিত্র স্পষ্ট হয়।

১) কাব্য হিসাবে 'রামায়ণ' বহুশতাব্দীর গঠন নিয়ে যে অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছে - একালের কাব্য রসিকের কাছে তাকে সমগ্র এবং সম্পূর্নরূপে গ্রহণ করবার ঐক্য তত্ত্ব

২) যে রোমান্টিক বিরহ বেদনা রবীন্দ্রনাথেরও কাব্য আস্বাদনে প্রবল, সেই রোমান্টিক বিরহচেতনাই বুদ্ধদেবের লেখায় ছায়া ফেলে।

এখানে বুদ্ধদেবের ব্যক্তিগত 'রামায়ণ' বোধের পক্ষের বিরহতত্ত্ব বা ঐক্যতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ন হলেও অন্যান্য অংশের সঙ্গে মিশিয়ে পড়লে আরও কিছু কথা এসে পড়ে। প্রথমত, বুদ্ধদেব কৃত্তিবাসের সঙ্গে তুলনায় বাল্মীকির কথা আলোচনা করতে গিয়ে কৃত্তিবাস মহাকবির আত্মা উবে গেছে এরকম মন্তব্য করেছেন। একথা সত্যি বাল্মীকির মহোত্ম ভাব নিশ্চয় কৃত্তিবাসের কাব্যে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই সূত্রে বোধ হয় একথাও বলা যায় যে, যে বিরহ চেতনা তিনি 'রামায়ণে'র উত্তরকান্ডের উপর প্রয়োগ করতে চান সেই বিরহ চেতনাই বাল্মীকির উপর আরোপ করা কিঞ্চিৎ কালাতিক্রম ই হয়ে পড়বে।

কৃত্তিবাসের কাব্যের সঙ্গে বাল্মীকির কাব্যাত্মার পার্থক্যের কথাও উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে। কৃত্তিবাসের কাব্যে বাল্মীকির কাব্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের স্বাদ, পাওয়া সম্ভব নয়। বাল্মীকির সঙ্গে কৃত্তিবাসের পার্থক্যকে দীনেশচন্দ্র সেনও প্রশংসা করেছেন। সতাত্ব, ভ্রাতৃত্ব-ইত্যাদি আদর্শ রক্ষার জন্য কৃত্তিবাসের গ্রহণ বর্জনকে তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, এর ঐতিহাসিক কারন থাকলেও, তৎকালীন বঙ্গসমাজের পটভূমিকায় এর সমর্থন পাওয়া গেলেও এই গ্রহন বর্জনে

আদি কবির আত্মা যে উবে গেলো তাতে সন্দেহ নেই।[১৮]

কৃত্তিবাস এবং রাজশেখর বসুর অনুবাদ পাশাপাশি উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব দুই কবির আত্মগত ব্যবধান স্পষ্ট

করে তুলেছেন। বাল্মীকির কাব্যের অনেক তথ্য কৃত্তিবাস আদর্শ রক্ষার জন্য বাদ দিয়েছেন -

> রাম লক্ষণেরা মাংস খেতেন, সবরকম মাংস খেতেন, ... এমন কি,
> অমাংস ভোজনকেও তারা বলতেন উপবাস। সুরাতেও বিমুখ
> ছিলেন না তারা ...।[১৯]

কৃত্তিবাস সেসব প্রসঙ্গ উল্লেখমাত্রও করেননি। রাম-অন্বেষণে বেরোবার পর ভারতের সৈন্যদলকে ভরদ্বাজ যেরকম আপ্যায়ন করেছিলেন; পান ভোজন এবং অপ্সরাদের সহবাসে তারা যেরকম তৃপ্ত হয়েছিলেন, তাও রাজশেখর বসুর অনুবাদে আছে, কৃত্তিবাসে নেই। ইন্দ্রিয় সুখের প্রসঙ্গে, বাল্মীকির অকুণ্ঠ উপস্থাপনা কৃত্তিবাসের কাব্যে আদর্শ রক্ষার চাপে সংকুচিত হয়েছে, প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> জীবনের যেটা পার্থিব দিক, তাতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা যে
> উদাসীন বা অনিপুন ছিলো না, বাল্মীকিতে তার প্রমান প্রচুর ....।[২০]

বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসে আত্মগত ব্যবধান তো ছিলোই। 'রামায়ণে'র কালের জীবনযাপনের যে আদিম স্বাভাবিকতা তা কয়েকশতাব্দীর নৈতিক শাসনে ক্রমশঃ পরিবর্তিত এবং নীতিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাস যখন 'রামায়ণ' অনুবাদ করেছেন ততদিনে এই নীতিশাসিত আদর্শায়িত জীবনচেতনা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপুষ্ট করেছে। বাংলাদেশের জীবনভাবনার লৌকিকতার উপরে আর্ঘশাসিত জীবনের ছাপ মুদ্রিত হচ্ছে। একে আমরা মধ্যযুগের সাহিত্যে খুব দেখতে পাই। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির জীবনচেতনার উপর এই ব্রাহ্মণ্য নীতিশাসিত জীবনতত্ত্বের প্রভাব দেখি যেমন মালাধরে, কৃত্তিবাসে তেমনই অন্যান্যদের লেখায়। মনে হয়, সেকালের জীবনের উপরে এই প্রভাব পুষ্টির আদর্শায়িত জীবনকে কৃত্তিবাস গ্রহন করেছিলেন। এই কারণে 'রামায়ণ', বাঙালীর সমাজ ও সংসার সংগঠনে খুব কার্যকরী ভূমিকা নিতে পেরেছে।

অন্যপক্ষে, বুদ্ধদেব যে দুই কবির ব্যবধানকে অনুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং বাল্মীকির প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন এর একটি কারণ হয়তো বিশ শতকী জীবনের সর্বৈব ভোগমুখ্যতার পুনঃপ্রবর্তিত ধারার মধ্যে নিহিত ছিলো। ইংরেজ শাসিত এবং ইংরেজী শিক্ষিত মানুষ মধ্যযুগীয় নীতিচর্চার বাইরে পাশ্চাত্যচিন্তাচর্চার মধ্যে পার্থিব জীবনপ্রীতির স্বাদ পেয়েছিলো। রেনেসাঁসের মূলে তো এই পার্থিব জীবনধর্মকে বিশিষ্ট করে তোলাই ছিলো অন্যতম দিক। ফলে, আধুনিক মানুষের দৃষ্টিকোণ যে প্রাচীন পার্থিব জীবন প্রীতির মধ্যে একালের চিন্তার প্রতিফলন খুঁজবে, তাতে সন্দেহ কী? হয়তো এই পার্থিবতাকেই আধুনিকতার একটা দিক বলা যায়। শুধু বুদ্ধদেব নন, সেকালের আরো অনেকেই পশ্চিমের আদর্শে পার্থিব জীবনচর্চাকে বাংলা সাহিত্যের স্রোতোপথে বইয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। এজন্যই কৃত্তিবাসের সংযত, আদর্শায়িত রামকাহিনী বুদ্ধদেবের যথেষ্ট বলে মনে হয়নি। তিনি ফিরে আসেন বাল্মীকির উদার জীবনমুখী 'রামায়ণ' চর্চায়। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে, জীবনের যেটা পার্থিব স্বাভাবিক দিক, তা যেন কৃত্তিবাসে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে - আদর্শের বাঁধারাঁধির চাপে। এইসময় প্রাচীন সাহিত্য ও

ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষন যেমন দেখা দিলো, তেমনই এই সাহিত্য ঐতিহ্যকে সাময়িক জীবনের সঙ্গে মেলাবার একটা প্রবণতাও দেখা গেলো। এই প্রবণতাই বুদ্ধদেবের লেখায় লক্ষ্য করা যায়। তাই তাঁর নাগরিক বিশ্বাত্মমুখী জীবন চেতনার সঙ্গে ফুলিয়ার বাঙালী কবি কৃত্তিবাসকে মেলাতে পারেন নি। তাঁকে কেবলই মনে হয় বড় বেশী প্রাদেশিক, বড় বেশী সংকীর্ণ, যেন তাঁর অশন-বসন-রীতি-নীতি সবই অনেকটা নীচু স্তরের। প্রকৃতপক্ষে আদি কবি বাল্মীকি যে সমাজ সভ্যতার বৃত্তে কাব্য রচনা করেছেন, সেখানে আধুনিক অর্থে না হলেও একধরনের ভোগবাদই মুখ্য ছিলো। জীবন ছিলো মুক্ত-বাধাবন্ধের বাইরে। সেই তুলনায় গোটা মধ্যযুগ ধরে একধরনের বদ্ধ সংকীর্নতা লক্ষণীয় রূপে প্রকট হয়েছে। হৈ পরিবেশের কবি ফুলিয়ার কৃত্তিবাস। কিন্তু, বুদ্ধদেব যে সাংস্কৃতিক পটভূমিকা থেকে 'রামায়ণ'কে দেখেছেন, তার মধ্যে ও আছে পাশ্চাত্য পার্থিবতা প্রভাবিত জীবনচর্চার ইশারা। সেকারনে বুদ্ধদেবের চেতনায় ছিলো বাল্মীকির চিন্তারই প্রতিফলন। তাছাড়া, কৃত্তিবাসকে পুরো একটি কাব্য রচনা করতে হয়েছিলো, যার জন্য প্রয়োজন ছিলো শ্রোতা ও পাঠকের প্রীতিনিষ্ট মনোযোগ। আর বুদ্ধদেবকে লিখতে হলো সমালোচনা। যার জন্য পাঠকের এমন লোকায়িতিক হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিলো না। স্মরণ করা যায় তাঁর 'রাবণ' নাটক কোন নাট্যদলের পছন্দ হয়নি বলেই চলেনি। সুতরাং কৃত্তিবাসের পক্ষে এমনি একটি পরিকল্পনার কী ভবিষ্যৎ হতে পারতো তা সহজেই অনুমান করা যায়।

'রামায়ণ' সমালোচনায় বুদ্ধদেবের তৃতীয় প্রসঙ্গ রাম চরিত্র। রাম চরিত্রকে তিনি 'রামায়ণে'র সবচেয়ে বড় সমস্যা[২১] বলে চিহ্নিত করেছেন। আর সে সমস্যার মূলে আছে রামের সীতা বর্জনের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, রাম একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ -

> 'রামায়ণে' দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।[২২]

'রামায়ণ', 'মহাভারত' সমালোচনাকে তিনি অন্য কাব্য সমালোচনার আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র মনে করতেন। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমাদের ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়।

> সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহন করিয়াছে ... 'রামায়ণে' ভারতবর্ষ কোন আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।[২৩]

'রামায়ণে'র মহিমাকে তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধে নিহিত দেখেন নি। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার জন্য রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, 'রামায়ণে' তাই দেখানো হয়েছে। আর এই আদর্শগুলির প্রায় অধিকাংশের নায়ক রামচন্দ্র। 'বাল্মীকি-রামায়ণ' (সারানুবাদ) গ্রন্থের ভূমিকায় রাজশেখর বসুও রামের সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও দারুন কর্তব্যবুদ্ধিকে বড় করে দেখেছেন। রাম সম্পর্কে লিখেছেন —

যাঁর পিতার তিনশ পঞ্চাশ পত্নী সেই রাম চিরকাল এক ভার্যায়
অনুরক্ত রইলেন - পুরুষের একনিষ্ঠতার এই আদর্শ সেকালের পক্ষে
কত বড়, তা আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে ধারনা করা অত্যন্ত কঠিন।[২৪]

শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন —

কি রাজধর্মে, কি সমাজধর্ম ও কুলাচার, কি পারিবারিক কতর্ব্যনিষ্ঠা -
সর্বত্র রামচন্দ্র শাস্ত্রনির্দিষ্ট নীতির অব্যভিচারী অনুসরণ করিয়াছেন।
কোথাও নিজে দেবত্বের সুযোগ লইয়া মানবিক অনুশাসনের অমর্যাদা
করেন নাই।[২৫]

'রামায়ণী কথা'য় দীনেশ চন্দ্র সেন ও আদর্শনিষ্ঠ রামের কথাই বলেছেন, অবশ্য তিনি লিখেছেন —

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ... তাঁহার চরিত্রের কতগুলি আপাত-
বৈষম্যের সমাঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে।[২৬]

যিনি কৈকেয়ীর কাছে বলেছেন - আমাকে ঋষিগণের মতো বিমলধর্মে প্রতিষ্ঠিত বলে জানবে, তিনিই মায়ের কাছে (কৌশল্যাকে) গিয়ে বিরুদ্ধ নিরশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গীতেও রামচন্দ্রের এই আদর্শনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা বা নৈতিকসত্তা প্রাধান্য পায় নি। তিনি রামের মধ্যে 'সাম্রাজ্যবাদী সীজারের''[২৭] সাদৃশ্য দেখেন। রামকে তিনি শ্রেষ্ঠ 'কূটনীতিজ্ঞ'[২৮] বলেছেন। কূটনীতির সঙ্গে তিনি ধর্মনীতিকে মোটের উপর মিলিয়ে নিয়েছেন। রাজশেখর বসু মনে করেছিলেন, রাজ্যের জন্য রামচন্দ্রের পত্নীত্যাগের ঘটনায় এবং তখনকার হারেমবিলাসী যুগে রামচন্দ্রের সারাজীবন এক পত্নীত্বে অনুরক্ত থাকার ঘটনার মধ্যে রামচন্দ্রের আদর্শ ও একনিষ্ঠতার চূড়ান্ত পরিচয় আছে। এ প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেবের জিজ্ঞাসা —

কিন্তু রামচন্দ্রকে কি আমরা বিচার করবো শুধু তৎকালীন
সমাজব্যবস্থা অনুসারে?[২৯]

তিনি রাজশেখর বসুর অনুবাদ উদ্ধৃত করে দেখালেন সীতার প্রতি রামচন্দ্রের রুচিহীন আচরণ। যুদ্ধের সমাপ্তিতে এত দুঃখে ফিরে পাওয়া সীতাকে প্রথম দেখে রাম বললেন —

তোমার চরিত্রে আমার সন্দেহ হয়েছে, ... আমি মতিস্থির
করে বলছি, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ,
যাকে ইচ্ছা কর, তাঁর সঙ্গে যাও অথবা তোমার যা অভিরুচি কর ...।[৩০]

এর সমালোচনা করে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

ছী-ছী! আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল করে বলে ওঠে ছী-ছী!
কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন ....।[৩১]

এবং এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে রামচন্দ্রকে এতটা নীচে নামাতে হয়েছিলো বলেই তাঁর মানবিক

স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বুদ্ধদেব একালের নৈতিকতা দিয়ে সেকালের জীবনতত্ত্বকে ধিক্কার দিচ্ছেন। সেকালের সঙ্গে একালের পার্থক্য রাখছেন না। এছাড়াও বলতে হয় নিতান্ত একালেও পরপুরুষ দ্বারা হৃত নারীর মর্যাদা খুব বাড়েনি। একালের উচ্চারণ ভিন্ন। রামের মতো স্পষ্ট নয় কিন্তু আচরণ রামের চাইতে কিছু ভিন্নময়। দ্বিতীয়তঃ মহাকবির যে নিরঞ্জন বাস্তবতার তিনি গুণকীর্তন করেন তাকে তো সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেই মনে করি। তৃতীয়তঃ মহাকবির কাছে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক রচনা অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল রামের মহোচ্চ চরিত্র রচনা। সে চরিত্রে ছিল সেকালের জীবনাদর্শ। তাতে নারীর জীবন কী হবে কোন দিকে যাবে তার স্থান নির্ণয় হয় নি বলে প্রাচীন ভারতীয় নারীর প্রতি পুরুষের আচরণের চিত্রে উষ্মা প্রকাশ করা যায় কিন্তু মহাকবির আদর্শ ছিলো যে রামের চরিত্রের নানা দিক উন্মোচন করে দেখানো তা করা হয় না।

আসলে, রামচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুবর্তী দীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়। বরং বুদ্ধদেবের ধারনা খানিকটা স্বতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টিতে রাম মানবিক ত্রুটির বাইরে আদর্শের প্রতিভূ হতে পারে নি। মহাপুরুষ বা অবতার সে নয়। তাঁর চোখে রাম মানুষ, বীর-কর্মিষ্ঠ-ধর্মের খানিকটা অনুগামী। তিনি রাম চরিত্রের সারাৎসার ভেবেছেন এভাবে, রাম কর্মকে মেনেছেন সবার চেয়ে বড় বলে। কর্মের মাহাত্ম্যকেই তাঁর চরিত্রের মূল ভেবেছেন; তবে তাঁর যাবতীয় কর্মই নিস্কাম। নিজের জন্য তাঁর প্রত্যাশা নেই। তাঁর অভিযান ও জয় সমস্তই পরার্থে। এমনকি, নিজের জীবনের সুখ, সম্ভোগ, শান্তিও। তাই তিনি মহৎ। মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতার প্রতীক। তবে, তিনি রামকে যে 'সাম্রাজ্যবাদী' বলেছেন সে প্রসঙ্গে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে। কেননা, কোনো সাম্রাজ্য তিনি গ্রাস করেননি, তাঁর আত্মভোগের জন্য কোনো রাজ্যজয় ও দেখানো হয় নি। বরং প্রজানুরঞ্জন ও দুঃখময় ত্যাগকেই তাঁর জীবনের ব্রতরূপে তিনি গ্রহন করেছেন। আবার, রাম চরিত্রের নবমূল্যায়ণের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু এককথায় আমাদের চিরাচরিত সংস্কারের গায়েই আঘাত হানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই কি সেই সংস্কারের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছিলেন? রামচরিত্র সম্পর্কে একধরনের দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিলো তাই তিনি বলেন —

> তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্বের চিরকালীন আদর্শ যদি না দেখতে পেলাম
> তবে তিনি রাম কিসের।[৩২]

অর্থ্যাৎ রামের অবতারত্বের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আমরা এখানে পেয়ে যাই। আর, সেকারনেই আদর্শচ্যুত রামকে 'অরাম' বলে উল্লেখ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

'রামায়ণ' সমালোচনায় বুদ্ধদেবের আর একটি প্রসঙ্গ হলো রামায়ণের অসংখ্য অসংগতি গুলির আলোচনা। এই অসংগতির কারন নির্দেশ করেছেন অনেকেই। রাজশেখর বসু লিখেছেন —

> রামায়ণ পাঠে কয়েকস্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা অতৃপ্ত রয়ে যায়।[৩৩]

'কাব্যে উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অসংগতির দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে আনেন উপেক্ষিতা উর্মিলাকে। 'রামায়ণে'র অসংগতিগুলির উল্লেখ করে, বুদ্ধদেব বসু এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে, আদি কবি উদাসীন। আধুনিক কালের সচেতন শিল্পী তিনি নন। তাঁর বাস্তবতা এতই বিরাট ও সর্বংসহ যে,

ঘটনা বর্ণনে কি চরিত্রবিত্রণে নিছক বাস্তব সদৃশতার জন্য তিনি ব্যস্ত নন।[৩৪]

উপেক্ষিতা উর্মিলার সঙ্গে তিনি আরও অনেক উপেক্ষিত চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। শিল্পীর উপেক্ষা লক্ষ্মণের প্রতিও। বনবাস যাত্রার সময়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস কিংবা একটু বিদায় পর্যন্ত নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হ'ল না তাঁকে। কৈকেয়ী সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে বুদ্ধদেবের মনে - রামকে অকারণে বনবাসে পাঠিয়ে, পরে একবারও কি তাঁর অনুশোচনা হয় নি? আবার, 'রামায়ণে'র মুখ্যচরিত্র রামের মধ্যেও বুদ্ধদেব শিল্পীর উপেক্ষা লক্ষ্য করেছেন। কেননা, প্রেমিক রামের পূর্ণচ্ছবি রামায়ণে নেই। তাঁর দাম্পত্য জীবনের সুখচ্ছবি ক্ষুদ্র, প্রায় সারাজীবন রামকে কাটাতে হয় সীতা বিরহে। যে রাম রাজধর্মের তাগিদে সীতাকে বিসর্জন দিলেন, অন্ততঃ হৃদয়ধর্মের তাগিদে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস স্পষ্ট করতে পারতেন কবি। অবশ্য এসব প্রশ্নের উত্তরও বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রবন্ধে যথাসাধ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, হয়তো এই উদাসীনতা, এই উপেক্ষাই শ্রেষ্ট নিরীক্ষা; হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি অব্যর্থ সন্ধান ছিল যা আদিকবিকে চিরকালের শিল্পী করে তুলেছে। বুদ্ধদেব বসু তাই বলেন যে এসব প্রশ্নের উত্তর আছে প্রতি রামায়ণ পাঠকের হৃদয়ে। আর - 'সেই হৃদয়লিপির রচয়িতাও রামায়ণের কবি।'[৩৫] কেননা,

> আদিকবির শিল্পহীনতার চরম রহস্য এইখানে যে .... তিনি নিজে
> যা বলতে ভোলেন সে কথা রচনা করিয়ে নেন আমাদের দিয়ে।[৩৬]

এমনও সম্ভব যে, কোনো মহাকবিরই এমন ছোটখাট বিষয়ে যথা উর্মিলার কাছে লক্ষ্মণের বিদায় প্রার্থনা-রামের বনবাসে কৈকেয়ীর দুঃখ - মনোযোগ দেবার অবকাশ ছিল না। কারন যে বৃহত্তের সংগীত তাঁদের কাব্যে রচিত হচ্ছে তাতে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাবগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব বা অনুপযুক্তও বটে।

সাহিত্য হিসেবেই বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র রসবিচার করেছেন। 'রামায়ণে'র মতো প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনায় তিনি পূর্বতন সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন নি। ভারতবর্ষের আবহমান কালের চিরাচরিত ধারনার বশবর্তী না হয়ে তিনি সম্পূর্ন ভিন্নভাবে রামচরিত্র এবং রামকাহিনী উভয়কেই বিচার করেছেন। 'রামায়ণে' পরিবারের আদর্শ চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন দীনেশ চন্দ্র সেন। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন 'গৃহাশ্রমের কাব্য'।[৩৭] বুদ্ধদেব বসু এঁদের বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারেন নি। কেননা, 'রামায়নে'ই আছে ঘরের শত্রু বিভীষণ - কুভ্রাতা, বালী,-পত্নী তারা -সাধ্বীচ্যুতা। এঁরা অনার্য বলে এঁদের কথা বাদ দিলেও অন্য অনেক চরিত্রই আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল।

> ইক্ষ্বাকু বংশজাত দশরথ ভার্যার মান ভঞ্জনের জন্য মোহাচ্ছন্নভাবে
> বলেছেন - 'বলো কোন অবধ্যকে বধ করতে হবে, কোন বধ্যকে
> মুক্তিদান করবো? (অযোধ্যা : ১০:১৩)[৩৮]

বুদ্ধদেবের প্রশ্ন —

> সেই দশরথ কি গৃহপতির ভূমিকায় চলনসই রকম ও ভালো?[৩৯]

আবার, নিজের স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্মণের, নিষ্ঠুর উদাসীনতা, এবং ভ্রাতৃবধুর প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক আকর্ষনকেও বুদ্ধদেব আদর্শনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত মনে করেন না। 'রামায়ণ'কে তাই তিনি আদর্শ পারিবারিক চিত্র বলতে চান না। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, ভারতীয় গৃহাশ্রম নিজের সুখ-সুবিধা, স্ত্রী-পুত্র নিয়েই নয় - সেই গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারন করে। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে তাত্ত্বিক দিকে থেকে মেনে নিয়েও বুদ্ধদেব বলেছেন যে, - গৃহের কেন্দ্রবিন্দুটি নিভৃত ও ঘনিষ্ঠ, অল্প কয়েকটি সহবাসী ও সহযোগী মানুষকে ঘিরে ঘিরেই তা গড়ে ওঠে ও সমাজকে আতিথ্য দেবার মতো বল প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের গৃহ রচনার অবকাশ রামের জীবনে অল্পই এসেছিলো। পারিবারিক সম্পর্ক বলতে আমরা যা বুঝি, রাম সেভাবে সম্পর্কে ধরা দেননি কখনো। তিনি সবসময় মহত্ত্ব দ্বারা মন্ডিত হয়ে আছেন। যেখানে তিনি পুত্র বা পতি বা ভ্রাতা, সেখানেও তিনি প্রভাবশালী লোকনায়ক। তাঁর সঙ্গে কারো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নেই। রাম-লক্ষ্মণের সম্পর্ক

> দুই সমকক্ষ ভ্রাতার নয়, আদেশ কর্তা প্রভু ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যের।[৪০]

পিতার মৃত্যু সংবাদে রাম বিচলিত হয়না খুব বেশী। পত্নীকে বিনাদোষে ত্যাগ করেন নির্লিপ্তভাবেই। বহুদিন পরে নিজের পুত্রদের সামনে পেয়েও আবেগে ব্যাকুল হয়ে কোনো গদগদ ভাষণ নেই তাঁর মুখে। রাজা, যোদ্ধা, সত্যব্রত বীর, আর শেষপর্যায়ে নিঃশোকভাবে যজ্ঞপরায়ণ - এইসব প্রধান ভূমিকায় রামকে দেখে দেখে আমরা এতদূর পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়েছি যে; চেষ্টা করেও কোনো অন্তঃপুরে বা গৃহাঙ্গণে তাঁকে ধরাতে পারি না - কেবলই মনে হয়, গার্হস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত বেশী মহৎ তিনি, অত্যন্ত বেশী বৃহৎ'।[৪১] তাই, বুদ্ধদেবের মতে বাল্মীকি সচেতনভাবে কোনো গৃহাশ্রমের কাব্য লেখেন নি। তাঁর রামায়ণ ঘোষিত ভাবে এক মহাপুরুষের জীবনচরিত।[৪২]

বুদ্ধদেব বসু রামায়ণের যে সমালোচনা করেছেন তাতে কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'রামায়ণে'র মতো ধ্রুপদী সাহিত্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আদি কবির ক্লাসিক্যাল নিরঞ্জন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। অথচ শুদ্ধ, সত্য, সেই সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কথা বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং সবসময় মনে রাখেন নি। 'রামায়ণে'র খুঁটিনাটি অসংগতি গুলির সবিস্তার সমালোচনা করেছেন তিনি। রাবণ বধের পর রাম যেরকম কটু ভাষায় সীতাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার সমালোচনা করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ছী - ছী! ... কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা
> পেরেছিলেন কী করে।[৪৩]

ধ্রুপদী কবির অসচেতন সহজ সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির কথা মনে রাখলে বুদ্ধদেব এ প্রশ্ন তুলতেন না। সীতার প্রতি রামের এই আচরণ যে হৃদয়হীন, রুচিহীন একথা তিনি বলতে ভোলেন না। আবার, যে রামচরিত্রের নবমূল্যায়ণ করে তিনি বলেছেন —

> দেহধারী মানুষ হয়ে, স্থানে ও কালে সীমিত হয়ে যতটা মুক্ত,
> শুদ্ধ ও সম্পূর্ন হওয়া সম্ভব, রামচন্দ্র তাই। ... এমনকি,
> মনুষ্যত্বের অবমাননা থেকেও তাঁর রক্ষা নেই।[৪৪]

সেই তাঁকেই বলতে শুনি -

> আমার মনে হয় যে, রামের দিক থেকে সমস্তটাই ছল। সমস্তটাই
> লীলা, ... সীতাহরণটার আর কিছু নয়, শুধু রাবণবধের ছল।
> আর রাবণ বধও আর কিছু নয়, শুধু রামের কর্ম উদ্‌যাপনের উপলক্ষ।[৪৫]

একথা স্বীকার করলে যেন চিরপুরাতন ভারতীয় লীলাবাদে প্রছন্ন বিশ্বাসের ইঙ্গিতই ফুটে ওঠে। বুদ্ধদেব বসু আরো বলেন যে সীতা উদ্ধারের ঘটনা উপলক্ষ, 'লক্ষ্য হল রামের সর্বাঙ্গীন মরত্বভোগ।' [৪৬] শুধু মরত্বভোগের জন্যই যদি রামকে দেহধারন করতে হয়, এবং তাঁর কার্যকলাপকে যদি 'লীলা' বলেই মনে হয়, তবে দোষে গুণে জড়িত মানুষ বলে আর তাঁকে ভাবা যায় না।

বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ' সমালোচনার ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা নিয়েছেন। (১) চিরকালীন আদর্শে মানুষ হিসাবে রামের গুরুত্ব দেখানো বা বিচার করা এবং (২) আদি কবির আদি Classic দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 'রামায়ণ' বিচার। যদি আদি কবির আদি Classic দৃষ্টিভঙ্গির উত্থাপন করতে হয় তাহলে, সেকালের আদর্শ না এসে পারে না। শম্বুক বধ বা অন্যান্য কাজ সেকালের আর্য-বিধিতে অন্যায় ছিলো না। অন্যায় একালের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। বুদ্ধদেব বসু একালের সঙ্গে আদি কবির দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন।

বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ' সমালোচনার মূল কারণ দুটি। প্রথমতঃ মাইকেলের 'রামায়ণ' সম্বন্ধে প্রথাবিরোধী ভাবনার সীমাবদ্ধতা বুদ্ধদেবের চোখে পড়েছিল। রাজশেখর বসুর 'রামায়ণে'র সারানুবাদ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াকে বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ' সমালোচনার দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল মাইকেল ছিলেন 'প্রথাভীরু'[৪৭] সে কারণে 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন কেন। সম্ভোগের জন্য?'[৪৮] এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। রাজশেখর বসু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। উত্তরে লিখেছিলেন — 'বলবান লম্পট চিরকাল যা করে থাকে রাবণও তাই করেছেন।'[৪৯] বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রামায়ণ' প্রবন্ধে লিখেছেন যে রাজশেখর বসুর বইখানিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করে তাঁর মনের মতো উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন না।[৫০] রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন সীতাকে সম্ভোগের জন্য - এরকম ভেবে নিলে রাবণের মহত্ত্ব নয় দুশ্চরিত্রতাই প্রতিপন্ন হয়। মাইকেলের কাব্যে প্রোথিত এই জিজ্ঞাসার একটা আনুমানিক উত্তর বুদ্ধদেব দিতে চেয়েছেন এইভাবে -

> এরকম অনুমান করতে বাধা নেই যে রাবণ সত্যিই সীতাকে
> ভালোবেসেছিলেন, আধুনিক অর্থে ভালোবেসেছিলেন; তাহলেই
> রাবণের ব্যবহার আমাদের চোখে সংযত লাগে, এবং তাঁর চরিত্রে
> মহত্ত্বের সম্ভাবনাও আমরা দেখতে পাই।[৫১]

অর্থ্যাৎ, সম্ভোগের জন্যে নয়, ভালোবেসেই রাবণ সীতাকে অশোকবনে একাকিনী রেখেছিলেন। কিন্তু, বুদ্ধদেবের এই স্বকপোলকল্পিত উত্তর প্রসঙ্গে একটি কথাই বলা দরকার যে তাঁর মতো আধুনিক ভালোবাসার তত্ত্বে বিশ্বাস করতে হলেও অন্ততঃ এটুকু প্রয়োজন ছিলো যে রাবণ একলহমার জন্যে হলেও সীতাকে

আগে দেখেছেন - এ ধরনের কোনো সূত্র 'রামায়ণে' নেই, বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রবনজাত প্রেম এক্ষেত্রে কাজে লেগেছে কিনা বুদ্ধদেব বসু এরও কোনো ইঙ্গিত দিয়ে যান নি। আর তাই একথা বলা যায় যে তিনি তাঁর নিজের মতো করেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজেছেন।

বুদ্ধদেবের এই প্রবন্ধটি ১৯৪৭ সালের লেখা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আর গোটা পশ্চিম জুড়ে নেমেছে যুদ্ধ শেষের ক্লান্তি আর হতাশা। দুদিক থেকে জীবন কেবল যাপনের মাত্রা পাচ্ছে। একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে দুদিনের জীবন সম্ভোগ। যে বিরাট যুদ্ধের ভয়াবহ বৈনাশিকতা মানুষের জীবনের সব মুহূর্তে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তা এই জীবনের স্থিতিকে একেবারে নাড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে গেল জীবনের স্থায়িত্ব কিছু নেই। তাই কেবল জীবন সম্ভোগ। জীবনকে নিয়ে হাসিকান্নার খেলাঘর গড়ে তোলাই হল একটা লক্ষ্য। আর একদিকে এসে ঘিরেছে এই জীবনের সারহীনতা। একটা বিষন্নতা, একটা প্রবল ঔদাসীন্য জীবনকে গ্রাস করেছে। পশ্চিমের এই ভাবনা ছড়িয়ে পড়েছিল তখনকার সাহিত্যে এবং দর্শনে। তার রেশ এসছিলো এদেশে। মনে করতে পারি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিমী সাহিত্যের আবহাওয়ায় জন্ম নিয়েছিলেন এদেশের আধুনিকেরা - তারই লালন চলছে এই মধ্যবর্তী পর্বে। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিধ্বংসী হাওয়া সব মানবিক উচ্চারণকে স্তব্ধ করে দিয়ে এই জীবনের ক্ষণিকত্বকেই যেন স্পষ্ট করে দিল। বুদ্ধদেব এই আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছিলেন বলেই ব্যক্তিগত ভাবনার দর্পনে তিনি 'রামায়ণে'র ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে রবীন্দনাথের রামায়ণ সমালোচনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কম। পার্থক্য শুধু এইখানে যে রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'রামায়ণ'কে ভারতবাসীর চিরকালীন এক সাহিত্য বলে ধরে নিয়েছেন, বুদ্ধদেব বসু সেখানে আধুনিক চিন্তা, চেতনা ও মননের মধ্যে মহাকাব্যের উত্তর প্রত্যাশী। বুদ্ধদেব তাঁর কালের ভাবনার আলোয় 'রামায়ণ' পাঠ করেছেন, 'the good and the beautiful' এর তত্ত্বের ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে তৎকালীন 'poetry as a text' এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যাকে 'New Criticism' এর দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়, সেদিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে তাঁর সমালোচনাও একপ্রকার 'Impressionistic criticism' যা রবীন্দ্রনাথের মতো এতোটা ভাবোত্তেজিত না হলেও আত্মভাবময়।

। খ ।

উনিশ শতকে প্রাচীন সাহিত্যের দিক চোখ ফেরানো শুরু হয়েছিল ইংরেজদের প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য চর্চার অনুসরণে। বিশেষ করে কালিদাসকে সারা পৃথিবীর মানুষ তখন আবিষ্কার করেছিল। কালিদাসের 'শকুন্তলা'র মাধ্যমেই সারা পৃথিবীর কাব্য রসিক মানুষের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের মুগ্ধ পরিচয় হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে কালিদাসের আলোচনার একটা ধারাবাহিতকা ছিল। তবে নব্যশিক্ষিতেরা তাঁকে ততটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের কাছে শেক্সপীয়ার ছিলেন বড় কবি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমূখেরা ছিলেন এই ধারার মানুষ। বিদ্যাসাগর অবশ্য কালিদাসের কবিত্বকে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় উপস্থাপনযোগ্য ভেবেছিলেন। বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকে চন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত কালিদাস সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরান্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি শেক্সপীয়ারের সঙ্গে কালিদাসের কবিপ্রতিভার তুলনার একটি ভালো দৃষ্টান্ত।

উনিশ শতকের এইসব চিন্তাচর্চায় ক্রমশঃ প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হচ্ছিল। ক্রমশঃ বাঙালীর জীবনে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছিল। এর কারণ মনে হয় পাশ্চত্য ভাবপ্রেরণোর জায়গায় ভারতীয় ভাবপ্রেরণার প্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমে দুই প্রেরণার একটা সমানুপাতিকতা রক্ষার চেষ্টা ছিল। কিন্তু ঝোঁক ছিল প্রাচ্যাদর্শের দিকে। রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন পাশ্চত্য কাব্যপ্রেরণা নিয়ে। কবি শেলী, কীটস প্রমূখের রোমান্টিক দর্শন তাঁকে আবিষ্ট করেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা মোড় ফেরাও শুরু হয়েছিল। ভারতীয় দর্শন এবং কাব্যসাহিত্যের দিকে তিনি প্রবল আগ্রহে তাকিয়েছিলেন। এর ফলে যেমন প্রাচীন উপনিষদ গ্রন্থাবলী, তেমনি কালিদাসও নূতন করে আবিষ্কৃত হয়েছেন।

প্রাচীন ভারতের চিত্তদূতরূপে কালিদাসকে একালে আবিষ্কার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর লেখায় কালিদাসের প্রসঙ্গ প্রচুর। কেবল 'মেঘদূত' নিয়েই ১১টি রচনার উল্লেখ করেছেন ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫২] কালিদাসের কাব্যরীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির পার্থক্য ছিলো।[৫৩] তিনি কালিদাসের কাব্যের অন্তর্গত বস্তুরূপের ভাবটুকুকে একালের দৃষ্টিতে উন্মোচিত করেছেন। 'মেঘদূত' কাব্যে তিনি যে বিরহের চিরকালীন ব্যঞ্জনা সন্ধান করেছেন কালিদাসের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বার কথা নয়। কালিদাস বিশেষের অন্তরে নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা খোঁজেন নি,এর কাব্যিক ভাবভূমিতে তাঁর সঞ্চারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক ভাবনার সেই নির্বিশেষ ভাবরূপকে এই 'মেঘদূত' কাব্যের মধ্যে খুঁজলেন। মেঘদূত নিয়ে তাঁর প্রথম লেখা 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' (১৮৯০) কবিতা। সেখানে যে চিরন্তন বিরহ, প্রাচীন ভারতের যে সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে সেই সৌন্দর্যের অলকাপুরীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। তাই গদ্যভাষায় লিখলেন দু'বছর পরে ১৮৯২ সালে। 'মেঘদূত' প্রবন্ধে 'প্রাচীন সাহিত্যে' যা সংকলিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূতে'র যে সমালোচনা করেছেন, তা কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যপাঠের ভাবোত্তেজিত প্রতিক্রিয়া। 'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষের বিরহকেই তিনি সঞ্চারিত দেখেছেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয়লোকে। তাহলেও, রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘদূত অবলম্বনমাত্র। মেঘদূতকে কেন্দ্র করে তিনি একটা চিরন্তন বিরহের ধারনা গড়ে তুলেছেন। তাঁর নিজস্ব আনন্দ ও সৌন্দর্যের দৃষ্টি থেকেই 'মেঘদূত' কাব্য ব্যাখ্যা করেছেন।

> "রসভোগ তাঁর মূল উদ্দেশ্য এবং রসভোগের জন্য তিনি
> মেঘদূতকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।"[৫৪]

এখানে 'মানসী' কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি স্মরণ করা যায় যেখানে তিনি অনুরূপ ভাবই অবলম্বন করেছেন। তাঁর 'মেঘদূত' প্রবন্ধে আছে, প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য চেতনার সঙ্গে আধুনিক সৌন্দর্যহীন সংসারের প্রতিতুলনা। একটা বিরহের ভাবাত্মক ধারণা এই কাব্যটিকে অবলম্বন করে গড়ে তোলা হয়েছে। সে বিরহ যেমন অতীত ও বর্তমানে, তেমনি মানুষে মানুষে, আবার তা মানুষের অন্তরে ও বাইরে। আর কেবল শিল্পবস্তু এই বিরহের দুই কোটির মধ্যে একটা সেতু রচনা করে। তাই সমালোচনা হিসেবে 'মেঘদূত' আত্মগত ভাবোচ্ছাসে পরিপূর্ন এক নতুন সৃষ্টি, — Creation within a creation.

অনূদিত কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' শিরোনামে বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হ'ল ১৯৫৭ সালে। রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত লেখার প্রায় ৬৫ বছর পরে। ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যে দুটি পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু আর সেই সঙ্গে সাহিত্যে রবীন্দ্রভাবিত চিরবিরহের তত্ত্ববোধেরও মৃত্যু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতা বোধের পাশে পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদ এবং জীবনের ক্ষণিকত্ববোধ এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তাই 'মেঘদূত' সমালোচনায় পূর্ববর্তীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিন্তার পার্থক্য ঘটেছে। এ পার্থক্য নিম্নরূপ —

১) রবীন্দ্রবেতনায় বিরহ বলয়ের বাইরে গিয়ে ভাবনা
২ রোমান্টিক কবির মনের নিরিখে না দেখে বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা, আর
৩) যুগজীবনের ধর্মে, কবির মনোধর্মে এবং নতুন কাব্যবোধের ধর্মে স্বাতন্ত্র্য।

এই তিনটি বিষয়ের কথা মনে রেখে বুদ্ধদেবের 'মেঘদূত' সমালোচনাকে দেখতে হবে।

তর্কাতীত হলেও বুদ্ধদেব আরও একবার কালিদাসের অসাধারণ কবিত্ব শক্তির কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর প্রবন্ধে। 'মেঘদূত' কাব্যগুণে লোকপ্রিয় হয়েছে। সংস্কৃত কবিতাকে সামগ্রিকভাবে বুদ্ধদেব বলেছেন কৃত্রিম। আর, এই কৃত্রিমতার মূল কথা হল শব্দ, চিত্রকলা, উপমা সবই একটা তৈরী করা আদর্শের অনুসরণকারী। একে এলিয়ট তাঁর 'Whatis classic' প্রবন্ধে maturity নামে অভিহিত করেন। পরম কৃত্রিম আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কবিতা কত ভালো হতে পারে তার নিদর্শন আছে 'মেঘদূত'-এ। এতে ব্যকরণের চাতুরী থাকলেও কাব্যগুণ এত বেশী আছে যে পাঠকের পক্ষে দুস্পাঠ্য মনে হয় না। 'মেঘদূতে'র সঙ্গে সংস্কৃতে লেখা বাল্মীকি-রামায়ণের তুলনায় 'মেঘদূতে'র দৈর্ঘ্য অনেক কম বলে তা পাঠকের পক্ষে ভার হয়ে ওঠে না। এই ব্যস্ততার যুগেও একে বার বার পাঠ করা যায়।

কালিদাসের কবি মানসিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যবোধ অত্যন্ত প্রবল। আধুনিক কবিদের মতো তিনি নিজেকে অপূর্ব ও নতুন মনে করেন না। তিনি নিজেকে জানেন এক দীর্ঘ কবিবংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে। এই কবিবংশের উত্তরাধিকার তত্ত্ব আছে এলিয়টের 'Tradition and Individual Talent' প্রবন্ধে। এলিয়ট বলেছেন প্রত্যেক কবিকেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে একটা স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। ক্লাসিক কবিকে তো বিশেষ করে যুগমানসের পরিণত মন এবং ঐতিহ্যবোধকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠতে হয়। তাই কালিদাসের স্বীকারোক্তি কোনো নতুন বিষয় উন্মোচিত করে না বলেই আমাদের মনে হয়। 'মেঘদূতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> "এই কাব্য আদিরস ও করুণসের এক বহুবর্ণ সন্নিপাতরূপে আমাদের
> মনে প্রতিভাত হয় .... এই সমন্বয় সাধনে বাল্মীকির আদর্শ কত
> কাজে লেগেছে, তার প্রমান স্তরে স্তরে পাওয়া যায়।"[৫৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি বাৎস্যায়ণ, অশ্বঘোষ ও ব্যাপকভাবে বাল্মীকির 'রামায়ণে'র কাছে ঋণী। তিনি প্রাচীন সাহিত্যের ধর্মরূপে আদি ও করুণ দুইরসের প্রায় যৌগপত্য দেখাচ্ছেন। 'রামায়ণ', 'বুদ্ধচরিতে'র প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং 'মেঘদূতে'র তুলনা আসছে এই রসযুগলের অঙ্গাঙ্গী উপস্থাপনার দিক থেকে। আর এর মধ্যে দেহাচেতনা সম্বন্ধে আধুনিক কবিদের যে বোধ তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিংবা এই বোধকেই বুদ্ধদেব কাব্যের মধ্যে খুঁজেছেন। ফলে, নিজের যুগচৈতন্যের সম্প্রসারণ হিসেবে 'মেঘদূতে'র মধ্যে সেই চিন্তা চর্চাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বিরহ ব্যাথার প্রথম উচ্চারণও তিনি দেখেছেন বাল্মীকিতে। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পরে রাম সর্বভূতে সীতার প্রতিরূপ দেখতে লাগলেন। রামের সেই আকুলতা যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত কবিতায় প্রতিধ্বনিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েছে। 'উত্তর মেঘের' প্রথম শ্লোকেও বাল্মীকির প্রতিধ্বনি আছে। অলকায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন লঙ্কাপুরীর একাধিক লক্ষণ। যক্ষের উন্মত্ততা দেখে কিস্কিন্ধ্যাকান্ডের রামকে এবং তার পত্নীকে দেখে সুন্দরকান্ডের সীতাকে মনে পড়ে। শিল্পতাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন প্রতিভার লক্ষণ হল নানা বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে কেন্দ্রগত ঐক্যিটিকে অনুধাবন করবার ক্ষমতা। বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র সঙ্গে মেঘদূতের এই বিরহ-কারুণ্যগত সাদৃশ্য বা ভাবৈক্য খুঁজেছেন। এই দুইয়ের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত ঐক্য দেখাতে তিনি বিরহকাতর সীতা আর যক্ষপ্রিয়ার তুলনা দেখালেন। তাহলেও 'মেঘদূত' কাব্যে 'রামায়ণে'র প্রভাব কত ঘনিষ্ঠ কিংবা বুদ্ধচরিতের শ্লথাঞ্চল রমণী বর্ননা এখানে অন্বিষ্ট নয়, বাৎস্যায়ণের বিস্তারও মুখ্য প্রসঙ্গ নয়। এর মধ্যে থেকে যে তথ্য পাই আমরা তা হল — সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারীরূপে 'মেঘদূতে'র প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

'মেঘদূত' কাব্যে যক্ষের বিরহ প্রধান প্রতিপাদ্য। দীর্ঘকাল প্রিয়তমার অদর্শনে যক্ষ ব্যাকুল। এমনকি, অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন তাঁর বাক্যে বা ব্যবহারে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ নেই, বরং পাওয়া যায় একটি সুবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রায় হিসেবি মনের পরিচয়। যে মন কোনো প্রয়োজনীয় ছোটো তথ্যও ভোলে না। বিচক্ষণ বুদ্ধিতে কাজ আদান করে নিতে চায় সে। হতে পারে, এও প্রণয়ীর ব্যকুলতার

এক ধরনের উন্মাদনা। কিন্তু, এই যক্ষই যখন নিপুনভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দূতকে পথ নির্দেশ দেয়, গন্ত ব্যপথে নানা রমণীয় নয়ণ-শোভন দৃশ্য, মনোমুগ্ধকর ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে থাকে, পূর্বমেঘের যাবতীয় বর্ননার মধ্যে, প্রেমিক যক্ষের নিবেদনের মধ্যে একটু অসংগতি যেন থেকেই যায়। শুধু পূর্বমেঘেই নয়, উত্তরমেঘেও দেখা যায় - মেঘ কোন্ জায়গা থেকে যক্ষপ্রিয়াকে দেখবে, কেমন করে দেখবে, কি সম্ভাষণ করবে, যক্ষ সমস্তই নির্দেশ করছে। প্রেমিক যক্ষের এই সতর্কতা, ধাপে ধাপে নিখুঁতভাবে ভেবেচিন্তে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতিও বিস্ময়কর। ঠিক প্রেমিক বলতে যা বোঝা যায়, সেই চিরপরিচিত ধারণার মধ্যেও কোথায় যেন খটকা বাঁধে। রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপীয় সাহিত্যে আমাদের বৈষ্ণব ও আধুনিক সাহিত্য থেকে প্রেমিক সম্বন্ধে যে ধারনা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তার সঙ্গে এই যক্ষের মিল নেই। সে বিরহ ব্যাকুল হয়েও যুক্তি-বুদ্ধি মেনে চলে, কান্ডজ্ঞান হারায় না। তার কথা শুনে তাকে প্রেমিক মনে হয় না, বরং খাঁটি সংসারধর্মী সে। এইভাবে 'মেঘদূতে'র রবীন্দ্রব্যাখ্যার বিরহবোধ একেবারে বিপরীত দিক থেকে বিশ্লেষণের অবকাশ পায়। বুদ্ধদেব লিখেছেন—

> "এ কেমন বিরহী ... যে তার লক্ষ্যের প্রতি তন্ময় হয়ে নেই,
> দূতকে তাড়া না দিয়ে, যে উল্টে তাকে বার বার বিরাম দিতে বলে,
> বলে ঘুরে যেতে ... নানা প্রমোদ মেতে উঠতে?"[৫৬]

এটা কি এমন যে যক্ষ মেঘকেই মধ্যস্থ করে এই তথ্যনিবিড় আপাত মন্থর বর্ননার মধ্যে নিজের আত্মসম্ভোগেরই কাজ করছে? এজন্যই হয়তো এমনভাবে মেঘকে প্রিয়ার কাছে যেতে বলার তাড়া নেই, প্রিয়ার কাছে যাওয়ার উপলক্ষটাই আসল। কালিদাস কবি হিসেবে কখনো একালের কবির মতো বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে মিশে যাননি। বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বজায় রাখবার artistc ধর্ম বজায় আছে। সেজন্যই কবি কালিদাস আর যক্ষ পৃথক ব্যক্তি। কবিধর্মের সুমিত সংহতি, আভ্যন্তর শৃঙ্খলা আর মার্জিত ভাষণ 'মেঘদূত' কাব্যে দেখি। আর মেঘকে যে বছর বছর সুখসম্ভোগে নিরত করে রেখেছেন কবি, তার মূলেও আছে অতীতকালের কাব্য-সৌন্দর্য চেতনার ভিন্নবোধ। কবি একদিকে বিরহী নায়িকার বেদনা, অন্যদিকে মেঘের দৃশ্যসম্ভোগের চিত্র রচনা করে কাব্যটির মধ্যে বিরহের আর্তি ঘনিয়ে তুলেছেন।

মনে রাখা দরকার, কালিদাসের কালে আমরা যাকে রোমান্টিক মানুষ বলি তার দেখা মিলত না। জীবনে মানসিক বিরহের চাইতে দৈহিক বিরহই ছিল গভীর। বুদ্ধদেব নিজে মনে করেছেন যক্ষের কাতরতা কবির বর্ণনায় যতটা আছে, তার কথায় বা ব্যবহারে ততটা নেই। কাব্যে যক্ষের কাতরতা তার নিজের প্রিয়া-বিরহে তত নয়, যতটা প্রিয়ার প্রিয়তম বিরহের আকুলতা। প্রিয়তমা বুঝি বিরহ-দুংখে কাতর হয়ে প্রাণত্যাগ করে - এই আশংকাতেই যক্ষ সারাক্ষণ শঙ্কিত। যক্ষ বার বার মেঘকে অনুনয় করেছে, তার বার্তা নিয়ে প্রিয়াকে দেওয়ার জন্য। প্রিয়ার কাছ থেকে বার্তা নিয়ে আসার জন্য উত্তর মেঘে একবার মাত্র সে উল্লেখ করেছে।

> 'পাঠাবে প্রিয়া তার কুশল-সমাচার, এনো অভিজ্ঞান সঙ্গে
> প্রভাত কুন্দের মতোই স্খলমান আমার জীবন ও রক্ষা করো।[৫৭]

এছাড়া সারাক্ষণ সে তার প্রিয়ার জীবন রক্ষার কথাই ভেবেছে। নারী যখন স্বীয় প্রেয়সী, তখন বিরহীর কাছে এতখানি পরোপকারবৃত্তি একেবারেই আশা করা যায় না। যক্ষের এই আচরণ তার প্রেমিক বৃত্তির অন্তরায় হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যেন সত্যিকার বিরহের প্রকাশ ঘটেনি। বুদ্ধদেবের মতে, 'মেঘদূতে'র বিষয়বস্তুতে বিরহ-যন্ত্রনার অবকাশ নেই। কেননা, যক্ষের সঙ্গে তার প্রিয়তমার বিচ্ছেদ নাতিদীর্ঘ। এই ক্ষণিক বিচ্ছেদে বিরহের তীব্রতা দেখানোই সম্ভব নয়।

বুদ্ধদেব 'মেঘদূত'কে বাংলার প্রাচীন ও আধুনিক বিরহের কবিতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। রোমান্টিক কাব্যবোধ দিয়ে ক্লাসিক কাব্যচিন্তার বিচার করেছেন। বাংলার সাহিত্যিক ঐতিহ্যে 'মেঘদূত' এর প্রভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্ষা ও বিরহের সম্বন্ধবিষয়ক কবিতায় 'মেঘদূত' অতুলনীয় নয়। কখনো কখনো বৈষ্ণব পদাবলী বা রবীন্দ্র কবিতায় বিরহের প্রকাশ হয়েছে অনবদ্য। তিনি বৈষ্ণব কবির 'এভরা বাদর, মাহ ভাদর ....' এবং রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়' এর আবেদনের সেঙ্গ 'মেঘদূত'কে তুলনাযোগ্যই মনে করেন না। এদের অন্তর্নিহিত আবেগ পাত্র ছাপিয়ে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অফুরন্তভাবে উপচে পড়ে, সে ধরণের প্রত্যক্ষ আঘাত বর্ণনা প্রধান 'মেঘদূতে' পাওয়া যায় না। বর্ষা ও বিরহ পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন চিত্রাবলীতে দেখা যায়। কিন্তু এর একীভূত সীমাহীনতা মনকে দোলা দেয়নি কখনো। হতে পারে ক্লাসিক কবির রচনা রীতিই এরকম - চিত্রধর্মিতা বেশী গীতিধর্মিতা কম। বৈষ্ণব কাব্যে তা প্রায়ই ঘটে থাকে। এবং তা কোনো বিশেষ বিরহী বা বিশেষ বিরহের কথা ছাড়িয়ে হয়ে ওঠে সর্বকালের বিরহ ও বিরহীর অন্তরতম বার্তা। বুদ্ধদেবের মতে, 'মেঘদূত' কাব্যের সবচেয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক প্রসঙ্গই হ'ল এই বিরহ। আর,এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 'মেঘদূত' সমালোচনার সবচেয়ে বড় পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়া কোনো ব্যক্তি বিশেষ নন্। রবীন্দ্রনাথ যক্ষ আর যক্ষপ্রিয়ার মধ্যে তাঁর চিরপোষিত ধরা-অধরা, খন্ড অসীমের ধারনা ব্যক্ত করেছেন। তাকে তাঁর নানা কবিতায় যে ভাবে পাই — অসীমের অধরা রহস্যের প্রতি গভির যে আগ্রহ পাই সে দিক থেকে দেখতে হবে। সেখানে তারা ব্যক্তি নয় - জগৎজোড়া বিরহের প্রতীকমাত্র। Particular কে ব্যক্তি হিসেবে দেখাটাকে Romantic কবির রোমান্টিকতার একটা অবলম্বন বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসু বাল্মীকির 'রামায়ণে' সীতা হরণের পর রামের বিরহের সঙ্গে 'মেঘদূতে'র বিরহের তুলনা করে বলেন - রাম সীতাকে সন্ধান করে নানাদিকে সেখাবে ধাবিত হচ্ছিলেন, রোষ ও পরিতাপে, বেদনা ও সন্তাপে, দুঃখে ও যন্ত্রনায় যেভাবে জ্বলে উঠেছিলেন, তাতে তাঁর বিরহ যন্ত্রনা ও দুঃখবোধ প্রসঙ্গে একটুও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু 'মেঘদূত' প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে। যক্ষের সাজানো গোছানো বিরহ প্রকাশের জন্য বুদ্ধদেব তাকে ভেবেছেন একজন 'ভোগবঞ্চিত নাগররূপে'। তাঁর মনে হয়েছে যক্ষের পুরো উক্তিটি একটি সযত্নসাধিত সুগন্ধী প্রেমপত্রের মতো বুদ্ধদেবের এই ব্যাখ্যাতেও যুগমানসিকতার প্রতিফলন সন্ধান করা যায়।

বুদ্ধদেব কোনো কোনো আধুনিক কবিতার সঙ্গে 'মেঘদূত'কে তুলনা করে দেখিয়েছেন এর বিরহ কতটাই কৃত্রিম ও আরোপিত। ফাদার রবার্ট আতোয়ান বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বলেছেন —

তাঁর কাছে পাণ্ডিত্য ছিল অনুভূতির অধীনস্থ সহকারী।
একথাটি তাঁর অনুবাদের কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৫৮]

নরেশ গুহ বলেছেন,

অবিরাম তিনি যুদ্ধ করেছেন আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে।

এ সমস্ত মন্তব্য থেকে বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গিগত দুটি দিক পাই —

১) তাঁর অনুবাদে অনুভূতির গুরুত্ব এবং

২) তাঁর অনুভূতি আধুনিকতার স্বপক্ষে।

'মেঘদূত' অনুবাদ প্রসঙ্গে তাই বলতে পারি তিনি আধুনিকতাকে মুখ্যতঃ মনে রেখেছেন বলে 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। তিনি জীবনানন্দের 'আকাশলীনা' কবিতার—

সুরঞ্জনা ঐখানে যেওনাকো তুমি

. . . .

ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের সোনালী আগুন ভরা রাতে [৫৯]

'ফিরে এসো' আহ্বানের মধ্যেই অভাবের শুদ্ধবেদনা সঞ্চারিত দেখেন সারাবিশ্বে। জীবনানন্দ এমনকি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যেও বিরহ অত্যন্ত স্পষ্ট মনে হয় তাঁর কাছে। অবশ্য এখানে আধুনিক মন নিয়ে একালের বিরহ ও বিরহীকে খোঁজা হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্যবিচারে এখানেই সীমানা লঙ্ঘন হওয়া সম্ভব। বুদ্ধদেব আধুনিক বিরহ বিষয়ক কবিতার সঙ্গে এভাবেই তুলনা করেছেন 'মেঘদূতে'র বিরহকে। তাঁর এমনও মান হয়েছে এই আধুনিক কবিতায় বিরহ তীব্রতার চাপে দেহের সীমা অতিক্রম করে যায়। অতিক্রম করে যুক্তি, বুদ্ধি, পরিম্পর্যও। কোনো স্থির সংগতির জন্য তাঁদের নায়ক-নায়িকার বিরহ অপেক্ষা করে থাকে না। কিন্তু, কালিদাসের নায়ক বিরহের মধ্যেও সম্ভাব্য বস্তুর কল্পনা করে। অসম্ভব, অকল্পনীয় বিষয় যে সন্তর্পনে, সতর্কতায় পরিহার করে এগিয়ে চলে। তাই প্রিয়ার প্রতিরূপ সৃষ্টি করে তার পদতলে নিজেকে লুটিয়ে দিতে চায় সে। কখনো বড়জোর যে হাওয়া প্রিয়াকে স্পর্শ করেছে, তাকে আলিঙ্গন করে শীতল হতে চেয়েছে যক্ষ। বাস্তবের সম্ভাব্য লক্ষ্য বস্তুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তার বিরহ। তাই আধুনিক বিরহের কবিতার তুলনায় 'মেঘদূতে'র বিরহকে কৃত্রিম বলেছেন বুদ্ধদেব। আধুনিক কবিদের এক একটি রচনা হল শূণ্যতার হাহাকার, আর যক্ষের উক্তি একটি 'অভিরাম কারু কর্ম'। যাতে বিরহদশার কৃত্যসমূহ প্রথামতো সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথের একটি কবিতার সঙ্গেও 'মেঘদূতে'র একটি অংশের তুলনা করেছেন বুদ্ধদেব। যক্ষ তার প্রিয়ার তুলনা অন্য কোনো বস্তুতে খুঁজে পায় না, তাই গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। সুধীন্দ্রনাথের নায়ক প্রিয়তমার প্রেমে সন্দিগ্ধ হয়। বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের নায়কের দুঃখকেই তুলনায় গভীরতম মনে করেন। দুই নায়কই বিরহী। দুটিই বিরহের কবিতা। তবু, এই যে বিরহের প্রকৃতি আলাদা হয়ে গেলো, মাত্রারও পার্থক্য ঘটে গেলো, এর কারণ হিসেবে তিনি কবিত্ব শক্তির তারতম্যের কথা বলেন নি, বলেছেন এক জগৎ ছেড়ে আর এক জগতে চলে আসার কথা। এজন্যই

রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' থেকে বিষয় আহরণ করে যে 'স্বপ্ন' কবিতা লিখেছিলেন, কালিদাস তা কখনো বলতে পারতেন না - এমনই মনে করেন বুদ্ধদেব বসু। আসলে, বুদ্ধদেব আর রবীন্দ্রনাথের বিরহ চেতনার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাছাড়া, ক্লাসিক কবির কাল আর আধুনিক কবির একালের জীবন বোধের পার্থক্যও লক্ষনীয়। যে কালে কালিদাস 'মেঘদূত' লিখেছিলেন সেদিনকার কালধর্ম ও কাব্যরূপকে অবলম্বন করে তিনি তার মধ্যেও সঞ্চার করতে পেরেছেন বিরহের এমন এক অনুভূতি যা কেবল বস্তু বর্ননার মধ্যেই যে আবদ্ধ থাকে এমন বলা যায় না। বরং তাঁর কবিতার স্তবক বিন্যাসের স্থির চিত্রের ভেতরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এমন এক হৃদয় সঞ্চারী আনন্দবোধ যাকে এই কাব্যের বিশেষ ধর্ম বলা যায়। তবে, কোথাও কোথাও প্রায় একই প্রসঙ্গ 'মেঘদূত' যা আছে তাই উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ —

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে, মোর হস্তে হস্তে রাখি
নীরবে শুধালো শুধু সকরুণ আঁখি,
হে বন্ধু আছ তো ভালো ?[৬০]

'মেঘদূতে'র উত্তরমেঘও আছে —

তোমার সহচর যদিও বিরহিত, জীবিত আছে রামগিরিতে
অবলা, তোমাকে সে কুশল জিজ্ঞাসে ... ।[৬১]

বুদ্ধদেব মনে করেন, 'মেঘদূতে'র যক্ষের প্রশ্ন একজন নীতিজ্ঞ জড়বাদীর। তার প্রিয়া যে মরে যায়নি, শারীরিক কুশলে আছে, শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছে সে। আর, রবীন্দ্রনাথের প্রশ্নে ধ্বনিত হচ্ছে এক জন্ম জন্মান্তরের বেদনা, যা হৃদয়ের মধ্যে অনবরত উত্থিত হয় কিন্তু কোথাও যার উত্তর নেই। এই 'না বলা বানীর ঘন যামিনী'র মধ্যে এটি একটি সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে বিরহের গান। প্রেমের এই ভাষা, এই উচ্চারণ রবীন্দ্রনাথে এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। আসলে, রবীন্দ্রনাথ এতে যেভাবে বিরহ খোঁজেন, আমরাও সেভাবেই কাজকে বুঝি। হয়তো 'মেঘদূত' সে অর্থে বিরহের কাব্য নয়, প্রেমের কাব্য। যে অর্থে আধুনিক রোমান্টিকতার প্রতি তুলনায় 'মেঘদূতে'র প্রেম ও বিরহকে বিচার করা হয়েছে তারও বিবেচনা জরুরী। 'স্বপ্ন' কবিতায় এই যে নায়কের ভাষা হারিয়ে গেলো, নায়িকাও কোনো উত্তর দিতে পারল না, তাদের এই অকথিত বাণীর সীমাহীনতা স্পর্শ করেছে কবিতাটিকে। শেষ পর্যন্ত এক নিঃসীম শূণ্যতার মধ্যেই কবিতাটি মিলিয়ে যায়। রজনীর গাঢ়তার অন্ধকারের মধ্যে অনাদি ও অনন্ত বিরহের ছায়া ঘনীভূত হয়েছে। রজনী প্রভাত হলে এই স্বপ্ন থাকবেনা, স্বপ্ন শেষে প্রিয়তমাও হবে অন্তর্হিত। ফলে, এই তৃষ্ণা এমন, যা কোনোদিন মিটবেনা, এই প্রিয়া এমন যে স্পর্শমাত্রে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। নায়িকা এবং প্রেমের এই অধরা মাধুরী রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিকে একটি ভিন্নমাত্রায় ঋদ্ধ করেছে। হতে পারে, এ বিরহ বাস্তবের নয়, এ বিরহ স্বপ্নের ও বিস্মরণের। প্রিয়তমাও শুধু স্বপ্নের নায়িকা। কিন্তু, যে অপার তৃষ্ণায় মাথিত হয়েছে নায়ক, ট্যান্টেলাসের অতৃপ্ত পিপাসার মতো সে তৃষ্ণা

সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সকল কালের, সকল প্রেমিকের আকণ্ঠ পিপাসাকে যেন নাড়া দেয় গভীর করে। স্বপ্ন হলেও প্রেম-বিরহের এই ক্ষর্ণপ্রভা মিলিয়ে যায় না একেবারে। তুলনায় যক্ষের প্রেমকে বুদ্ধদেব 'শৃঙ্গারবাসনায় সীমাবদ্ধ'[৬২] বলেছেন। তার প্রেমিক বা বিরহীরূপ আধুনিক দৃষ্টিতে মেনে নেওয়া যায় না। তাকে 'লিবিডোভারাতুর', 'কামাতুর'[৬৩] জীব বলেছেন তিনি। সুদীর্ঘ আট মাসব্যাপী সম্ভোগের অভাবে তার যে অবস্থা হয়েছে, সর্ববস্তুই তার মনে যেভাবে যৌন চিত্রকল্প জাগিয়ে তুলেছে, যেভাবে তার কাম যথাযথ পাত্র থেকে বঞ্চিত হয়ে, নিসর্গে ছড়িয়ে পড়লো, বুদ্ধদেব তার নাম দিয়েছেন, 'নিখিল কামুকত্ব'।[৬৪] এই যে কাম বা প্রাম পাত্রান্তরিত হয়ে নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, "মদন ভস্মের পর" কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টিই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথে একই বিষয়বস্তুর প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেলো। রবীন্দ্রনাথ যাকে 'বায়বীয় নির্যাসে' পরিণত করেছেন, কালিদাসে আমরা পাই তার 'রক্তমাংসনির্ভর আকার ও আকৃতি'[৬৫] এখানে কালিদাসের এবং তার কালের ধর্মই যেন ফুটে ওঠে। কাব্যের কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই যক্ষের কামনায় অনুরঞ্জিত পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘের ভূ-দৃশ্য ও নিসর্গের চিত্ররূপ স্বাভাবিক হয়েছে। মেঘকে দূত করে যে পথে যক্ষ বার্তাপ্রেরণ করেছে সে পথের যাবতীয় নিসর্গ চিত্র-ই রময়ীয়। কিন্তু বারংবার রতি প্রসঙ্গের উল্লেখেও সেগুলি ক্লান্তিকর হয়নি। বুদ্ধদেব এখানে কালিদাসের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র কাম ও যৌনতাকে অবলম্বন করে কালিদাস অসামান্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন। যক্ষের কামপিপাসাকে তিনি এমন পরিশীলিত, বহুমুখী ঔ দ্যুতিময় করে তুলেছেন যে, শুধু তাকে অবলম্বন করে একটি সম্পূর্ন কাব্য রচনা সম্ভব হলো। এই অপরিসর বিষয়বস্তুর মধ্যে কালিদাস যেভাবে বৈচিত্র্য ও সরসতা সঞ্চার করেছেন, পাঠকের সম্পূর্ন মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা হয় না। 'মেঘদূত' পাঠের মাধ্যমে 'মেঘদূতে'র সঙ্গে যত বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়, তত বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। কাব্য পাঠের এই আনন্দ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে। তাছাড়া, কাম এখানে রোমান্টিক বেদনায় রূপান্তরিত না হলেও বিশ্বের পটভূমিকায় বিন্যস্ত হয়েছে। কামের এই বিশ্বরূপ অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি।

তাছাড়া, 'মেঘদূত' কাব্যে সত্যিকারের বিরহ না থাকলেও উত্তরমেঘের শেষ অংশে কাব্যটি ধীরে ধীরে মর্মস্পর্শী হয়েছে। বলাবাহুল্য, আধুনিক কাব্যবোধে মর্মস্পর্শিতার ধারনা প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে কাব্যশৈলীর মহিমা ছিলো অত্যন্ত বাঞ্ছিত। যক্ষের বিলাপের মধ্যে বুদ্ধদেব দেখেছেন একটি অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। হতে পারে সে অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়দমনের ক্লেশজনিত, কিন্তু, কালিদাস একে দুঃখের মর্যাদা দিতে পেরেছেন। 'মেঘদূত' বিরহের কাব্য কি-না, 'মেঘদূত' এর নায়ক যক্ষ সত্যিকারের বিরহী কি-না, যাবতীয় প্রশ্ন যেন তুচ্ছ হয়ে যায়। স্বপ্নে-স্বপ্নে মেঘকে দূত করে যে বার্তা যক্ষ পাঠাতে চেয়েছে, তা একটি কল্পিত অভিযান হলেও হৃদয়-ছোঁয়া। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে বাস্তব সত্যের পার্থক্য থাকলেও সেই ব্যবধান ঘুচিয়ে পাঠকের হৃদয়কে উন্মুখ করে তোলে 'মেঘদূত'। 'মেঘদূতে'র বর্ণনা সবই স্বভাবসিদ্ধ-স্বাভাবিক, শুধু একটি মাত্র কল্পনা স্বভাব-বিরোধী। মেঘকে সচেতন জীব হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া, আপাত-অসম্ভব, অকল্পনীয় বস্তু মহাকবি তাঁর কাব্যে সম্ভবপর করে তোলেননি। মেঘকে

দূতরূপে বার্তাপ্রেরণ স্বপ্নেই সম্ভব। তবে কালিদাস স্বপ্নের হাতেও পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেন নি। কেবল স্বপ্নের কথাই বলেন নি, যুক্তি দিয়ে সচেতনভাবে ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছেন এই স্বপ্নের কারণ। স্বপ্নচারী কল্পনার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ রোমান্টিকতার পরিপন্থী। কালিদাস অস্বীকার করেছেন রোমান্টিক সাহিত্যের বিশ্ববিস্তৃত ধারাটিকে। বাল্মীকি বা দান্তে রোমান্টিক কবি হলেও তাঁদের মধ্যে রোমান্টিকতার লক্ষণ কোনো না কোনোভাবে এসে পড়েছে। কিন্তু, কালিদাস এর বাইরে থেকে গেলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাবদ্ধ গন্ডী অতিক্রম করলেন না তিনি। প্রসঙ্গতঃ বুদ্ধদেব কোলরিজের 'কুবলাখান' কবিতাটির কথা বলেছেন। সেখানে, স্বভাব-সাযুজ্য নেই'এ মন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু সেইসব অসম্ভব সমাবেশ রচনার জন্য তাঁর কোনো জবাবদিহি নেই। কালিদাসের কাব্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষাও এসেছে বাস্তব যুক্তি সম্ভাব্যতার পথ ধরে। স্বকীয়তার চেয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে কবিপ্রসিদ্ধিগুলি। কবি প্রসিদ্ধির প্রশ্ন এলে পূর্বসূরীদের ঋণের কথা বলতে হয়। প্রশ্ন দাঁড়ায় কালিদাসের কাব্যে বাল্মীকির ঋণ ঋণাত্মক মাত্র, নাকি স্বকীয় সৃজন মূল্যে সমৃদ্ধ? আর কবি প্রসিদ্ধি বলতে এত বছর ধরে আমরা যে উপমাগুলিকে বুঝি সেগুলিতো কালিদাসের হাত থেকে উত্তরকালের ব্যবহার জীর্ণ করে তুলেছে। কালিদাসের কোনো উপমায় এমন কিছুই নেই, যা প্রথাসিদ্ধ নয়, আক্ষরিক নয়, অলংকারধর্মী নয়। বুদ্ধদেব অবশ্য একথা বলেননি যে, কালিদাসের উপমাগুলি সবই পূর্বসূরীদের ভান্ডার থেকে আহরণ করা। তবে পাদটীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন —

> ''অধ্যাপক শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ক্রয়ী' গ্রন্থে ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাল্মীকি ও কালিদাস' প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৬) দেখিয়েছেন, উপমাদি বিষয়ে বাল্মীকির কাছে কালিদাসের ঋণ অগণ্য।''[৬৬]

'মেঘদূতে'র চিত্রধর্মী উপমাগুলিও কোনো অপ্রত্যাশিতের চমক সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি কালিদাসের উপমাগুলিকে দান্তের উপমার সঙ্গে তুলনা করে বলেন - দুইয়েরই উদ্দেশ্য দৃশ্যগুলিকে মনের সামনে সুনির্দিষ্ট করে তোলা, স্পষ্ট করে দেখানো। কিন্তু, দান্তের উপমার উদ্দেশ্য শুধু দৃশ্যরূপ বা ছবি ফোঁটানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এর বাইরে এক অন্তর্নিহিত প্রাণধর্মে তা সুন্দর হয়ে ওঠে। আপাত বিসদৃশ বস্তুগুলিকে সূত্রবদ্ধ করে দান্তে বহুযুগ আগেই যুগান্তর সৃষ্টি করলেন। কিন্তু, কালিদাসে তা নেই । তাঁর কাব্যে ঘুরে ফিরে আসে 'বিরহিনী ও শীর্ণ চাঁদ', 'দুঃখিনী ও মেঘলা দিনের পদ্ম'। নারীদেহের বর্ননায়ও পরিচিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছের বাইরে যাননা তিনি। অথচ, নারীদেহের মতো ব্যবহৃত পরিচিত প্রসঙ্গেও যে কল্পনাকে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করা যায় এর প্রমাণ বুদ্ধদেব খুঁজে পান জীবনানন্দের কবিতায়। আপাত-অসংগত, বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে যে ভাবগত ও প্রকৃতিগত সাযুজ্য খুঁজে নেওয়া হয় জীবনানন্দের কবিতায়, কিংবা পাঠকও ক্ষণে-ক্ষণে আবিষ্কার করে নেন - সেই আবিষ্কার ও অন্বেষণের আনন্দ কালিদাসে কোথায়? এই প্রশ্ন তুলেছেন বুদ্ধদেব। জীবনানন্দের 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিঃস্তব্ধতা এসে যেভাবে জানালায় উঁকি মেরে কবিতার নায়ককে মৃত্যুর পরামর্শ দিয়ে

যায়, তা কালিদাসের রচনায় কল্পনাতীত। বস্তুর সঙ্গে ভাবনার, পরিচিতের সঙ্গে দূরবর্তীর, মূর্তের সঙ্গে অমূর্তের তিনি তুলনা করেননা, যেসব বস্তুর কোনো-না-কোনো স্বাভাবিক লক্ষণগুলো পরস্পরের অনুরূপ, শুধু তাদেরই একসূত্রে বাঁধেন। কেমন করে কবির চিত্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমান্তরেখা ভেঙে যায়, সব বিপরীত অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে, কবি জয় করে আনেন অজানা এক অন্য ভুবন — এই সব আছে বোদলেয়ারের কবিতায়। এই জয়ের আনন্দ আছে আধুনিক বাংলা কবিতায়। জীবনানন্দ সেখানে পথিকৃৎ হয়ে আছেন। বুদ্ধদেব মনে করেন, কালিদাসে সে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথাবদ্ধতার বাইরে যাননি তিনি।

কবি হিসেবে কালিদাস তাই ক্লাসিক সাহিত্যের পূর্ণ প্রতিনিধি। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যেমন হোমার অপেক্ষা ভার্জিলকেই ক্লাসিক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তেমনি সংস্কৃত সাহিত্যে এই স্থান কালিদাসের। ক্লাসিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণকে এলিয়ট বলেছেন 'maturity',

> maturity of mind, maturity of manners,
> maturity of language [৬৮]

কালিদাসের কাব্যের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি যেন নিজেই ক্রমশঃ এই পরিপূর্ণতার দিকে যাচ্ছেন। বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি প্রাঞ্জল হলেও দুর্বোধ। কেননা, তাঁর এমন অনেক পংক্তি পাওয়া যায় যেগুলির অর্থ সারাজীবন ধরে খুঁজলেও যে অবধি নেই। প্রসঙ্গতঃ তিনি শেক্সপীয়রের 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' নাটকে মরনোন্মুখ নায়িকার কিছু সংলাপ তুলে ধরেন। যে সংলাপ পাঠককে বিস্মিত করে, যেগুলির রহস্য পাঠককে খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু, কালিদাসের কবিতা দুরূহ হতে পারে, দুর্বোধ নয়। শেক্সপীয়র বা অন্যান্য রোমান্টিক কবির কাব্য সম্বন্ধে সমালোচকেরা যে ব্যাখ্যা দেন, তাতে কবিতা অনেকটা বোঝা গেলেও শেষ পর্যন্ত কিছু বাকি থেকে যায়। 'মেঘদূতে' কিছুই বাইরে পড়ে থাকে না। 'মেঘদূতে'র একেকটি শ্লোকের একাধিক অর্থ থাকলেও, তার প্রতিটি অর্থ-ই সুনির্ণেয়, তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা বহু অস্পষ্ট সম্ভাবনার সূত্রে আমাদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত করে তুলবে। এসব সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করলেও বুদ্ধদেব অবশ্য মনে করেন, গোটা সংস্কৃত সাহিত্যে 'মেঘদূত' এরকম একটি কাব্য, যা বার-বার পড়া যায়, যার প্রতি অফুরন্ত উৎসাহ দেখানো যায়, যার অনেক অংশ স্মৃতির অঙ্গীভূত হয়ে যায়। মনে হয়, শব্দ ও অর্থের সুনিশ্চিত আত্মতার বাইরে মেঘের চলমানতা, বিরহী যক্ষের প্রিয়া সম্মিলনেচ্ছা এবং বিভিন্ন বস্তুতে সেই কামীর মনোভাবভূত কামনা প্রকাশক রূপচিত্র - এসবই কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুষঙ্গে মনকে দূরান্তরে নিয়ে যায়। এতে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ নেই, অজানাকে জানার শিহরণ নেই। তথাপি পাঠের পুনরাবৃত্তিতে 'মেঘদূত' ক্লান্তিকর মনে হয় না। এই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুটিই 'মেঘদূতে'র উদ্বৃত্ত অংশ। যার জন্য নিত্য নতুন হয়ে ওঠে মেঘদূত। এই উদ্বৃত্ততা রোমান্টিকতার লক্ষণ। উদ্বৃত্ত তত্ত্ব - surplus theory হয়তো তিনি নিয়েছেন পশ্চিমের কাছ থেকে। মেঘদূতের উদ্বৃত্ত অংশ মূলতঃ দুটি সূত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। প্রথমতঃ মেঘদূতের ছন্দ, ধ্বনি, যার আবেদন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে স্নায়ুতন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছে যায়,

দ্বিতীয়ত ঃ মেঘদূতের গতিধর্ম, যা রোমান্টিকতারও গোত্রচিহ্ন। এই দুটি গুণ-ই কাব্যটিকে চিরনতুন করে রেখেছে। কালিদাস অন্য কোথাও মন্দাক্রান্তা ছন্দ ব্যবহার করেন নি, অন্য কোনো সংস্কৃত কাব্যই শুধুমাত্র ধ্বনির মাধ্যমে এরকম আবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধুমাত্র ধ্বনিই নয়, মন্দাক্রান্তা ছন্দের ঢেউ এর পর ঢেউ যখন কান ও মনের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, তখন ধ্বনিকল্লোল, ছন্দকল্লোল মিলেমিশে মায়ামন্ত্রের মতো কাজ করে। যে মন্ত্র কানের ভিতর দিয়ে মর্মে স্পর্শ করে। পাঠক আকুল হয়। মেঘদূতের একেকটি পংক্তি সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের বক্তব্য -এযেন সেই পংক্তি, যা আমাদের দেহকে রোমাঞ্চিত করেই চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে পারে, যার কোনো আধেয় বস্তুর প্রয়োজন নেই।

'মেঘদূত' সমালোচনায় পূর্ববর্তীদের সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিন্তার পার্থক্য
এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কারণ হিসেবে তিনটি বিষয়কে তুলে আনা যায় —

(১) রবীন্দ্র চেতনার বিরহ বলয়ের বাইরে গিয়ে ভাবনার স্বাতন্ত্র্য —

বুদ্ধদেবের কালে যখন সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন 'অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ / অসংগত চির প্রেম' সে কাল ইউরোপ থেকেও শিখেছে তাৎক্ষণিকের মূল্য। সেখানে রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন বিরহের তত্ত্ব কার্যত অনাদৃতই হয়ে পড়েছে।

(২) রোমান্টিক কবির মনের নিরিখে না দেখে, বস্তুকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার প্রবণতা —

বুদ্ধদেব যেখানে দেহচেতনাকে গুরুত্ব দেন মনে করেন সূর্য সম্ভোগের প্রদীপ সেখানে তাঁর মনোধর্মের মধ্যে অধরা রহস্যময়তার প্রতি আগ্রহ সত্ত্বেও বাস্তব পৃথিবীর চেতনাই বড় হয়। সুতরাং সাহিত্যের বস্তুময় রূপকে তিনি ছেড়ে যেতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বস্তুকে অবলম্বন করে নিজের মনের ধর্মে যে বিরহবোধের বিস্তার ঘটিয়েছেন তা সাহিত্যের বিষয়ে নেই। বুদ্ধদেব একালের বস্তুচেতনার বাইরে যেখানে যান সেখানেও তাঁর এই অপরূপী অলৌকিক ভুবন নির্মিত হয়না।

(৩) যুগজীবনের ধর্মে, কবির মনোধর্মে এবং নতুন কাব্যবোধের ধর্মের স্বাতন্ত্র্য —

আধুনিক কবিদের কব্য চেতনায় রোমান্টিকদের সুদূরাভিসার নেই, যা আছে তাতে শব্দের ভিতর থেকে রহস্যময়তার রোমাঞ্চ সন্ধান। এজন্য জীবনানন্দ, বোদলেয়ার, রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপীয়রের সেই শ্রেনীর কাব্যাংশ উদাহরণ হিসেবে ফিরে আসে। কালিদাস যে যুগে যে যুগমানসকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন তার মধ্যে এই সম্ভাবনা ছিলোনা। কাব্য সম্বন্ধে ভিন্ন বোধ থেকে রচনার নির্মান শিল্পের দ্বারা রসোদ্রেকের কাজ তাঁরা করেছেন। এজন্য কালিদাস যেখানে বিবিধ বস্তুজগতের উপমায় কামীর মনোভাবের রূপ নিরীক্ষণ করেন সেখানেই তার শিল্পরচনার সার্থকতা স্বীকৃত হয়। বলার ভিতরে না বলা বানীর রহস্য সন্ধান কালিদাসের কবিপ্রতিভার ধর্ম নয় - তার সন্ধান সার্থক হতে পারে না।

বুদ্ধদেবের এই তুলনায় দুই যুগের কাব্য ধর্মের তুলনা এসেছে। তাতে বিশেষ লাভ হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রায় সারা বিশ্বের কাব্য মানচিত্রে কালিদাসের স্থান নির্নয় করেছেন এবং দ্বিতীয়ত ঃ, আমাদের কালের জীবনধারার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও নির্দেশ করেছেন।

। গ ।

'রামায়ণ' প্রবন্ধ (১৯৪৭) এবং 'মেঘদূত' অনুবাদ কাব্যের ভূমিকা হিসেবে 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত' (১৯৫৭) প্রবন্ধ রচনার সতেরো বছর পরে 'মহাভারতের কথা' প্রকাশিত হ'ল। এই সতেরো বছরের মধ্যে মহাভারতচর্চা তাঁকে খুব বেশী করে প্রভাবিত করেছে। তাঁরে অনেকগুলি কাব্যনাট্য লেখা হয়েছে এই মহাভারত থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে। 'মহাভারত' চর্চা শুরু ১৯৬৩-৬৪ সালে, যখন তিনি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দোইউরোপীয় এপিক পড়াতে গিয়েছিলেন। আর তাঁর আন্তর্জাতিক ছাত্রদের প্রশ্নে উদ্বেজিত হয়েছিল 'মহাভারত' চিন্তা প্রসঙ্গ। তাঁকে ভাবতে হল মহাভারতের বিভিন্ন উপকরণের তাৎপর্য।

> 'মহাভারত'কে তিনি কোনো নান্দনিক সূত্রে বিচার্য'[৬৯]

মনে করেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক বা বহুকথিত বৈজ্ঞানিকনয়, বরং 'মহাভারতে'র মধ্যে তিনি একটি অখণ্ড মিথ চর্চার উপাদান উপকরণ খোঁজেন - সামগ্রিক দৃষ্টিতে মহাভারতকে দেখতে চান।

> এই পঞ্চম বেদটির স্বরূপ ঠিক বুঝতে হ'লে একে খণ্ডিত ভাবে
> দেখা চলবে না।[৭০]

বাংলায় মহাভারতচর্চা নতুন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহ্যের ধারক-বাহক। কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজশেখর বসু তাঁদের 'মহাভারত' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় আংশিক ভাবে 'মহাভারতে'র সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) 'মহাভারত' সমালোচনার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার মূল লক্ষ্য কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে প্রতিপাদন করা। বঙ্কিমচন্দ্রে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় অনুশীলন তত্ত্বের সারবত্তা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুশিলন তত্ত্ব যে অবান্তর তত্ত্বমাত্র নয়, জীবনে তাঁর প্রকটন সম্ভব, বঙ্কিম এই 'কৃষ্ণচরিত্র' অবলম্বন করে তা দেখালেন। বঙ্কিমের আগে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা কালচার তত্ত্বকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে প্রতিপাদন করেছিলেন। স্পেন্সর এবং ম্যাথুআর্নল্ড এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। বঙ্কিম সেই কালচার তত্ত্বকে ভারতীয় হিন্দুধর্মের দিক থেকে দেখেছেন। বঙ্কিমের আগে অনেক অনুশীলনতত্ত্ব বেত্তা (সীলি, রানা) যীশুকে আদর্শ মানব বলে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রিস ডেভিসের মতো পণ্ডিতেরা বুদ্ধকেই বলেছিলেন আদর্শ মানব। কিন্তু, বঙ্কিমের মতে, সংসারত্যাগী যীশু বা বুদ্ধ কখনোই আদর্শ মানব হতে পারেন না। কেননা সন্ন্যাস মোটেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। বঙ্কিম যে প্রত্যক্ষবাদ মানেন তাতে জীবনই সত্য - তাঁর আস্থা humanism -এ, মানবতাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে মানবতা জীবনের বৃত্তি সমূহের সম্যক অনুশীলন, এজন্য বঙ্কিম কৃষ্ণকে আদর্শ অনুশীলিত চরিত্রের দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এতে যেমন কৃষ্ণের ভগবত্তা অস্বীকৃত হয়েছে, তেমনই কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আর, এই অনুশীলিত চিত্তবৃত্তি কৃষ্ণের চরিত্র ব্যাখ্যান দ্বারা তিনি তত্ত্বব্যাখ্যাই করেছেন মাত্র।

এখানে বঙ্কিম একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে এগিয়েছেন। সে দৃষ্টিকোণ তৎকালীন দর্শনের একটি নবীন ঈক্ষণভঙ্গি। উনিশ শতকের মানবতাবাদ তাতে সন্নিবেশিত। আর তার সঙ্গে অণ্বিত হয়ে

আছে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রাচীন সাহিত্যের সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতি। বঙ্কিমের দৃষ্টি সেখানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি। মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমের এই যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা পদ্ধতির প্রভূত প্রশংসা করে লিখেছিলেন বঙ্কিম শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্ন তন্ন রূপে পরীক্ষা করে বুদ্ধিবৃত্তিকে গৌরবের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে দিয়েছেন।[৭১] 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বাইরে 'বিবিধ প্রবন্ধে'র একটি রচনা 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'মহাভারতে' আছে সম্পদ ভোগের জন্য আত্মবিরোধের ইতিবৃত্ত। এপ্রসঙ্গ বঙ্কিম বিশেষ করে ব্যাখ্যা করবার সুযোগ গ্রহণ করেন নি।

'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' চর্চা এদেশের এবং বিদেশের কবি পণ্ডিতদের বার বার আকর্ষণ করেছে। বহু বিদেশী কবি বিদ্বান এই কাব্যগুলির প্রতি আগ্রহ অনুভব করেছেন। 'রামায়ণে'র গভীর অনুভূতি উদ্দীপক রচনাবৈশিষ্ট্যের কথা অনেকেই মনে করেছেন। বঙ্কিম মহাভারতচর্চা করেন উনিশ শতকের পশ্চিম প্রত্যাগত উপযোগিতাবাদ এবং মানব বিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে। বঙ্কিমের চর্চা ছিল পশ্চিমী চর্চাকারদের অনুসারী। মানবমুখী দৃষ্টির যুক্তিপরম্পরা তিনি সাজিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলেন, দেখালেন ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করে। কিন্তু তাঁর ভাবনা বঙ্কিমের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র মধ্যে কাহিনী উপকরণের তুলনা করলেন।

বঙ্কিম বিশ্লষণধর্মী, রবীন্দ্রনাথ সংশ্লেষণধর্মী। রবীন্দ্রনাথ 'মহাভারত'কে একটি ঐক্যবোধের দিক থেকে দেখেছেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণকে অবলম্বন করে একটি ঐক্য চিন্তার কথা ভেবেছেন। এই চিন্তার পিছনে বঙ্কিমের প্রবন্ধের উদ্দীপনা থাকা সম্ভব। 'মহাভারতে'র কাহিনী কল্পনার পিছনে একটা সামাজিক রূপক সন্ধান করেছেন তিনি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার মধ্যে 'মহাভারতের কথা' একেবারে ভিন্নধর্মী রচনা। মেঘদূত' বা 'রামায়ণ' প্রবন্ধের মতো এ একেবারেই নয়। কোনো সাময়িক উত্তেজনার চেয়ে বরং এর মধ্যে আছে দীর্ঘদিনের ভাবনার উত্তাপ, যা একটি অ্যাকাডেমিক প্রয়োজনকে সামনে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসার অবকাশ পেলো। বুদ্ধদেব বসুর এ রচনা একটিমাত্র ক্ষুদ্র নিবন্ধে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর বিষয় বিস্তৃত, এর আলোচ্য বিষয় পৃথিবীর বিস্তৃততম সাহিত্য কিংবা ইতিহাস, এবং এর চর্চার প্রকৃতি প্রকরণ এমনই যে তা কেবলই 'মহাভারত'চর্চা থেকে তুলনামূলক মহাকাব্যচর্চার জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর, সেই তুলনাত্মক চর্চাকে তিনি সুবিন্যস্ত ও সংবদ্ধ করে সাজিয়ে তুলেছেন আধুনিক মিথ চর্চার প্রকরণে। তিনি পাশ্চাত্ত্য মিথসাহিত্য পরিভ্রমন করে 'মহাভারতে'র পক্ষে ব্যবহার্য যে সব তথ্য সূত্র পেয়েছেন, তাকে চিন্তাসূত্রে গ্রথিত করেছেন। তাঁর নিজস্ব গভীর অধ্যয়ণ এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। মার্কিন দেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন ভারতীয় মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে, পাশ্চাত্ত্যের মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন ভারতীয় মহাকাব্যকে। প্রসঙ্গতঃ ভারত সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। পাশ্চাত্ত্যের জীবনদর্শন, এবং পাশ্চাত্ত্যের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের জীবনবোধগত গভীর পার্থক্য।

ফলে, পার্থক্য ঘটেছে মহাকাব্য চিন্তায়ও। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপাত্তির জন্য-ই তাঁর 'মহাভারতের কথা' এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন -

> ফলে 'মহাভারতে'র বিভিন্ন কাহিনী ও চরিত্র তাৎপর্যে সমৃদ্ধ ও
> নতুন মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ... 'মহাভারত'কে বিশ্ব
> ভূমিকায় স্থাপন করে তার স্বরূপ নিরূপণের এই প্রচেষ্টা গ্রন্থখানিকে
> একটি 'বিস্ময়কর' অপূর্বতায় মণ্ডিত করেছে। শুধু তাই নয় তিনি
> ভারতবর্ষের-ই অপর মহাগ্রন্থ 'রামায়ণে'র পটভূমিকায় স্থাপন করেও
> মহাভারতের বিশিষ্টতাকে নূতন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।[৭২]

'মহাভারত' সমালোচনায়, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ সাহিত্যিক, তিনি নিজেই বলেছেন—

> আমার আলোচনার ধারা সাহিত্যিক, ... বলা যাক্,
> কবিতা ও কবিতার মতো মিথলজির উপর নির্ভরশীল।[৭৩]

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে 'মিথপুরাণ সন্ধানী' কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলোই। আধুনিকতার একটি লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছিলো এই মিথ পুরাণের ব্যবহার।

> আধুনিক কবি বা শিল্পী তাঁর আদর্শ বা স্বপ্নকামনা কিম্বা
> অচরিতার্থ বাসনার প্রকাশ দেখেন জগতের প্রাচীন মিথ্-
> পুরাণের কাহিণী গুলিতে।[৭৪]

বুদ্ধদেবের অনেক কবিতায়, কাব্য-নাট্যে মিথের ব্যবহার দেখা যায়। তাঁর 'মহাভারত'চর্চাতেও প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য মিথ, মিথিক কাহিনী সম্ভারের আবিস্কার লক্ষণীয় হয়েছে। প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য মিথ পুরাণের উপর নির্ভর করেই তিনি তাঁর 'মহাভারত' সম্বন্ধীয় ধারনা ব্যক্ত করেছেন।

> পশ্চিম দেশীয় প্রাচীন ও অর্বাচীন সাহিত্য, নানা দেশের ও
> নানা যুগের কল্পনাচিত্র যারা পরস্পরের দর্পনের কাজ করে[৭৫]

- এই সব কিছু সংসর্গে স্থাপন করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে,

> 'মহাভারত' কোনো সুদূরবর্তী ধূসর স্থবির উপাখ্যান নয়,
> আবহমান মানব জীবনের মধ্যে প্রবহমান।[৭৬]

তিনি 'মহাভারত'কে দেখেছেন একটি অখন্ড সাহিত্য হিসেবে, - বিরাট স্ফীতকায় ভারত সংহিতার বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন কতিপয় গ্রন্থিসূত্র। সমগ্র 'মহাভারত'কে তাঁর মনে হয়েছে, একটি অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত সমগ্র কাব্য, 'Organic whole', আর, এই ঐক্য সাধনের অবলম্বন হিসেবে আছে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র। সেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বা নায়ক বীরবাহু, পরাক্রমী কোনো বীর নয়, মহামহিমাময় সর্বক্ষমতার অধিকারী 'লোকোত্তর বাসুদেব' নন, তিনি এক সাধারণ, মিত বুদ্ধি, শান্ত, সংযত, নিষ্ঠাবান, সর্বোতোভাবে মানবিক গুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির। তাঁর ক্রমবিকশিত ব্যক্তিত্ব-ই উদ্ঘাটিত হয়েছে 'মহাভারতের কথা'র বিভিন্ন খণ্ডিত পর্বগুলিতে। সেই টানেই এসেছে প্রাচীন প্রাচ্য পুরাণের সঙ্গে

প্রতীচী পুরাণের তুলনা, প্রতিতুলনা। পাশ্চাত্ত্য মিথগুলি উঠে এসেছে সেই সূত্রে, কোনো কাহিনীগত পূর্বাভাস, প্রতিভাসের প্রকল্পনায়। প্রাচ্য 'রামায়ণ' ও অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে গ্রথিত হয়েছে কখনো। তাঁর 'মহাভারত'চর্চায় তাই তুলনামূলক পুরাণচর্চা একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে। অবশ্য পুরাণের তুলনা, প্রতিতুলনা এসেছে তাঁর সাহিত্যিক ব্যাখ্যার পথ ধরে। সাহিত্যিক ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি কখনো তদ্‌গতভাবে বিশ্লেষণমুখী হয়েছেন, কখনো কোনো প্রসঙ্গের সূত্রমাত্র গ্রহণ করে আত্মতান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন প্রাচীন সাহিত্যের। সেক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যের তুলনা। এর মূল অবশ্য নিহিত ছিলো সমালোচকের ব্যক্তি মানসিকতার মধ্যে, তাঁর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য পুরাণচর্চা, গভীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার মধ্যে। বিশ্বকাব্য - সমুদ্র মন্থনের প্রতিফলন আছে তাঁর 'মহাভারতের কথা'য়।

অখণ্ড সাহিত্য মহাভারত ঃ

'মহাভারতে'র বিরাট স্ফীতকায় আয়তনের জন্য 'মহাভারত' আদ্যন্ত পাঠ করা কষ্টসাপেক্ষ। রাজশেখর বসুর অনুবাদ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষেপীকরণকে বুদ্ধদেব কখনো পর্যাপ্ত মনে করেন না। তিনি এই অনুবাদ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, তা থেকে যা কিছু বর্জিত হয়েছে তা-ই আমাদের পক্ষেও পরিত্যাজ্য নয়। কারন, সমগ্রটির সঙ্গে পরিচিত না হলে 'মহরাভারতে'র ঐশ্বর্য বিষয়ে আমাদের ধারনা অস্পষ্ট থেকে যায়।

মহাভারতের এই বিশাল অবয়বকে সংক্ষেপীকৃত করে আমরা তাকে হয়ত আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারি। কিন্তু তার বর্জিত আপাত তাৎপর্যহীন অংশের মধ্যেও থেকে যেতে পারে কোনো অনুচ্চারিত ইশারা। এই কারনে প্রাচীন মহাকাব্যের অন্তর্বর্তী পুরাণ বিশ্লেষনে সেগুলির গুরুত্ব থেকে যায়। এই অন্তর্নিহিত সূত্র বুঝতে পারলে তখন আর এই কাব্যের গঠনকে অবিন্যস্ত বলে মনে হবে না। বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যেই সমগ্রতা পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেবের 'মহাভারত' চর্চায় মিথ একটি দৃষ্টিকোণ। আর এই মিথের তাৎপর্য বোঝার পক্ষে কোনো অংশের গুরুত্বই উপেক্ষণীয় নয়। এই কারনেও মহাভারতের ভাব সমগ্রতার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধদেবের 'মহাভারত' চর্চার মূলে যে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ তার দিক থেকেও তিনি অখণ্ড মহাভারতের সমগ্রতার পক্ষপাতী। তাই অন্যান্য আলোচকদের বর্জিত অংশের মধ্যেও এই একটি ভাবগত ঐক্য তিনি খুঁজে পান। এই কারণে সৃষ্টিতত্ত্বগত কাহিনীও তাঁর কাছে প্রয়োজনীয়। বুদ্ধদেবের মতে, 'মহাভারতে'র মূল কাহিনী তাঁর প্রতিটি পর্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত - অচ্ছেদ্যভাবে, যুক্তিসিদ্ধভাবে। তিনি তাই 'মহাভারত'কে তুলনা করেছেন এক অন্তহীন অরণ্যের সঙ্গে। এই নিশ্ছিদ্র অরণ্যের মধ্যে দিয়েই এর কাহিনী এগিয়ে যায় এক অমোঘ পরিণামের দিকে। 'মহাভারতে'র কাহিনী এক মণ্ডলাকার সম্পূর্ণতা নিয়ে সমাপ্ত হয়। এই ঐক্যকে তিনি 'মহাভারতে'র পক্ষে সবচেয়ে বড় বিস্ময় বলেছেন। এবং একারনেই এটি শেষপর্যন্ত বহুবিদ্যার সংগ্রহশালা না হয়ে একটি গ্রন্থ হতে পেরেছে।

বুদ্ধদেব 'মহাভারত'কে একটি পরিকল্পিত কাহিনী সজ্জা হিসেবে, আধুনিক পারিভাষিক ধারনায় প্লটের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছেন। এই দৃষ্টি সমগ্রতার অভিনবত্ব এই যে, যে কোনো রচিত

সাহিত্যকে তা সংশ্লেষণী দৃষ্টি থেকে উপস্থিত করতে চায়। কিন্তু জাত মহাকাব্য সম্পর্কে আবহমান প্রচলিত দৃষ্টিকোণ এই যে, এই সব কাব্য কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি বা সম্পাদনা নয়। বহু স্তর পরম্পরায় এই কাব্য গ্রথিত এবং সংন্যস্ত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সংন্যস্ত কাহিনীগুলির তেমন কোনো ভাবগত ঐক্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ। বুদ্ধদেবের দৃষ্টিকোণ স্বীকার করলে এই স্তর পরম্পরায় বিন্যাসের ধারণাকেই অস্বীকার করতে হয়।

'মহাভারতে'র এই কাহিনীগত ঐক্যের সূত্রেই বুদ্ধদেব 'গীতা'কেও 'মহাভারতে'র অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। তাঁর মতে, 'গীতা' কোনো স্বনির্ভর গ্রন্থ নয়, 'মহাভারতে'র সামগ্রিক পরিকল্পনার অন্তর্গত। এবং সেই পটভূমিকায় স্থাপন করলে 'গীতা'র মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে এক তীব্র নাটক, বিগত ও পরবর্তী ঘটনাবলীর সঙ্গে যা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এসব কথা অবশ্য ঐতিহাসিকেরা কেউ স্বীকার করেন না। Winternitz উপরন্তু 'ভগবদ্গীতা'র মধ্যে বহু Contradiction দেখেছেন। এরকারন কেউ ভেবেছেন বইটি systematic philosophy নয়। Humboldt বলেন বইটি কোনো দার্শনিকের রচনা নয়, তা এক ঋষির মনোগত প্রেরণার ফল, R. Gorbe অবশ্য 'গীতা'র মধ্যে বহু Interpolation লক্ষ্য করেছেন এবং তিনি 'গীতা'র মূল অংশটিরও পুণর্নির্মাণ করেছিলেন। Winternitz এর বক্তব্য -

> There can hardly be any doubt that the Bhagabadgita
> did not belong to the origial heroic poem[৭৭]

তবে, 'গীতা'র একটি প্রাচীন রূপ মহাভারতের আদি অংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে তাঁর ধারণা।

বুদ্ধদেবের মতে, 'গীতা' 'মহাভারতে'রই অংশ। 'গীতা'র কবিত্ব অপূর্ব। কিন্তু আমরা 'মহাভারতে'র কথায় তাকে কি মূল 'মহাভারতে'র অংশ বলে স্বীকার করবো ? মনে রাখতে হবে, 'গীতা'য় যুধিষ্ঠিরের কোনো ভূমিকা নেই। আর যে জগৎবরেণ্য নাট্যচেতনা সম্পন্ন কবি এই অপূর্ব কাব্য প্রকটন করেছেন তাঁর মনে কি এই ভাবনা ছিল না যে, 'মহাভারতে'র নায়ক অন্ততঃ যুধিষ্ঠির নয়, - তিনি অর্জুন ; যাঁর সামান্য অস্ত্রত্যাগেও এই যুদ্ধজয় ছিল ধারণার অতীত - এই সব প্রশ্নও সংগত মনে হয়। তাছাড়া, যদি স্বীকার করি, 'মহাভারতে'র মূলে আছে একটি মহান পরিকল্পনা তাহলে প্রশ্ন করতে হয়, সেই পরিকল্পনা কার ? নিশ্চয় কোনো প্রজননশীল অথচ ধীমান স্রষ্টা তাঁর একক চিন্তায় গড়ে তুলেছেন সেই মহাকাব্যের ব্যাপ্তিমান বৈভব, যাকে এখন প্রায় এককজীবনে আয়ত্ত করাও মনুষ্য বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। আর, তা স্বীকার করলে নস্যাৎ করতে হয় এতদিনকার সমগ্র 'মহাভারত'চর্চার নিশানা। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে বাঙালী বঙ্কিমের 'মহাভারতে'র প্রক্ষেপ বিচার থেকে অধুনাতন পুরাণ 'পণ্ডিতদে'র যাবতীয় গবেষণার সারাৎসার এক লহমায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, এঁদের প্রায় সকলেরই চিন্তার ঐক্যসূত্র দেখতে পাওয়া যায় 'মহাভারতে'র বর্তমান আয়তনের ক্ষেত্রে শ্লোকের পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ায়। আর নতুবা স্বীকার করতে হয়, যেমন 'রাজসিংহে'র আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন বিধাতা পুরুষের ভূমিকা, অনকেটা তাঁকেই। তাঁরই অদৃশ্য পরিকল্পনায় স্তরীভবন প্রক্রিয়ায় জমে উঠেছে এই মহাভারতের পাললিক শিলার পার্বত্যপুঞ্জ। কিন্তু একথা কি বুদ্ধদেবও স্বীকার করবেন - এ প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার, অন্য আর একটি

সূত্র ধরে বলা যায় - লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, ক্রমশ যা ক্ষয়িষ্ণু, যা আত্মবলহীন, যার মধ্যে সাহিত্য সৌন্দর্যের নিশানা ছিল না, ক্রমশঃ সেই কাহিনী কবিতাগুলি লোকস্মৃতি থেকে ঝরে গেছে - কালকবলিত হয়ে। লোকশ্রুতিরই স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ এসে জড় হয়েছে বহু কাহিনী যা মূলকাহিনীর সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে কোনো অক্ষীণ বা উদ্দীপনাময় সূত্রে। আর হয়তো এজন্যই সেই আদি Ballad গায়কদের মধ্যে মূল কাহিনী - গ্রহণের কৃতিত্বে ব্যাসদেব নিত্যস্মৃত হয়ে চলেছেন।

কেন্দ্রীয় চরিত্র ঃ

'মহাভারতে' ঐক্যের অবলম্বন হিসেবে বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলেছেন। কৃষ্ণ বা অর্জুন নয়। দুর্বল, উদ্যমহীন, ভীরু যুধিষ্ঠিরই 'মহাভারতে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। রাজশেখর বসুও তাঁর অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় যুধিষ্ঠিরকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে আলোচনা করেছেন। তাঁর চরিত্রে নায়কোচিত অনেক গুণারলীরই অভাব, কিন্তু তিনি ধর্মবীর। তিনি পার্থিব আয়োজন, আড়ম্বব, ধনবাহুল্য এবং রাজীতিক ষড়যন্ত্রে থেকেও মুক্তিপ্রয়াসী। তবে পুরাণ শ্রবণে, জ্ঞান অর্জনে অন্য অনেকের চেয়ে তিনি মনোযোগী। তাঁর শিক্ষা অস্ত্রবিদ্যায় নয়, পুঁথিগত শাস্ত্রেও নয়, আত্মবিকাশে, আত্মসন্ধানে এবং বিশ্বচেতনায়। গোটা বনপর্ব যুধিষ্ঠিরের নীরব শিক্ষালাভের ইতিহাস। বারো বছর ধরে যে শিক্ষা তাঁর লব্ধ হল, এর পরে তা প্রয়োগ করতে হবে অরণ্যের নির্জনতায় নয় - 'রাজসভায়'।

সেরকম ক্রমাগত শিক্ষায় আত্মসচেতন ও প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেন কোনো মানুষ, বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সেই আত্মনিবিষ্ট, শিক্ষায় মনোনিবিষ্ট এক নায়ককে দেখেছেন। 'মহাভারত' একমাত্র তাই যুধিষ্ঠিরের কথা তাঁর ক্রমবিকশিত ব্যক্তিত্বের কথা। "বিভিন্ন কোরাস" নামক অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন এক যুধিষ্ঠিরের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন কোরাসের মিলিত সঙ্গীত। একদিকে তিনি শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, অন্যদিকে তিনি, প্রাজ্ঞ। যুধিষ্ঠির যেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকেই দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় জীবনকে মৃত্যু যেখানে উপস্থিত ও স্বীকৃত। তাই, মৃত্যু অনিবার্য জেনেও, আমরা মৃত্যুর কথা ধারণা করিনা — একে তিনি পৃথিবীর আশ্চর্য বলেছেন। আর এভাবেই ক্রমে তিনি পৌঁছে গেছেন একটি উপলব্ধির স্থিরবিন্দুতে। 'অর্জুন ও যুধিষ্ঠির' খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন অর্জুনের ক্ষাত্রতেজ ও বীর্যবত্তার পাশে যুধিষ্ঠির প্রায় নগন্য। অর্জুনের তুলনায় তাঁর চিত্তের স্থিরতা নেই একেবারে। কিন্তু সেই যুধিষ্ঠির কিরকম অনমনীয়ভাবে যুদ্ধে ইন্ধন যুগিয়েছেন। অন্যায় গদাযুদ্ধে ভীষণভাবে আহত দুর্যোধনকে পান্ডবের হাতে প্রাণ দেবার জন্য আহবান জানাতে তাঁর দ্বিধা হল না। কৃষ্ণের প্ররোচনায় একটি অর্দ্ধসত্য কথাও উচ্চারণ করেছেন। এই পর্যন্ত দেখলে ধর্মপুত্রকে ভন্ডচূড়ামনি কূটনীতিক বলে মনে হয়। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ভেবে দেখতে হবে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে কী করতে চেয়েছেন ব্যাসদেব,
> 'মহাভারতে'র মহান পরিকল্পনা কীভাবে এবং কী পরিমানে যুধিষ্ঠিরের
> উপর নির্ভর করছে।[৭৮]

বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন যুধিষ্ঠির এই যে তাঁর ধর্মের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এলেন, তার প্রয়োজন ছিলো এবং 'মহাভারতে'র পরিকল্পনা অনেকাংশেই যুধিষ্ঠিরের উপর নির্ভরশীল। তিনি যেমন জীবন—

বিনষ্ট করতে চাননা, হিংসা পরিত্যাগ করতে চান, তেমনই তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়বান। যে মাতা, পত্নী ও ভ্রাতাগণ তাঁরই জন্য পথে-পথে ঘুরছে, তাদের প্রতি তিনি উদাসীন নন। একদিকে যুদ্ধ, ক্ষয়ও হিংসায় অনীহা, অন্যদিকে দায়িত্বের বিরাট গুরুভার - এই দুই সংকটে যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্থ, অনবরত দোলায়মান। তাই তাঁর সংশয় ও অনিশ্চিতিবোধেরও শেষ নেই। শেষপর্যন্ত স্খলন-পতন স্ববিরোধ ও মনস্তাপের মধ্যদিয়েই তাঁর বিবর্তন রেখা স্পষ্ট হয়েছে 'মহাভারতে' —

তাই আমাদের মনের মধ্যে তিনি বড় হয়ে ওঠেন ক্রমশ।[৭৯]

এই বিবর্তনের ধারায় যুধিষ্ঠির এগিয়ে গেছেন 'মহাভারতে' - একটি বিন্দু থেকে ক্রমে জীবনের স্থির প্রত্যয়ে। মাঝে আছে জীবনের নানা ঘটনা - খণ্ডও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু, অর্জুনের মধ্যে সেরকম কিছু নেই। তাঁর প্রথম প্রত্যয়-ই স্থির-অভিজ্ঞতা রূপান্তরহীণ। বুদ্ধদেবের ভাষায় -

এক পরিণতিহীণ চির প্রফুল্ল বালক যেন অর্জুন, ... যাঁর সংকল্প
ও সম্পাদনায় কোনো ব্যবধান নেই।[৮০]

আর, যুধিষ্ঠিরের সংকল্প সুন্দর। কিন্তু সংকল্প রূপায়ণের পথে কত নানা ঘটনা - কত ক্ষয় ব্যক্তিত্বের, কত যে ছেড়ে দিতে হয় নিজেকে, কত যে বিশ্বাস ভেঙে যায়, - টুকরো টুকরো ভগ্ন প্রত্যয় থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের স্থির প্রত্যয়ে পৌছুতে পারেন তিনি। তাঁকে ধর্মপুরুষ, হিসেবে ভাবলে ও মহাপুরুষ হিসেবে সকলের নাগালের বাইরে রেখে দেওয়ার কথা মনে হয় না। রাম মহাপুরুষ অবতার ও মুক্তপুরুষ, কিন্তু বুদ্ধদেবের মতে, 'মহাভারতে'র যুধিষ্ঠির অবিরত কর্মে জড়িত, মানুষের মতোই পদে পদে তাঁর স্খলন-পতন। সেকারনেই তিনি রামের চেয়েও অনেক বেশী জীবন্ত, মানুষ হিসেবে স্মরণযোগ্য হয়ে আছেন।

এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিস্কার যে বুদ্ধদেবের মতো অন্যান্য আলোচকদের যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিপাদনের অবকাশ ছিলো না। বুদ্ধদেব যেহেতু পরিকল্পনা প্রবণ, কাহিনী সমগ্রতার ভাবকেন্দ্রে যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসেবে উপন্যস্ত করতে চান তাই 'মহাভারতের কথা' চর্চার শুরুই হয়েছে বনবাসের শেষ দিন থেকে। যেখানে অর্জুনের বীরত্ব বা ভীমের বাহুবল নয়, যুধিষ্ঠিরের জ্ঞানবল, তাঁর আত্মশক্তির মহিমা জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল। ইংরেজ লেখকদের কারো কারো লেখায় - 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের plot বিন্যাসের মহত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। 'ইলিয়ড' কাব্যের এই plot চিত্রণ অ্যারিষ্টটলেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। আধুনিক সামলোচকের কেউ কেউ plot বিন্যাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন অ্যাকিলিসই 'ইলিয়ড' কাব্যের নায়ক। বিগত যুদ্ধক্লান্ত বৎসরগুলির অনুন্মোচিত কাহিনীপট দশম বৎসরের যে ঘটনাকে অবলম্বন করে প্রথম উন্মোচনের অবকাশ লাভ করতে পারলো, সেখানে অ্যাকিলিসের চিত্তদীর্ণ অপমান এবং ক্ষোভই হয়ে উঠলো মুখ্য, এবং শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই এই অ্যাকিলিসই হলেন বীর নায়ক - কারন হেক্টরের মৃত্যুতে উচ্চারিত হল তাঁরই জয়গাথা। 'ইলিয়ডে'র plot নায়কের জন্ম থেকে মৃত্যুতে সম্পন্ন হয়নি - তা ওডিসির মতো নায়কের বহুবীরত্বপূর্ণ কাহিনীর বিন্যাস নয়, কোনো এক নায়ককেন্দ্রিক বহু উপকাহিনীর মালা নয় —

The plot of the Illiad focouses on one episode in the

hero's life, just as his characterisation focouses on the
element of his psyche and the subeject is the same in both anger.[৮১]

কীভাবে অ্যাকিলিসের মধ্যে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো এবং কীভাবেই বা হেক্টরের মৃত্যুতে তার প্রশমন ঘটলো এরই কাহিনী 'ইলিয়ড'।

অন্যপক্ষে, এরকম কোনো একটি সূত্রে 'মহাভারতে'র কাহিনীকে বিন্যস্ত করা দুস্কর। কারণ 'মহাভারতে'র কাহিনীবৃত্তকে একটি সমগ্রের পরিকল্পিত বিন্যাস বলে স্বীকার করলে আর বনবাসের শেষদিন থেকে তাকে পুণর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। বরং প্রচলিত অর্থে কাহিনী যেমন মহাকাব্যে episode আকার ধারণ করে 'মহাভারত'ও সেই বহু উপকাহিনীতে ভরা। সেখানে পান্ডবদের উত্তর পুরুষদের পাপস্খালনের জন্য কাহিনী গ্রথিত হচ্ছে। পুরুষানুক্রমিক পরিচয়, যুধিষ্ঠিরের বা পান্ডব ও কৌরবদের জন্ম কথা এবং তাদের ক্রমবর্ধমান বিসম্বাদের কাহিনী-মধ্যবর্তী কাহিনী উপকাহিনী পার হয়ে এবং শোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত হচ্ছে। নায়কের জন্ম মৃত্যু বর্ণনার যে ছক মহাকবিরা ব্যবহার করেন এ কাব্য তা থেকেও মুক্ত নয়। সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে নায়ক হিসাবে উপস্থাপিত করতে চাইলেও সুবিন্যাস্ত plot -এর ধারণা গ্রহণ করা দুস্কর হয়ে পড়ে।

তুলনামূলক পুরাণ চর্চা ঃ

'মেঘনাদবধ'কাব্যের পৌরাণিক উৎস প্রসঙ্গে বন্ধু রাজনারয়ণ বসুকে একটি চিঠিতে মধুসূদন লিখেছিলেন —

I love the grand mythology of our ancestors. It is full of
poetry. A fellow with an inventive head can manufacture
the most beautiful things out of it.[৮২]

মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক প্রভাব প্রসঙ্গে রাজনারায়ণকে আরেকটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন —

It is my ambition to exquisite the graces of Greek mythology
on our own;[৮৩]

প্রতীচ্যও প্রাচ্য পুরাণকাহিনীর উপাদান গ্রহণ করে তিনি অভিনব শিল্পকর্মের স্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। পুরাণের নবায়ণ লক্ষ্যণীয় হয়েছে রবীন্দ্র-সৃষ্টিতেও। তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা' নবরূপা 'মহাভারতে'র মনিপুর রাজকন্যাকে নিজস্ব কল্পনার পটে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য পুরাণচর্চা বিশেষভাবেই জায়গা করে নিয়েছিলো। বুদ্ধদেবের পুরাণচর্চা এই ধারায় উল্লেখযোগ্য।

'মহাভারতের কথা'য় তাঁর পুরাণচর্চার বিশেষত্ব হলো — শুধু নিজের মনোভূমির দর্পনে প্রাচ্য পৌরাণিক প্রসঙ্গের নবীকরণ নয়, কিংবা পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখমাত্রও নয়। 'মহাভারত' সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটি পৌরাণিক ঘটনার সঙ্গে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন পুরাণ প্রসঙ্গের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কখনো একটি প্রসঙ্গের মধ্যে পূর্ববতী বা পরবর্তী ঘটনার পূর্বাভাস দেখতে পেয়েছেন। 'পূর্বাভাস ও

প্রতিরূপ' নামের খণ্ডিতপর্বে এরকম অনুরূপ, প্রতিরূপ পুরাণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাচ্য-প্যাশ্চাত্ত্য মিথ-পুরাণের তুলনা করেছেন তিনি। 'মহাভারতের কথা'র মুখবন্ধে তিনি নিজেই লিখেছিলেন যে, তাঁর 'মহাভারত'চর্চা 'মিথলজির উপর নির্ভরশীল।'[৮৪] দ্বিতীয়তঃ, তিনি উল্লেখ করেছেন —

> আমার প্রধান আলোচ্য 'মহাভারত' হলেও তুলনা ও প্রতিতুলনার
> ধরনে 'রামায়ণ' ও অন্যান্য পুরাণের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই
> গ্রথিত হয়ে গেছে ...।[৮৫]

ইতোপূর্বে প্রকাশিত 'রামায়ণ' প্রবন্ধে (১৯৪৭) তিনি 'রামায়ণে'র সঙ্গে 'মহাভারতে'র তুলনা করেছেন। তাঁর মতে -

> 'মহাভারতে' দেখতে পাই চিরকালের সমস্ত মানবজীবনের
> প্রতিবিম্বনঃ তাতে এমন মন্দেরও সন্ধান পাই যাতে এই ঘোর
> কলিতে আমরা আঁতকে উঠি, ... এবং আমরা যাকে কবিত্ব বলি
> তাতে 'রামায়ণ' সম্ভবত সমৃদ্ধতর।[৮৬]

'মহাভারতের কথা'র মহাভারতের সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে 'রামায়ণে'র তিনি তুলনা করেছেন। 'এক বিশ্ববিদ্যালয়' নামক খণ্ডিত পর্বে তিনি উল্লেখ করেছেন, পৌরাণিক পুরুষ

> কৃষ্ণের পরেই যাঁর স্থান - তিনিও ভ্রাতা পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে
> চোদ্দ বছর বনবাসে কাটিয়েছিলেন।[৮৭]

বলাইবাহুল্য, এখানে বনপর্বে দ্যুতক্রীড়ায় পরাজিত যুধিষ্ঠিরের বনবাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে 'রামায়ণে'র রামচন্দ্রের বনবাসকে। অবশ্য এই দুই বনবাসের মধ্যে চাক্ষুষ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও এদের অন্তঃপ্রকৃতি যে ভিন্ন তাও উল্লেখ করেছেন রামের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের তুলনার মাধ্যমে। দুই বনবাসের মূলেই ছিলো সত্য রক্ষা। একজন পিতৃসত্য পালনার্থে, অন্যজন দ্যূতক্রীড়ার সত্য রক্ষার্থে-বনবাসী। রামের বনবাসের কারন রাম নিজে নয়, যুধিষ্ঠিরের বনবাসের কারন নিজের দ্যূতক্রীড়া, স্বদোষ এবং স্বকৃত কর্মেরফলে তাঁর বনবাস। নিজে তিনি অপরাধী, তাই মনে তাঁর সুখ নেই। কিন্তু, রাম সদা প্রসন্ন। ভালো কাজ করে বনে এসেছেন তিনি। রামও যুধিষ্ঠিরের তুলনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আরো জানিয়েছেন যে দুজনেই বহুদুঃখ ভোগী। কিন্তু, যুধিষ্ঠির যা কিছু নন বা হতে পারেননি, রাম সহজাতও সমন্বিতভাবে তা-ই। কর্মিষ্ঠ তিনি, বীর যোদ্ধা, তিনি রাজনীতি বোঝেন, আত্মবিশ্বাসে অটল, সর্বোতো ভাবে লোকনায়ক হবার যোগ্য তিনি।[৮৮] আর যুধিষ্ঠির সম্পর্কে লিখেছেন —

> যুধিষ্ঠির তিনি ? রাজ্য হারিয়ে তেমনি কি তিনি ব্যাকুল,
> যেমন কান্তাবিরহে রামচন্দ্র? না, তা তিনি নন, ...।[৮৯]

'মহাভারত' সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব মহাভারতীয় পুরাণকথাক 'রামায়ণে'র কাহিনীর সঙ্গেও তুলনা করেছেন। 'রামায়ণে'র তুলনায় 'মহাভারতে'ই তিনি গার্হস্থ্য চিত্র বেশী দেখেছেন। 'ঘরে বাইরে' এই খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব 'রামায়ণে'র তুলনায় 'মহাভারত'কেই 'গার্হস্থ্য আশ্রমের কাব্য' বলেছেন। রামায়ণ

আসলে এক মহাপুরুষের জীবনচরিত। এই মহাপুরুষ স্বয়ং রামচন্দ্র। অন্যদিকে, গার্হস্থ্যধর্মের মূর্তবিগ্রহ 'মহাভারতে'র যুধিষ্ঠির। ধর্মপুত্র হয়েও কাম ও অর্থকে তিনি অবজ্ঞা করেন না। তিনি সর্বলক্ষণযুক্ত, গৃহস্থ। তাঁকে দেখা যায় প্রথম থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর বিধবা মাতা ও চার ভাই ও সহধর্মিনীর সঙ্গে ব্যক্তিগত স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁদের ভরণ পোষন ও রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা তাঁকে আবিষ্ট করে রেখেছে। ধর্মবকের প্রশ্রের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, অঋণী, অপ্রবাসী হয়ে যিনি স্বগৃহে শাকান্ন ভোজন করেন সেই সুখী। যুধিষ্ঠিরের এই উত্তরের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায় -গার্হস্থ্যধর্মী যুধিষ্ঠিরকে। গৃহাশ্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হলো বিবাহিত অবস্থা। যুধিষ্ঠির এই ধর্মেও একনিষ্ঠ। ভীম ও অর্জুন একাধিক ভার্যা পরিবৃত। কিন্তু-এক পত্নীত্ব যুধিষ্ঠিরের সারাজীবন। নিরীহ যুধিষ্ঠিরকেই ভার্যার বিষোদ্গার সহ্য করতে হয়েছে বেশী। মোটকথা, গার্হস্থ্য জীবনের বিষামৃত পান করেছেন তিনিই -

> তাঁর গৃহস্থোচিত কর্তব্য তাঁকে জাগিয়ে রাখে, সর্বদা বেদনা দেয়।[৯০]

সেই বেদনার তীব্রতম প্রকাশ যুদ্ধকালীন ক্রিয়াকর্মে। পরম গুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারন হতে হলো তাঁকে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> ব্যসদেব যেন আমাদের মর্মে শেল বিঁধিযে বুঝিয়ে দিলেন
> গৃহাশ্রমের দায়িত্ব কী নিদারুণ।[৯১]

টলস্টয় লিখিত 'war and peace' উপন্যাসের প্রধানতম পুরুষ চরিত্র পিয়ের বেজুখহ্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন যুধিষ্ঠিরকে। নেপোলিয়ানের রুশ অভিযান ব্যর্থ হলেও তাঁর সৈন্যদের হাতে বন্দী রুশ সেনাদের মধ্যে পিয়েরও একজন। সদ্য ঘটে যাওয়া যুদ্ধের বীভৎসতায় ক্ষত বিক্ষত পিয়ের। কিন্তু, এর মধ্যদিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, জীবনের যা কিছু সারতত্ত্ব, তা আছে জীবনেরই মধ্যে। জীবনের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের উপস্থিতি - জীবনই ঐশ্বরিক চেতনার অন্যনাম। মৃত্যুকীর্ণ জীতনের মধ্যেই আছে মুক্তির স্বাদ। এই পিয়ের নাটাশা রস্তভকে বিয়ে করে বাঁধা পড়লেও গার্হস্থ্যবৃত্তে -

> গৃহ রচনা করলো পিয়ের নাটাশা, কিন্তু শুধু নিজেদের জন্য -
> রবীন্দ্রনাথের অর্থে গৃহাশ্রম সেটিকে বলা যায় না, সমাজের জন্য
> কোনো আশ্রয় নেই সেখানে, ... বিশ্বজীবনের বিপুল অর্কেষ্টার
> ক্ষীণতম মূর্চ্ছনাও সেখানে পৌঁছয় না।[৯২]

গার্হস্থ্যগণ্ডীর এরকম অপরিসর বৃত্তের মধ্যে পিয়ের - নাটাশার জীবন -পরিক্রমা অস্বাভাবিক মনে হয়। মনে হয়, এক বৃহত্তর, মহত্তর জগৎ থেকে টলষ্টয় তাঁদের নির্বাসিত করেছেন। এই অতৃপ্তিবোধ 'war and peace'এর পিয়ের নাটাশার বৃত্তে যেমন থেকে যায়, তেমনই হতে পারতো যুধিষ্ঠির - দ্রৌপদীর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপরবর্তী গার্হস্থ্য সুখচিত্রণে। কিন্তু ব্যাসদেব তা করেননি। তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে এক বৃহত্তর জগতে মুক্ত করে দিলেন, পাঠকের প্রত্যাশা অনুযায়ী। গার্হস্থ্য ধর্মে তীব্র আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও, 'অসংখ্য বন্ধনমাপে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ পেতে ক্রমে তিনি উত্তরণের পথে এগিয়েছেন।

হোমারের 'ওডিসি' কাব্যের নায়ক আদিসেয়ুসের সঙ্গেও তুলনা করছেন বুদ্ধদেব যুধিষ্ঠিরকে।

তাঁর মতে, আদিসেয়ুস হলেন যুধিষ্ঠিরের বিপরীত মেরুতে। আদিসেয়ুস নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে স্বদেশে ফিরে গার্হস্থ্য সুখে মগ্ন হয়েছিলেন। হোমার তাঁর মধ্যে আর কোনো বেদনার অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু গ্রীক কবি নিকোস কাজান্তজাকিস -এর কাব্যে আদিসেয়ুসের উত্তরজীবন ঘটনাবহুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে দেখা যায় জীবনে নানা ধ্বংশ, নির্মান, সংগ্রামের অভিজ্ঞতার শেষে দক্ষিণ মেরুপথে যাত্রা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি লাভ করলেন আদিসেয়ুস। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে এই গ্রীক কবির কাব্যের আদিসেয়ুসের মধ্যেই আছে ভারতীয় সাহিত্যের অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মিলিত রূপ। তিনি লিখেছেন —

মনে হয় যেন অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে এক সত্তায় মিলিয়ে দেয়া হ'লো।[৯৩]

ওডিসির নায়ক গার্হস্থ্যজীবনে বদ্ধ হয়েছিলেন, আর গ্রীক কবি কাজান্তজাকিস্-এর নায়ক পশ্চিম সমুদ্রে মহামুক্তির পথে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। গার্হস্থ্য ধর্মে যুধিষ্ঠিরেরও আগ্রহ ছিলো, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর, সম্ভোগের পথে যখন শুধু পাণ্ডবেরই অধিকার - তখন কি এক অমোঘ আকর্ষণে মহাপ্রস্থানের পথে পা বাড়ালেন যুধিষ্ঠির -

হিমালয়ের ধাপে ধাপে তাঁর উর্দ্ধারোহনের শেষ দৃশ্যটিতে যুধিষ্ঠির
লব্ধ হলেন তাঁর পরিপূর্ণতা - আদিসেয়ুসের ধরনে নয়,
সম্পূর্ণ নিজের ধরনে - তাঁর সমগ্র অতীত জীবনকে এবং
'মহাভারতে'র বিশাল কাহিনীকে যেন অল্প কয়েকটি ধ্যানগম্ভীর
মুহূর্তের মধ্যে সংহত করে নিয়ে।[৯৪]

শুধূ ওডিসির অদিসেয়ুস প্রসঙ্গ নয় 'পূর্বাভাসও প্রতিরূপ' খণ্ডপর্বে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন

প্রতিরূপ আরো পাওয়া যায় - মহাভারতের বাইরে জাতকগ্রন্থে
... দেব ধর্মজাতক কথিকাটিকে মনে হয় 'রামায়ণ',
'মহাভারতে'র সংমিশ্রণে রচিত।[৯৫]

বুদ্ধদেব এখানে স্পষ্টই জানিয়েছেন যে, তিনি 'মহাভারত' প্রসঙ্গে যেসব পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন তার অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো 'তুলনা ও প্রতিতুলনা' সেইসব পৌরাণিক প্রসঙ্গের উৎস নির্নয় বা কালগত ব্যবধান নিয়ে তিনি ভাবিত ছিলেন না। তাই 'মহাভারতে'র সঙ্গে 'রামায়ণের' যেমন তুলনা করেছেন, তেমনি সেই তুলনার টানে যুক্ত হয়েছে জাতকের কাহিনী। জাতক-কাহিনী তিনি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করে দেখলেন যে, এর সঙ্গে কাহিনীগত দিক থেকে 'রামায়ণের' সাদৃশ চোখে পড়ে। কিছুদুর পর্যন্ত 'রামায়ণ' পরে 'মহাভারতে'র সঙ্গেও মিল দেখিয়েছেন তিনি। — জাতকের কাহিনীতেও আছে বোধিসত্ত্বের বিমাতার চক্রান্তে বনবাসী হওয়ার কাহিনী। এর সঙ্গে 'রামায়ণের' সাদৃশ্য থাকলে ও পরবর্তী অংশের সঙ্গে 'মহাভারতে'র ঘটনাগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 'মহাভারতে' ধর্মবকের প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরের উত্তরদানের ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষনীয় হয়েছে। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এখানেও এক সরোবর, কুবেরসখা উদকরাক্ষস তাঁর অধিকারী ;

এখানে ও জলাহরণ ও প্রশ্নোত্তর, অপমৃত্যু ও উদ্ধার।[৯৬]

অবশ্য বুদ্ধদেব বলেছেন যে রাম যেমন যুধিষ্ঠিরের অনাত্মীয় বোধিসত্ত্বের সঙ্গেও যুধিষ্ঠিরের কোনো সাদৃশ্য নেই -দুজনেই দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। বোধিসত্ত্ব যুধিষ্ঠিরের তুলনায় অনেকবেশী প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্বভাবতই কতৃত্বক্ষম। জলাহরণ করতেগিয়ে ভ্রাতৃবর্গ সরোবরবাসী যক্ষ কর্তৃক নিগৃহীত হলে উভয়েই ভ্রাতৃউদ্ধারে ঘটনাস্থলে যান। ধনুর্বান ও অসি নিয়ে প্রস্তুত হলেন বোধিসত্ত্ব, আর যুধিষ্ঠিরের হাতে কোনো অস্ত্র নেই। তবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে একমত না হয়ে বলা যায় যে এক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির অনেকবেশী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অস্ত্রবলে যে তিনি পেরে উঠবেন না তা জানতেন বলেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করেছেন। অবশ্য, একটি ভ্রাতার পুণরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি পেয়ে উভয়েই চাইলেন বৈমাত্রেয়কে। বুদ্ধদেব বসুর মতে, তাঁদের প্রত্যাশায় আপাত মিল থাকলেও প্রণোদনায় এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বোধিসত্ত্ব ছিলেন লোকনিন্দা বিষয়ে সতর্ক আর যুধিষ্ঠির নিজের হিতাহিত না ভেবে, শুধু চেয়েছিলেন তাঁর বিমাতারও একটি অন্ততঃ পুত্র বেঁচে থাক।

'আগুন জলের গল্প' শিরোনামে বুদ্ধদেব যে খণ্ডপর্বটি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তিনি এমন কয়েকটি মিথের উল্লেখ করেছেন, যেগুলি ভারতীয় পুরাণে নেই। পাশ্চাত্ত্য সেইসব মিথগুলির সঙ্গে তিনি মহাভারতের কোনো পৌরাণিক ঘটনার তুলনা করেছেন। খাণ্ডব বনদাহনের ঘটনাটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন অরণ্যের সঙ্গে কৃষিসভ্যতার দ্বন্দ্ব। বুদ্ধদেব লিখেছেন -

> খান্ডববন দাহনের উপরিস্তরজাত অর্থটি খুব স্পষ্ট। নগর নির্মানের
> জন্য অরণ্য ধ্বংস করা হ'লো, ... একে বলা যায় মানবেতিহাসের
> একটি প্রধান পদক্ষেপ, বলা যায় বর্বরতার বিরূদ্ধে সভ্যতার অভিযান।[৯৪]

এই খাণ্ডবদাহনের ঘটনার মধ্যেই তিনি আরো অনেক অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে,

> একটি বৈশ্বিক পটভূমির উপর এর প্রতিষ্ঠা।[৯৫]

ইলিয়াড বর্ণিত নদীর সঙ্গে অ্যাকিলিউসের সংগ্রাম (সর্গ-২১) - এই মিথটির সঙ্গে বুদ্ধদেব খাণ্ডবদাহনের মিল দেখেছেন। অ্যাকিলিউসকে যুদ্ধসজ্জা তৈরী করে দিয়েছিলেন হেফাইস্তস। আমাদের ভাষায় যাঁর নাম বিশ্বকর্মা। সেই সজ্জা গ্রহণ করে আকিউলিস হয়েছিলেন অগ্নির মতোই ভয়ংকর। এবং শেষে হেফাইস্তস নিজহাতে যুদ্ধভার গ্রহণ করেন —

> তাঁর ফুৎকারে জ্বলে উঠলো আগুন - ... দগ্ধ হ'লো শবপুঞ্জ
> ও প্রান্তর ... এমনকি জলের তলায় যে মাছেরা নিশ্চিন্তে
> খেলা করে, তারাও বিদ্ধ হ'লো সেই উত্তাপে, ... আগুনে দগ্ধ
> হ'লো জল।[৯৬]

পাশ্চাত্ত্য এই মিথের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ও পরিপ্রেক্ষিত আলাদা হতে পারে, কিন্তু কিছু কিছু সাদৃশ্য আছেই খান্ডববন দাহনের সঙ্গে। খান্ডবদাহনেও অগ্নি তার লেলিহান শিখা বিস্তার করে দগ্ধ করে ফেলে সবকিছু। আগুন জলের দ্বন্দ্বেঅগ্নি দেবতাই জয়ী হলেন, 'মহাভারতে' এবং 'ইলিয়ডে'। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য

মিথ দুটির মধ্যে অভিপ্রায় গত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু। দুটি মিথেই আছে দ্বন্দ্ব ও মিত্রতার সম্পর্ক।

'ইলিয়ডে'র এই অংশের সঙ্গে খান্ডববন দাহনের যে মিল তা হল - দুটো ঘটনাতেই আছে দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনী। তবে বুদ্ধদেব বসু এই দ্বন্দ্বের আড়ালে অন্য এক বার্তা পরিবেশন করেছেন বলে মনে হয়, যা মানুষের চিত্তবৃত্তিগত এবং প্রাকৃত তা হল

> বৃষ্টির বিরূদ্ধে দাবানল, শান্তিজলের বিরূদ্ধে রণাগ্নি, নিম্নগামী
> স্নিগ্ধতার বিরূদ্ধে উত্তপ্ত ও আরোহমাণ উচ্চাভিলাষ, বিভেদহীন
> স্রোতের বিরূদ্ধে বিচ্ছেদপ্রবণ সংগ্রামলিপ্সা।[১০০]

আগুন জলের দ্বন্দ্বের মধ্যে এ সবই গৃহীত হয়েছে। জলের বিরূদ্ধে আগুনের যুদ্ধ অর্থ্যাৎ স্নিগ্ধতার বিরূদ্ধে উগ্রতার যুদ্ধ সেদিন থেকেই শুরু, হ'ল। এর হাত থেকে মানুষের নিস্তার নেই।

তবে 'আগুন-জলের গল্পে' শুধু শত্রুতাই নয় - একটি মিত্রতার সুরও বুদ্ধদেব বসু খুঁজে পেয়েছেন। 'ইলিয়ডে' দেখি যে নদী শেষপর্যন্ত কথা দিয়েছিল ট্রয়বিরূদ্ধ কাজ আর করবে না। আর খান্ডবদাহনে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং জলেশ্বর অর্থ্যাৎ বরুণই অর্জুনকে দান করেন গাণ্ডীবধনু, দুটি অক্ষয়তূণ এবং বিশ্বকর্মা রচিত একদিব্যরথ। আর তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন —

> জলের সঙ্গে আগুনের যুদ্ধে জলেশ্বরই সহকারী।[১০১]

বিষয়টি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। রাজনৈতিক কোনো চুক্তি কিংবা হিংসার বিরূদ্ধে হিংসা কখনোই সৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারে না। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

> সন্ধি, যোজনা, মিলন - এবং দুই বিরূদ্ধ শক্তির মিলন -
> ... নারীর গর্ভে জল, পুরুষের বীর্যে আগুন - এদেরই সহকর্মিতার
> ফলে জন্ম নেয় প্রাণীরা। ... বিপরীত এই সন্ধির উপরেই নির্ভর
> করে আছে অন্য সব জন্ম ও উৎপাদন।[১০২]

বৃষ্টি ও রৌদ্রের সমবায়ে ফসল উৎপন্ন হয়, আর আগুন ও জলে তৈরী হয় আমাদের খাদ্য - অন্ন। আর-

> জড়প্রকৃতির এই মিলনধর্মিতা থেকেই যুধিষ্ঠির একটি মানবিক
> নীতি আহরণ করেছিলেন।[১০৩]

তবে এই নীতি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাঁকে সাহায্য করেনি। আর সেকারনেই, আধুনিক যুগের সমালোচক যুধিষ্ঠিরের 'চিন্তাপীড়িত অস্থৈর্যের চেয়ে' অর্জুনের 'নিঃসংশয় যুদ্ধনীতিকেই' গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করেন।

একহিসেবে, যুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক কবি-শিল্পীরাই মিথ পুরাণের ব্যবহার করেছেন বেশী। এই বিরূপ বিশ্বে নিয়ত একাকীত্ব ও যন্ত্রনায় জর্জরিত হয়ে তাঁরা আদিম মিথিক ভুবনে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। বুদ্ধিগত চৈতন্যের উপর স্থান দিতে চেয়েছেন আদিম স্বপ্ন কল্পনার জগৎকে। কবি শিল্পীর

মনের যাবতীয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রত্যাশা একটি স্থিরভূমি পেয়েছে মিথ পুরাণ বিষয়ক রচনাগুলিতে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বুদ্ধদেব তাঁর ভারতকথা ব্যাখ্যা করেছেন। মিথ-পুরাণের আলো জ্বালা পথে যুধিষ্ঠিরের নায়কত্ব প্রতিপাদন করেছেন তিনি। জীবনের সমস্ত সমস্যা, বেদনা, বিচ্ছেদ-অন্তর্দাহের দিনগুলি পেরিয়ে সবশেষে তিনি হলেন অমৃতাভিলাষী। অনন্তের পথে তাঁর এই অভিযাত্রা আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে একটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্থানের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন আবহমান মানবজীবনের চিত্র। বহুভাষাবিদ বুদ্ধদেব ভারতীয় - অভারতীয় সাহিত্য নির্বিশেষে পাঠ করতেন। এর সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাঁর সমালোচনা কর্মে। তিনি পৃথিবীর সাহিত্য ও পুরাকথার সঙ্গে তুলনা প্রতিতুলনার মাধ্যমে 'মহাভারত' কথা ব্যাখ্যা করেন। তাই 'মহাভারতে' যুধিষ্ঠিরের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'ওডিসি'র আদিসেয়ুস প্রসঙ্গ ভোলেন না। তিনি উল্লেখ করেছেন গ্রীক কবির নায়ক আদিসেয়ুসের মধ্যে যেন যুধিষ্ঠির, অর্জুনের সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেছে। এই দুই সত্তার মিলিত রূপ আদিসেয়ুস। আসলে, বুদ্ধদেবের গভীর অধ্যয়ণশীল মন 'মহাভারত' সমালোচনায় পৃথিবী পরিক্রমা করেছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অজস্র মণিমুক্তাগুলি সূত্রবদ্ধ করেছেন তিনি। বিভিন্ন সাহিত্যে, পুরাকথায় ছড়ানো উপাদান গুলির সংযোগে তিনি ভারতকথা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর 'মহাভারত' সমালোচনায় তাই হোমারের 'ওডিসি' - সেই সূত্রে দান্তে, এমনকি গ্রীক কবি, লাতিন সাহিত্যিকের রচনাও বাদ পড়েনি।

। ঘ ।

'রামায়ণ' সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের রচনা মাত্র পনেরো ষোল পাতার একটি প্রবন্ধ। আর 'মহাভারত' সম্বন্ধে তিনি পরিণত বয়সে ক্রমাগত গভীর আগ্রহ বোধ করে চলেছেন। 'রাবণ' নামে যে নাট্য প্রচেষ্টা তাঁর কৈশোরক রচনা হিসেবে উক্ত হয় তা কেবল ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে এখন আমাদের কাছে আত্মরক্ষা করে চলেছে। তাঁর এই প্রবন্ধটি ছাড়া বড়জোর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্য নাট্যের একটি দেহপঞ্জর কিংবা 'মাইকেল' প্রবন্ধে দু'চারটি মন্তব্য 'রামায়ণ' সম্বন্ধে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যপক্ষে 'মহাভারত' তাঁকে যুগিয়েছে বহু কাব্যোপকরণ - কাব্যবস্তু চিন্তার বহু উপাদান। একটি বৃহৎ গদ্যরচনা - চিন্তামূলক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'মহাভারতে'র বিশ্লেষণী আলোচনাও তিনি লিখে গেছেন যা অন্য কোনো প্রাচীন সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে রচিত হয়নি।

বুদ্ধদেবের প্রাচীন সাহিত্যচর্চার আশ্রয় তিনটি মাত্র গ্রন্থ 'রামায়ণ', মেঘদূত' এবং 'মহাভারত'। প্রথম দুটির মধ্যে ব্যবধান দশ বছরের, পরের দুটির ক্ষেত্রে ব্যবধান যদিও সতের বছরের, তবু, ১৯৬৪-৬৫তেই এই ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে এবং তার লালন প্রকর্ষে কেটেছে আরো প্রায় আট/দশ বছর। প্রাচীন সাহিত্যর চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম অভিমুখিতা 'রামায়ণে'র দিকে।

'রামায়ণ' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যে কটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলি সম্ভবতঃ তাঁর আগে তোলা অসম্ভব ছিলো। বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিক ধ্যান-ধারনার খোলা হাওয়া তাঁরা নিয়ে আসতে চাইলেন তাতে কোনো রচনাকে কেবল সাহিত্যবোধের দৃষ্টি থেকে দেখার সুবিধা হ'ল। একথা ঠিকই যে, সাহিত্যিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে বঙ্কিমের বা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিও লেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যচর্চায় বঙ্কিম ইতিহাসের বিচার ও পরীক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজের চিন্তার দর্পনে 'মহাভারতে'র যুগ ও জীবনের পুণর্গঠন করেছিলেন। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' সেইরকম রচনা। রবীন্দ্রনাথের 'রামায়ণ' চর্চার ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তাতে কখনো সাহিত্য সমালোচনার বিচারমূলকতা বড় হয়নি। কখনো বা ভক্তির আবেগ কাজ করেছে কখনো বা কাজ করেছে সমাজ ও ইতিহাস ব্যাখ্যার দৃষ্টি। ফলে, 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা কিংবা জাভাযাত্রীর পত্রে, 'রামায়ণের' মধ্যে জাতিগত বিরোধ ও সমণ্বয়ের রূপ কিংবা কৃষি সভ্যতার রূপক সন্ধান করেছেন তিনি। 'রামায়ণে'র এইরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইংরেজ আলোচকরা অগ্রণী ছিলেন। ওয়েবার কিংবা লাসেন 'রামায়ণে'র মধ্যে দক্ষির ভারতে আর্যসভ্যতা বিস্তারের রূপক সন্ধান করেছিলেন। কারো কারো মতে, 'রামায়ণে' রাম-রাবণের যুদ্ধ আসলে ছিল আর্য ও বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধের রূপক মাত্র। সুতরাং এই রূপক চর্চার একটা সূত্র ছিলোই। রবীন্দ্রনাথও এই রূপক বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভাবগত ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। 'রামায়ণ' সাহিত্য কিন্তু সেই সাহিত্যের মধ্যেই আছে ইতিহাসের দিকনির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাস ব্যাখ্যার দৃষ্টিভঙ্গিএকেবারে বর্জন করেন নি। তাঁরও মনে হয়েছে, webar এর মতো, 'রামায়ণে' আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সংঘাতের চিত্র আছে। হরধনু ভঙ্গ 'রামায়ণে' একটা মোড় ফেরার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ 'জাভাযাত্রীর পত্রে' লিখেছিলেন —

> আর্যাবর্তের পূর্ব অংশ থেকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত
> কৃষিকে বহন করে ক্ষত্রিয়দের যে অভিযান হয়েছিল সে সহজে
> হয়নি, তার পিছনে ঘরে-বাইরে মস্ত একটা দ্বন্দ্ব ছিল। সেই
> ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে নিহিত-অরণ্যের
> সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব।[১০৪]

সুতরাং 'রামায়ণের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও ঐতিহাসিক সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যার মডেল গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ভিন্নরীতির কিন্তু মডেলটি বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সমাজভিত্তিক। কিন্তু দেখা গেল যে, বুদ্ধদেব বসু 'রামায়ণ' চর্চায় এই সমাজভিত্তিক ব্যাখ্যা একেবারেই ব্যবহার করলেন না। তিনি বরং সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'রামায়ণ'কে দেখলেন। যদি 'রামায়ণ' সম্বন্ধে আমাদের বোধ কোনো গভীরতা পায় তাহলেই, সেই দৃষ্টিকোণের মূল্য অবশ্য গ্রাহ্য হবে।

বুদ্ধদেব বসু শুধু 'রামায়ণ'-ই নয়, 'মেঘদূত' বা 'মহাভারত' তিনটি ক্ষেত্রেই এই সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন। মনে রাখা যেতে পারে এই দৃষ্টিকোণ তখন পশ্চিমের সাহিত্য ব্যাখ্যায় গুরুত্ব পাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, যাঁরা আধুনিক সমালোচনা লিখছিলেন, New criticism-এর চর্চা করছিলেন, তাঁদের কাছে এই দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব ছিল। বুদ্ধদেব এই পশ্চিমী সাহিত্যভাবনা গ্রহণ করেছিলেন বললে ভুল হয় না। সাহিত্যের ব্যাখ্যায় অতিরিক্ত মনন প্রাধান্য বা বুদ্ধিচেতনা কিংবা সমাজতাত্ত্বিকের ভাবনা যে তাঁর পছন্দ ছিল না সেকথা বোঝা যায় 'পরিচয়' এর আড্ডা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবে। এবং

অতিরিক্ত বুদ্ধিময় ব্যাখ্যার চাইতে তিনি সহজ জীবনরসের আস্বাদনের দিক থেকে সাহিত্য বিশ্লেষণে অধিকতর স্বচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তাই 'রামায়ণ' সম্বন্ধে তাঁর যে প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হ'ল সেগুলি কিন্তু এই জীবনরসের আস্বাদনের দিক থেকেই উঠতে পারলো। আগে বলা হয়েছে কেবল আধুনিকতার বাতাবরণের মধ্যেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। বুদ্ধদেবের 'রামায়ণ'চর্চার পক্ষে মূল প্রশ্ন 'রামায়ণে' সীতাহরণের উদ্দেশ্য সন্ধান। এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন যুগ বিভিন্নভাবে দিয়েছে, তিনি তাঁর মতো করে এর উত্তর দিলেন। তাঁর উত্তর যদিও গোটা 'রামায়ণ' ব্যাখ্যার পক্ষে একটু লঘুত্ব বাচী বলে আমাদের মনে হয়, তব তাকে বর্জন করা যায় না। 'রামায়ণে' সীতাহরণের মধ্যে তিনি সম্ভোগ লিপ্সার চেয়ে প্রেমাভীপ্সাকেই মুখ্য স্থান দিতে চান। একথা ঠিকই যে, বহু রূপকথার কাহিনীর মধ্যে নারী হরণ করে তার সমর্থন পেতে রূপকথার রাজারা বহুবছর অপেক্ষা করে থাকতেন। এমনও তো দেখা গেছে যে, প্রাচীনকালে বিবাহ ব্যাপারটাই ছিল হরণভিত্তিক এবং রামের স্ত্রীকে হরণ করে রাবণ এমন কিছু একটা রাক্ষুসে কান্ডও করেননি বরং সেকালের ধর্মই পালন করেছিলেন। বুদ্ধদেবের এই কেন্দ্রীয় প্রশ্নকে ঘিরে এসেছে সাহিত্যবিচারে কিছু ভাবনা। কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির তুলনা, আদি কবির অকৃত্রিম জীবন-প্রীতির প্রসঙ্গ, এবং রামচরিত্রের প্রতি উৎক্ষিপ্ত সেইসব প্রশ্ন যা সব আধুনিককালের মানুষকেই প্রশ্নমনস্ক করেতুলেছে। রামের বালীবধ বিশেষতঃ সীতাবর্জন সকল মানুষেরই মনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। রবীন্দ্রনাথও সেই প্রশ্ন না তুলে পারেননি। তবু রামের মধ্যে, মানুষের চরিত্রের যে পূর্ণতার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন 'বহুকালগত গুণাবলীর পূর্ণবিকশিত মূর্ত্তিরূপে যাকে দেখেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর পক্ষে তাঁকে আর সেই চরিত্রবত্তার দিক থেকে দেখাই সম্ভব হল না। বরং, তিনি খুঁটে খুঁটে বিচার করে তুলে আনলেন রামচরিত্রের সেই দ্বিখণ্ডিত সত্তা - একদিকে তাঁর চরিত্রের নিরঞ্জন প্রশান্তি আবার তাঁর চরিত্রের সেই বিভ্রম সৃষ্টিকারী ত্রুটি বা সাধারণ ন্যায়ের বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত। তাঁর পক্ষে 'রামায়ণে'র রামের সঙ্গে ইতিহাসের জুলিয়াস সীজারেরও তুলনা দেওয়া সম্ভব হ'ল কেবল এই করণে যে, রাম সম্বন্ধে তিনিও কোনো উচ্চবাচ্য মাত্র না করে আমাদের প্রথাগত ভাবনার বাঁধিগৎটাকে ভেঙে দিতে চান। তবু, 'রামায়ণ' ভাবনার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবেরও যেন চিন্তা দ্বিধান্বিত কিংবা দ্বিচিত্রিত। কেননা, যাঁর কাজকে একদা ধিক্কারযোগ্য মনে হয় তাঁর - ছি ছি করে ওঠে তাঁর অন্তরাত্মা সেই তিনিই যদি রামের কাজকে পুরোপুরি লীলা বলে মনে করেন, তাহলে পূর্ববর্তী খেদ ও ধিক্কার অর্থহীন বলে মনে হতে পারে। রামকে যদি ভাবা সংগত হয় কেবল

> পাঠমুখস্থ করে রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিসের পর কী হবে,
> তা তিনি সবই জানেন, তবু যেন জানেন না,[১০৫]

তাহলে সেই রামের প্রতি কোনো ধিক্কার প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হয় না বরং সেখানে সেই বক্তব্যই সংগত বলে মনে হয় যে, আদি কবির নিরঞ্জন ও সর্বংসহ বাস্তবতার কোনো আধুনিক ব্যাখা অর্থহীন।

তবু, কেবল শিল্পশক্তির বিচার বিশ্লেষণ-ই 'রামায়ণে'র পক্ষে চূড়ান্ত বিচার কি-না সে প্রশ্ন ওঠেই। 'রামায়ণে'র পক্ষে সেই প্রশ্নের সংগতি এই কারনে যে, যেকোনো জাত মহাকাব্যই অনেকটা পাললিক শিলাস্তূপের মতো কালে কালে বহু কবির বহু কাব্যময় আখ্যানের সমন্বিত প্রকাশ হয়ে দেখা

দেয়। ঐতিহাসিকদের বিচারকে সাহিত্যিক পূর্ণতা তত্ত্ব দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রশ্ন একেবারেই যে বুদ্ধদেবকে নাড়া দেয়নি, তাই বা বলি কী করে। তিনি নিজেই একটি ঈশারা আমাদের দিয়েছেন শেষ বাক্যে। রামায়ণের দ্বিধা বা অসংগতি বা অনেক প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই বলে তিনি লিখেছেন —

> হয়তো শিল্পহীনতার অচেতনেই শিল্পশক্তির এমন একটি
> অব্যর্থ সন্ধান ছিলো যা ফিরে পেতে হলে সমস্ত সভ্যতা লুপ্ত
> করে দিয়ে মানবজাতিকে আবার নতুন করে প্রথম থেকে
> আরম্ভ করতে হবে। [১০৬]

'রামায়ণের' উত্তরকান্ড সম্বন্ধে বুদ্ধদেব একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন। তিনি আগাগোড়াই মনে করে এসেছেন রামায়ণ একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। আর, উত্তরকান্ড তারই অঙ্গবিশেষ। 'রামায়ণে' উত্তরকান্ড যোজনার তাৎপর্য এই যে তিনি একালের দৃষ্টি থেকে গোটা 'রামায়ণে'র তাৎপর্যকে ভেবেছেন পেয়ে হারানোর বিষাদ। যেমন রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূতে'র মধ্যে খুঁজেছিলেন চিরন্তন বিরহের কথামালা, তাই 'রামায়ণে'র যন্ত্রনা হৃদয়স্পর্শী। 'মহাভারতে'ও তাই, 'মেঘদূত'কে ও হয়তো এই বিষাদকারুণ্যের দিক থেকে দেখা যেতে পারে। যে সীতার জন্য এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, জীবন-পণ সাগর বন্ধন, সেই সীতাতেই রামের কোনো আসক্তি নেই। যেমন 'মহাভারতে' বহুকথিত, তেমনি 'রামায়ণে'ও এই অকথিত অনুচ্চার বাণীই মুখ্য যে, প্রাচীন ভারত কোনো আসক্তির বন্ধন স্বীকার করে না - চিত্ত উন্মাদ কর 'প্রেমেরও জন্য তার টান নেই - কেবল কর্ত্তব্য এবং ধর্মপালন এবং বীতস্পৃহ হয়ে কর্মপালন করা - এই তার শিক্ষা। বুদ্ধদেব এরকম একটা ইঙ্গিত 'রামায়ণ' থেকে দেখেছেন নিশ্চয় কিন্তু তারই সুতোয় 'মেঘদূত' কাব্য সমালোচনাকে টেনে আনেননি। নাহলে একথা তো আমাদের মনেই হয়, যে - নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিরঞ্জন বাস্তবতা আদি কবির বস্তু ছিলো তাই কবি কালিদাসের রচনায় কেমন ভোগপাণ্ডুর হয়ে পড়েছে। 'মেঘদূত' কাব্যে তাই তিনি দেখালেন। 'রামায়ণ' - 'মহাভারতে' যদি কেবল বীতস্পৃহ মানসিকতার জয়োচ্চারণ হয়, তাহলে ভোগকুণ্ঠিতের আর্তি ব্যক্ত হয়ে ওঠে 'মেঘদূত' কাব্যে। 'মেঘদূত' কাব্যের বিচারে বুদ্ধদেব এই ভোগলিপ্সার উচ্চারণ খুঁজেছেন। কেবল সম্ভোগলালসা একটি কাব্যের বিষয় হলে যা দাঁড়ায়, 'মেঘদূত' বুদ্ধদেবের চোখে আসলে তাই। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো অতলান্ত এবং সর্বব্যাপ্ত বিরহ এখানে খুঁজে পান না বরং 'মেঘদূত'কে তাঁর প্রথম থেকেই মনে হয় কৃত্রিম কারুকৃতি - সেই কৃত্রিমতা বাক সজ্জায় এবং বিষয় বক্তব্যেও। যক্ষের বিরহের তেমন কোনো কারণও তিনি খুঁজে পান না। যা কিছু তাঁর কষ্ট কেবল বর্ষকাল ভোগসঙ্গিনীর অভাবজনিত - এবং তাও কিছু দুঃসহ বলে বুদ্ধদেব বসু মনে করেন না। তবু, 'মেঘদূত' যে কাব্য হিসেবে আমাদের মনকে এতটাই আক্রান্ত করে তার কারন আমরা আত্মগত অনুভবের দিক থেকে তাকে দেখি। বুদ্ধদেব অবশ্য বলেন, এর অসাধারণ কাব্যবিন্যাসের উপাদান ছন্দ আর ধ্বনি - আর কাব্যের একটা গতিময় আকর্ষণ।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের দুই পুরোধা ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সমালোচনার ক্ষেত্রে

বঙ্কিমের দৃষ্টি ছিল বিশ্লেষকের। তাই তিনি 'মহাভারতে'র উপর বহু প্রক্ষেপ অভিক্ষেপ অনুসন্ধান করেছিলেন। 'মহাভারতে'র মূল অংশ সন্ধানে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এই বিশ্লেষণী মনোভাব আরোপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'রামায়ণ', 'মহাভারতে'র মতো গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে — পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। এবং তাঁকে প্রকৃত সমালোচনা বলেছেন।[১০৭]

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে লিখেছেন —

> সমালোচকের কার্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ ; এক প্রাচীন
> কুসংস্কারের নিরাস ; অপর, সত্যের সংগঠন।[১০৮]

বুদ্ধদেব বসু প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হলেও 'মহাভারত' সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী হলেও 'মহাভারত' সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বরং রবীন্দ্রনাথের মতো বুদ্ধদেবের দৃষ্টির মধ্যেও ঐক্যবোধ আমরা লক্ষ্য করি। সেকারনেই 'মহাভারতে'র সমগ্র কাহিনীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র তিনি আবিস্কার করেন। 'মহাভারতের কথা'র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন —

> আমাদের আধুনিক বুদ্ধিতে যে সব ব্যাপার অবিশ্বাস্য (কিন্তু
> সবচেয়ে বুদ্ধিমানেরাও পুরাকালে যা বিশ্বাস করতেন,) আমি সে
> গুলিকে 'অবাস্তব' বলে প্রত্যাখ্যান করিনি, বরং সেইসব বাস্তবাতীত
> রহস্যের মধ্যেই মর্মকথার সন্ধান করেছি।[১০৯]

তিনি এখানে বলেন যে যেখানে কুসংস্কার আছে, সেই কুসংস্কার উচ্ছিন্ন করার অর্থ হল এর অন্তর্লীন বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটানো। আর তাই সাহিত্যিক নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি 'মহাভারতে'র পাতায় পাতায় সৌন্দর্য ও কল্পনার অফুরান ভাণ্ডার আবিস্কার করেছেন। সেজন্যেই 'রামায়ণে' রামের প্রতি তিনি অকরুণ, সীতাবর্জন, বালীবধ প্রভৃতি কার্যের কঠোর সমালোচনা তিনি করেন কিন্তু 'মহাভারতে'র নায়ক যুধিষ্ঠিরের তিনি সমর্থনকারী। তাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির যখন ধর্মের বৃত্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন সেই ঘটনারও ব্যাখ্যা দান করতে তিনি কুণ্ঠিত হন না।

নির্দেশিকা

১। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১, পৃঃ ১২৯

২। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খন্ড, কলিকাতা, পাত্রজ পাবলিকেশন, ১ম সংস্করণ, জুন ১৯৮৩, পৃঃ ১৭৫

৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১১।

৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১, পৃঃ ১৪

৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১২

৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত (অনূদিত), কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ৫

৭। তদেব, পৃঃ ৫

৮। বসু, বুদ্ধদেব, আমার যৌবন কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৭৭, পৃঃ ৮০

৯। তদেব, পৃঃ ৮১

১০। রায় আনন্দ (সম্পা)। 'বুদ্ধদেব বসুর রামায়ণ ভাবনা', বুদ্ধদেব বসু ঃনানা প্রসঙ্গ, ডঃ প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ, ১৯৭৮, পৃঃ ১৮৭

১১। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৫৪, পৃঃ ৯

১২। তদেব, পৃঃ ৯

১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, রামায়ণী কথা, দীনেশচন্দ্র সেন, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩১০

১৪। সেন, প্রবোধচন্দ্র, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য (অনূদিত), ভারবি, ১৯৭৫

১৫। Winternitz, A History of Indian Literature, Vol-I, Part-II, Calcutta, Calcutta Univ. Press, 1978, Page-277.

১৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ' সাহিত্যচর্চা, রামায়ণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল, ১৯৫৪, পৃঃ ১৯

১৭। তদেব, পৃঃ ১৯

১৮। তদেব, পৃঃ ১২

১৯। তদেব, পৃঃ ১৪

২০। তদেব, পৃঃ ১৬

২১। তদেব, পৃঃ ১৬

২২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ৮

২৩। তদেব, পৃঃ ৭

২৪। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮

২৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, ভূমিকা, শ্রী সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, কথা রামায়ণ, ২-য় খন্ড, শ্রীরামাশ্রম (প্রকাশন), ডুমুরদহ, ১৩৬৪ (১ম সংস্করণ)

২৬। সেন, দীনেশ চন্দ্র, রামায়ণী কথা, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৩১০, পৃঃ ৫১

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৬

২৮। তদেব, পৃঃ ১৬

২৯। তদেব, পৃঃ ১৬

৩০। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ৩২৯

৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৮

৩২। তদেব, পৃঃ ১৭

৩৩। বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ ভূমিকা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮

৩৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৩

৩৫। তদেব, পৃঃ ২৩

৩৬। তদেব, পৃঃ ২৩

৩৭। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য , কলিকাতা, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ৯

৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ, ১৯৭৪, পৃঃ ১৫১

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৫১

৪০। তদেব, পৃঃ ১৫৩

৪১। তদেব, পৃঃ ১৫৪

৪২। তদেব, পৃঃ ১৫১

৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৮

৪৪। তদেব, পৃঃ ২১

৪৫। তদেব, পৃঃ ২১-২২

৪৬। তদেব, পৃঃ ২২

৪৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৯

৪৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১

৪৯। বসু, রাজশেখর, ভূমিকা, বাল্মীকি রামায়ণ, সারানুবাদ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৬ষ্ঠ মুদ্রন, ১৩৭৮, পৃঃ ১১২

৫০। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১

৫১। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২৯

৫২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, পৃঃ ২১৫

৫৩। বিশী, প্রমথনাথ, রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, কলিকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭, পৃঃ ৪৩

৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, 'প্রাচীন সাহিত্য বিচারে রবীন্দ্রনাথ', সাহিত্য জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ, ২-য় খন্ড, পৃঃ ২২২

৫৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ (১ম প্রকাশ), পৃঃ ৩৪

৫৬। তদেব, পৃঃ ৪১

৫৭। বসু, বুদ্ধদেব, শ্লোক ১১৬, 'উত্তরমেঘ', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ১২৭

৫৮। আতোয়ান, ফাদার রবার্ট, বেতার জগৎ, ২২শে মে, ১৯৭৪, পৃঃ ৪১১

৫৯। দাশ, জীবনানন্দ, 'আকাশ লীনা', আধুনিক বাংলা কবিতা, বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ৮১

৬০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্ন', রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড, জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণ, ১৩৬৮, পৃঃ ৭০০

৬১। বসু, বুদ্ধদেব, ১০৪ নং শ্লোক, 'উত্তরমেঘ', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ১২১

৬২। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৩। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৪। তদেব, পৃঃ ৫০

৬৫। তদেব, পৃঃ ৫১

৬৬। বসু, বুদ্ধদেব, পাদটীকা, 'সংস্কৃত কবিতা ও মেঘদূত', কালিদাসের মেঘদূত, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, অক্টোবর, ১৯৬৮, পৃঃ ৫৬

৬৭। Eliot, T. S. 'What is classic', On poetry and poets, London, Boston, Faber and Faber, First Published 1933, Page- 54

৬৮। Ibid, Page- 59

৬৯। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৩০

৭০। তদেব, পৃঃ ৩৩

৭১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কৃষ্ণ চরিত্র', আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৯২৬

৭২। সেন, প্রবোধ চন্দ্র, 'বাংলা মহাভারত চর্চা', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পাদিত), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ২২

৭৩। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৭৪। চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ, 'মন্ত্রপড়া অন্তরাল ঃ মিথ পুরাণের সন্ধানে', বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে, তরুণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলিকাতা, পুস্তক বিপনি, অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃঃ ৮৩

৭৫। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৭৬। তদেব, মুখবন্ধ

৭৭। M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol, Part II, Calcutta, Calcutta University Press, 1978, Page- 384

৭৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'যুধিষ্ঠির ও অর্জুন', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১০৫

৭৯। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮০। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮১। Scholes, Robert and Kellogy Robert, OUP, London Oxford, New York, 1968, Page 210

৮২। দত্ত, মধুসূদন, মধুসূদন রচনাবলী, ইংরেজী সহ সমগ্র রচনা, ১ খন্ডে, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫, পৃঃ ৫৪৭

৮৩। তদেব, পৃঃ ৫৫১

৮৪। বসু, বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, মুখবন্ধ, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

৮৫। তদেব, মুখবন্ধ

৮৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১১

৮৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'এক বিশ্ববিদ্যালয়', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৪৮

৮৮। তদেব, পৃঃ ৫০

৮৯। তদেব, পৃঃ ৫১

৯০। বসু, বুদ্ধদেব, 'ঘরে-বাইরে', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১৬১

৯১। তদেব, পৃঃ ১৬১

৯২। বসু, বুদ্ধদেব, 'পশ্চিম সমুদ্র ও হিমালয়', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ১৭৩

৯৩। তদেব, পৃঃ ১৮১, পাদটীকা, ১০৪ নং

৯৪। তদেব, পৃঃ ১৭৯

৯৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'পূর্বাভাস ও প্রতিরূপ', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ,

মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৫৯

৯৬। তদেব, পৃঃ ৫৯

৯৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'আগুন জলের গল্প', মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪, পৃঃ ৮৩

৯৮। তদেব, পৃঃ ৮৩

৯৯। তদেব, পৃঃ ৮৫

১০০। তদেব, পৃঃ ৮৭

১০১। তদেব, পৃঃ ৮৮

১০২। তদেব, পৃঃ ৮৯

১০৩। তদেব, পৃঃ ৮৯

১০৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাভা যাত্রীর পত্র, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড ঃ প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃঃ ৬২০-৬২১

১০৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'রামায়ণ', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ২১.

১০৬। তদেব, পৃঃ ২৪.

১০৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী, এয়োদশ খন্ড।

১০৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণ চরিত্র', বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড কলকাতা, পাত্রজ, ১৯৮৩, পৃঃ

১০৯। বসু, বুদ্ধদেব, মুখবন্ধ, মহাভারতের কথা, কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, মার্চ ১৯৭৪

রবীন্দ্র সমালোচনা

একজন কবি সমালোচক যে কবি দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ ভাবে যাঁর কাব্যের সঙ্গে তাঁর নিজের কবিতার গভীর সম্বন্ধ আছে, তাঁর কাব্য সমালোচনা সেই কবির সৃষ্টিকর্মের অংশ হয়ে উঠতে পারে। এলিয়ট তাঁর সমালোচনা বিষয়ে এধরনের কথাই বলেছিলেন -

> .... in so far as it is valid, it springs from experience
> of those authors who have profoundly influenced my
> own writings.[১]

শুধু নিজের জন্যই নয়, এজরা পাউণ্ডের সমালোচনা সম্বন্ধেও এলিয়ট এই কথাই বলেছেন। 'Influence' বা প্রভাব অর্থে এখানে অবশ্যই অনুকরণ নয়।বিশেষ করে সচেতন অনুকরণ কবির অক্ষমতাই প্রমান করে। প্রভাবকে আত্মস্থ করে কাব্যের নবীনতা দান করা যায়। রবীন্দ্রানুসারী অনেক কবি রবীন্দ্রানুসরণ করেছেন, রবীন্দ্রবলয়ে আবর্তিত হয়েছেন কিন্তু যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিতে পারেন নি।

> বোঝা যায়, রবীন্দ্রপ্রেমে আত্মহারা এইসব কবিদের রবীন্দ্রনাথকে
> যথার্থ আত্মসাৎ করার ক্ষমতাই ছিল না, এঁরা রবীন্দ্রনাথের
> অনুকরণ-ই করেছেন শুধু, উপলব্ধি করেননি।[২]

বুদ্ধদেবের ভাষায় বলা যায় —

> রবীন্দ্রনাথের ব্রত নিলেন তাঁরা, কিন্তু তাঁকে ধ্যান করলেন না।[৩]

সুতরাং বোঝা যায়, বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র সমালোচনা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে রবীন্দ্রধ্যান, রবীন্দ্র অনুকরণ মাত্র নয়। যে প্রভাব কবিকে নির্বীজ করে না বরং তাঁকে সৃষ্টির ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী করে, রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে সেই সৃজনশীলতার স্পর্শ পেয়ে সৃষ্টির উৎসার ঘটবে আলোচ্য কবি সমালোচকের লেখায় - একথা মনে করা যেতে পারে।

বুদ্ধদেবের কাছে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই বিস্ময় ও অনুরাগের প্রতীক। তাঁর জীবনব্যাপী রবীন্দ্রচর্চায় একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'বন্ধু', 'প্রিয়তম'। ১৯৪২ সালের ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন -

> তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
> হে বন্ধু, হে প্রিয়তম। ...[৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গান ও কবিতায় এই সম্বোধনে ঈশ্বরকে সম্বোধিত করেছেন। বুদ্ধদেবের লেখায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বার বার প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগ থাকলেও তাঁর জীবনবোধে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার স্থান তেমন নেই। তাঁর মানসিকতা সর্বঅর্থেই সংস্কারমুক্ত একজন আধুনিক মানুষের মানসিকতা। সেকারণে তাঁকে অনেকসময় রবীন্দ্রবিরোধী বলে মনে হয়। তবে তিনি "রবীন্দ্রবিরোধী নন্, রবীন্দ্রপূজার বিরোধী"।[৫] রবীন্দ্র প্রতিভাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতেই

তিনি সচেষ্ট। আর তাই, সমালোচক হিসেবে

অতি অনুরাগ লিপ্ত বিচারভঙ্গি বাদ দিয়ে স্বাভাবিক বিচার
বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ করার পক্ষপাতী তিনি।[৬]

তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর 'কথা ও কাহিনী'র 'গানভঙ্গ' কবিতায় বলেছিলেন —

'একাকী গায়কের নহে তো গান'[৭]

তেমনি, শিল্পসাহিত্যের সফলতার মূল কথাটিও হ'ল সংবেদনশীল রসিক শ্রোতার মর্মগ্রাহিতা। সামালোচনার কাজই হ'ল শিল্পসাহিত্য ও পাঠক শ্রোতার মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ সমর্থক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আর, সেকারনেই, রবীন্দ্র মানসিকতার সঙ্গে পাঠক সমাজকে পরিচয় করিয়ে দিতে তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অন্তহীন।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে রবীন্দ্রসমালোচনার দুটি ধারা প্রবাহিত। একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, অন্যটি আধুনিক। রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় যে জীবনীমূলক ধারাটি চলে আসছে, এরই অনুসরণ করেছেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, অজিত কুমার চক্রবর্তী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসময়েই বা তার সামান্য পরে, রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী, নীহাররঞ্জন রায়, মোহিতলাল মজুমদার এসেছেন এঁদের পথ ধরেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবনের ঘটনাবলীকেই ফুটিয়ে তোলে। আর অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ' উন্মোচিত করে এক আত্মনিমগ্ন কবির অন্তর্লোক।

এঁদের কিছু পরে এলেন বুদ্ধদেব বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র নাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের বিভিন্ন গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, রবীন্দ্রপ্রতিভা সম্বন্ধে নিজস্ব বিশিষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু অজিত কুমারের মধ্যেই নিজের পছন্দসই রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধরণটি খুঁজে পেয়েছেন। মানসিক প্রবণতা অনুসারে তাঁর রোম্যান্টিক মনটি এইখানেই আরাম পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আলোচনায় অজিত কুমার চক্রবর্তীর তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রসাহিত্যের সমালোচনায়-অজিতকুমার-ই বাংলায় প্রথম তুলনামূলক পদ্ধতি এনেছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার সে ধারা বুদ্ধদেবের আগে থেকেই চলে আসছিল, তাঁর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বুদ্ধদেব। 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট-ই বলেছেন -

স্বর্গত অজিত কুমার চক্রবর্তী থেকে শ্রীযুক্ত প্রথম নাথ বিশী
পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থকর্তারা এইজন্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় যে,
তাঁদের পরিশ্রম তাঁদের রবিপ্রেমের-ই প্রতিমূর্তি।[৮]

সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-জীবনী, রবীন্দ্র-সমালোচনা লেখার একটি বাধার কথা

উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য - সে বাধা অদ্ভুত, অসাধারন এবং পর্বতপ্রমান। কেননা, সে বাধা রবীন্দ্রনাথ নিজে। রবীন্দ্রনাথই কেন রবীন্দ্র সমালোচনার পক্ষে বাধা-এর উত্তরে বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, আত্মজৈবনিক গ্রন্থে ও পত্রাবলীতে তিনি সাক্ষাৎ কল্পতরু। স্বেচ্ছায় কিংবা দায়ে পড়ে তিনি নিজেই নিজের মল্লিনাথের কাজ অসংখ্যবার করেছেন। একারণে, বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর জীবনীকার বা সমালোচকদের অনেকসময়েই সংগ্রাহকমাত্র মনে হয় - কি বড়জোর সম্পাদক। অর্থ্যাৎ,

> তাঁরই রচনা আর চিঠি পত্র থেকে বিস্তারিত উদ্ধৃতি, এবং
> সেই উদ্ধতিরই রোমন্থন পেরিয়ে আমাদের রবিচর্চা আর
> বেশিদূর এগোয় না ।[৯]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর রচনা সম্বন্ধে বহুবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেই কারনে তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনাকে জানা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই, রবীন্দ্র সমালোচনার ক্ষেত্রে —

> অনেকেই আমরা আজ পর্যন্ত গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সারি।[১০]

বুদ্ধদেব বসু এই সমস্যাগুলো সামনে রেখেই রবীন্দ্র সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্যের যোগ সুদূরবর্তী করে রাখতে চাননি তিনি। বরং

> রবীন্দ্র-কৃত সাহিত্যের কোন পথ দিয়ে পাঠক রবীন্দ্র সাহিত্যের
> হৃদয় সমীপবর্তী হতে পারেন[১১]

সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছেন।

কালানুক্রমিক ভাবে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রবিষয়ক গ্রন্থগুলি হলো —

১. রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্যে (১৯৫৫)

২. Tagore Portrait of a poet (1962)

৩. সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৩)

৪. কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬)

এছাড়া, ' সাহিত্য চর্চা ' (১৩৬১) গ্রন্থে ' রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক ' এবং ' রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসমালোচনা ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি এবং এই গ্রন্থের 'বাংলা ছন্দ' নামক প্রবন্ধটিতে বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অবদান ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। ' An Acre of Green Grass' (১৯৪৮) গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি অর্থাৎ 'Rabindranath' এবং 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, বিভিন্ন সময়ে বেতার কেন্দ্র প্রদত্ত তাঁর কিছু বক্তৃতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২র মার্চ মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের পাঁচটি বক্তৃতা পরে 'Tagore portrait of a poet ' (1962) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এর দ্বিতিয় পরিচ্ছেদটি 'রবীন্দ্রনাথ: বিশ্বকবি ও বাঙ্গালি' নামে বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে 'সঙ্গ নিরসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩) গ্রন্থে স্থান পায়। আর 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম চার পরিচ্ছেদে ইংরেজী বইটির মূল উপাদানের অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র বক্তৃতামালারূপে (১৯৬৬-র জানুয়ারী নাগাদ) এগুলিই অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হয়। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'Year book of Comparative

and General Literature'(1963) সংখ্যায় 'Tagore in Translation' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁরই ভাষায়, সেটিকে 'কবি রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৬) গ্রন্থের 'ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ' অংশের আকর বলা যায়।[১২] এখানেই তাঁর আর একটি বক্তব্য আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে —

> কিন্তু এই ইংরেজি লেখাগুলো 'কবি রবীন্দ্রদাথ'-এর যাত্রাস্থল মাত্র,
> বিকল্প নয়। বাংলা ভাষায় রচনাকালে আমার বক্তব্য প্রভূতভাবে
> প্রবৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে, বহু নতুন তথ্য, যুক্তি, উদাহরণ ও
> বক্তব্য যোগ করেছি। ইংরেজিতে যা ছিল ক্ষীণ ইঙ্গিতমাত্র
> এখানে তা পূর্ণ রূপ পেয়েছে, এবং এখানে এমন অনেক প্রসঙ্গ
> আলোচিত হলো যা ইংরেজীতে উল্লেখ পর্যন্ত করিনি।[১৩]

একারনেই ইংরেজীতে লেখা বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র সমালোচনা অপেক্ষা, বাংলায় প্রকাশিত তিনটি গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধগুলির দিকে আমি নজর রেখেছি বেশী।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে বুদ্ধদেবের অনেকগুলি প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার বুদ্ধদেব-কৃত সমালোচনা। অবশ্য, 'কবিতা'য় প্রকাশিত কোনো কোনো প্রবন্ধ গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে ও অগ্রন্থিত বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সংখ্যা কম নয়। 'কবিতা'য় প্রকাশিত বুদ্ধদেবের এই বিচ্ছিন্ন অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলি থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র-দর্শন মূলতঃ দুটি ধারায় বিভিক্ত।
ক. কথাসাহিত্যিক ও গদ্য শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, এবং খ. কবি রবীন্দ্রনাথ।

। ক ।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের সূত্রে এই সময় প্রায় ধারাবাহিক ভাবে বুদ্ধদেব রবীন্দ্র-রচনার সমালোচনাগুলি প্রকাশ করেছেন 'কবিতা'র পাতায়। বুদ্ধদেব-কৃত এই সব সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ২২/৩/৪০ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন —

> কবিতায় তুমি যে গদ্য আলোচনা করো , ভাষায়,ভাবে ও
> অভিজ্ঞতায় তার বিশিষ্টতা আছে। সাধারণতঃ বাংলা কাগজে
> সমালোচনা অত্যন্ত ফিকে হয় - তোমার লেখার মধ্যে বস্তু
> খুঁজে পাওয়া যায়, অনেকটাই ফাঁকি বলে মনে হয় না।[১৪]

অথচ, এই মহাকবির রচনা-সমালোচনায় বুদ্ধদেব কখনোই প্রশংসামাত্র করবার রীতি গ্রহণ করেননি। তিনি কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের বিচার করেছেন মূলত: তাঁরই নিজস্ব দৃষ্টিতে। কথাসাহিত্য সমালোচনার সূত্র হিসাবে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সৃষ্টির চিরন্তনতার উপর এবং শিল্পীর দেশকালাতীত দূরস্পর্শী

বিশ্বানুগ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। এবং যেখানেই এর ব্যত্যয় দেখেছেন দ্বিধাহীনভাবে তিনি তাঁর সমালোচনা করেছেন। 'কবিতা' আষাঢ় ১৩৪৭ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'চোখের বালি' উপন্যাসের সমালোচনা করেন। 'চোখের বালি'কে তিনি "রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস" বললেও অভিযোগ করেছেন —

ক. বইটির গঠন শিথিল, অনেক স্থলেই ঘটনাগুলিকে নাটকীয় রূপে দেখানো হয়নি, অতি সরলভাবে বলে দিয়েই লেখক খালাস হয়েছেন।[১৫]

খ. চরিত্রগুলি সর্বদাই সাধুভাষায় কথা বলে।[১৬]

গ. আজকাল 'চোখের বালি' পড়তে-পড়তে বার বার আমাদের মনে হবে যে, লেখক উপন্যাসের টেকনিক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিত ছিলেননা, একটি গল্প তাঁর মনে এসেছিল এবং সে গল্প তখনকার প্রচলিত প্রথায় আদ্যোপান্ত বলেই তিনি নিজের দায়িত্ব মোচন করেছেন।[১৭]

ঘ. 'চোখের বালি'তে আছে একধরনের সমতলতা।[১৮]

ঙ. 'চোখের বালি' সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সবচেয়ে বড় আপত্তি হলো - " বইটির সমাপ্তি দুর্বল।"[১৯] বুদ্ধদেব মনে করেছিলেন এ গল্পের দুটি মাত্র পরিণতি হতে পারে —

> এক সম্পূর্ণ সর্বনাশ, আর তা যদি না হয়, বিনোদিনীর
> সঙ্গে বিহারীর মিলন।[২০]

কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তিতে এর কোনোটিই হলো না, বিনোদিনী তাঁর সমস্ত জীবন - যৌবন বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে কাশী চলে গেল। বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> বস্তুতঃ, বিনোদিনীর এই তুচ্ছ পরিনাম আমাদের মন কিছুতেই
> গ্রহণ করতে পারেনা, শেষ পরিচ্ছেদটি গল্পের আভ্যন্তরীণ
> উপাদান থেকে অনিবার্য ভাবে গড়ে ওঠেনি, ...।[২১]

বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন যে, চোখের বালি উপন্যাসে সারল্যের কারণ হল লেখকের সাত্ত্বিক স্বভাব। 'হস্তলিপিপুস্তকের নীতিবচনে'র সঙ্গে যে একজন ঔপন্যাসিকের নীতিজ্ঞান মেলে না আধুনিক আত্মসচেতন সমালোচক বুদ্ধদেব এই জায়গাটির উপরই জোর দিয়েছেন বেশী। বিধবা বিনোদিনীর বিবাহের সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কি-না নীতিশাস্ত্রগত এই কূট তর্ককে প্রশ্রয় না দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি অভ্যন্তরীণ উপাদান থেকে গড়ে-ওঠা বিনোদিনীর পরিণামকেই অনিবার্য করে তুলতেন, তাহলে উপন্যাসটির সমাপ্তি সম্পর্কে এত বড়ো আপত্তি বুদ্ধদেব তুলতেন না। তাঁর কেবলই মনে হয়েছে বিধবা বিনোদিনীকে কাশীবাসী করার পিছনে উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি; নীতিশাস্ত্রের বিধানের প্রতিই লক্ষ্য রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ঔপন্যাসিকের নীতিজ্ঞান এবং শিল্পীর বিবেককে বলি দেওয়া হয়েছে নীতিশাস্ত্রগত বিধানের কাছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এ অভিযোগ মেনে নিয়ে ছিলেন। কালিমপঙ থেকে (২৪ শে জুন, ১৯৪০) বুদ্ধদেব কে একটি চিঠিতে লিখেছেন —

> তোমাদের 'কবিতা'য় 'চোখের বালি'র সমালোচনার শেষ অংশে

যে মন্তব্য দিয়েছো, তা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। 'চোখের বালি'
বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই আমি মনে মনে অনুতাপ
করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিৎ।[২২]

অর্থ্যাৎ, 'চোখের বালি'র সমাপ্তি কবির নিজেরও অপছন্দ ছিলো। হয়তো এজন্যই 'চতুরঙ্গে' দামিনী অন্যরকম হয়ে ওঠে।

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ এ রবীন্দ্র রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসেরও সমালোচনা করেছেন। 'নৌকাডুবি' যে রবীন্দ্র উপন্যাসের ধারায় দুর্বল রচনা তা সকলেই বলে থাকেন, এর অসংগতি গুলো খুবই স্পষ্ট বলে তিনি এর বিস্তৃত আলোচনা করেননি। কিন্তু নানা জায়গায় এর কথা তিনি এনেছেন। যেমন - 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের অবতরনিকা অংশে। একে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারায় প্রক্ষিপ্ত বলে মন্তব করেছেন।[২৩] আবার কখনো বলেছেন যে এটি একটি কৃত্রিম রচনা।[২৪]

'কবিতায় রবীন্দ্র রচনাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মনে হয়েছে 'বিসর্জন' নাটকের উৎসর্গপত্রে রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন —

কেহ বলে ড্রামাটিক বলা নাহি যায় ঠিক, লিরিকের বড়ো
বাড়াবাড়ি কথাটি সত্য।[২৫]

'বিসর্জন' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য —

বিসর্জন অনেকটাই ব্রাউনিঙের নাটকের মতো, সেখানে চরিত্র
চিত্র কিংবা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা লেখকের কবিত্ব
শক্তি তেই আমরা মুগ্ধ।[২৬]

তৃতীয় খণ্ডে 'চিত্রাঙ্গদা'র সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

চিত্রাঙ্গদার প্রায় প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে রয়েছে লিরিকের
সদ্যোজাত সৌরভ।[২৭]

'চিত্রাঙ্গদা'য় এক ধরনের নিটোল সংহতির কথাও তিনি উল্লেখ করছেন —

নাচের মতোই অবাধ লীলায়িত গতিতে সমস্ত কবিতাটি
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে, নাচের মতোই এর নিটোল
অথচ সংযত সম্পূর্ণতা ...।[২৮]

এই নিটোল সংহতি তাঁর নাটক বা নাটকীয় কবিতা 'মালিনী' এবং 'বিদায় অভিশাপে'ও দেখা গিয়েছে।

'বিদায় অভিশাপ' পরিমিতি ও সঙ্গতির অনবদ্য দৃষ্টান্ত আর

'মালিনী'র সংহত শক্তি ও স্বল্পভাষী কাঠিন্য তো বাংলা
সাহিত্যেই অতুলনীয়।[২৯]

'মালিনী'র ভাষা 'স্বচ্ছ অথচ গম্ভীর'।[৩০] রবীন্দ্রনাথের কোনো পদ্য নাটকের ভাষা প্রাকৃতজনের মৌখিক ভাষর এতটা কাছাকাছি আসতে পারেনি। তাই বলাযায় রবীন্দ্রনাথে আছে একদিকে তাঁর গীতিধর্মিতা, উচ্ছ্বসিত কবিত্বশক্তি, অন্য দিকে আছে ভাষার স্বচ্ছ, সংযত সংহতি। শুধু নাটকেই নয়, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধেও লিরিকের প্রতি তাঁর এই দুর্মর পক্ষপাত ধরা পড়ে। 'পঞ্চভূতে'র প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

কিছু বর্ণনা, কিছু জল্পনা, ও কিছু খেয়ালের সঙ্গে মিশে এই
প্রবন্ধগুলির চিন্তাশীলতা ও সারবত্তা, এমন একটি মনোহর
চেহারা নিয়েছে যা আজ পর্যন্ত একটুও ম্লান হয়নি।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কেও বুদ্ধদেব তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন —

গদ্য তাঁর সর্বদাই কবিত্বময়, সর্বদাই আবেগবাহী, উপমায় ও
রূপকে অলংকৃত, ধ্বনিবিন্যাসে ঝংকৃত।[৩২]

তবে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যের পরিণতি, পদ্যের তুলনায় অনেক মন্থর বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৩৩] কাব্যেদ্রুতএ প্রগতিশীল হলেও গদ্যে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত, নাটক ও পত্রগুচ্ছ ছাড়া রক্ষণশীলতার পথ ধরেই এগিয়েছেন। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' ও 'ভারতবর্ষে'র প্রবন্ধগুলি যে 'চিত্রা', শুধু নয়, 'কথা', 'কাহিণী' এমনকি 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্যে'র ও পরবর্তী একথা ভেবে তিনি অবাক হয়েছেন, কেননা,

এই দুটি সমসাময়িক প্রসঙ্গ ও রচনাভঙ্গির দিক দিয়েও
সমগোত্রীয় গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যেন বঙ্কিম অঙ্কিত পথ মাড়িয়েই
তৃপ্ত ছিলেন, শুধু ভাষর দিকে নয়, চিন্তার দিকেও।[৩৪]

'আত্মশক্তি'র প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এ প্রবন্ধগুলিতে ভারতের যে পরিকল্পনা ফুটেছে, তা সম্পূর্ণ হিন্দু,
এবং অনেকখানি ফিউডল ভারত, কোনো কোনো বিষয়ে তা
আধুনিক গান্ধীবাদের সঙ্গে হুবহু মেলে। আবার কোনো-কোনো
বিষয়ে আধুনিক রবীন্দ্রবাদের সঙ্গে মেলেনা।[৩৫]

মেলেনা যে, তার কারণ, যে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত শাস্ত্র, আচারও অনুষ্ঠানের ঊর্দ্ধে মনুষ্যধর্মের সাধক, যাঁর লক্ষ্য শুধু সমগ্র মানবজাতির মঙ্গল, যিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য নানাদেশ ঘুরে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ মানবদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র রচনা করেছেন, 'ভারত বর্ষ' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে —

এই রবীন্দ্রনাথকে স্বধর্মচ্যুত মনে হয়। কেননা, ভারতবর্ষের
যে ধারনা তিনি আমাদের মনে বদ্ধমূল করতে চান তা
ব্রাহ্মণশাসিত 'আর্য' ভারত ...। তিনি এটা ধরেই নিয়েছেন যে

প্রাচ্যভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে ... ।[৩৬]

বুদ্ধদেবের মতে, ভারত বর্ষের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে যত ধিক্কার দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটিই সঙ্গত; কিন্তু এই সভ্যতার যা প্রধান দান, আর্থ্যাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে বিরাট উৎপাদনী শক্তি, তা যে মনুষ্যজাতি কিছুতেই পরিহার করতে পারে না, প্রাচীন ভারতের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেছেন।[৩৭] এই জন্যই তাঁর মতে, 'ভারত বর্ষের' প্রবন্ধগুলি পড়ে

প্রত্যেক আধুনিক পাঠকের পক্ষে প্রশ্ন উত্থাপন না করা অসম্ভব।[৩৮]

তিনি এই প্রবন্ধগুলিকে রবীন্দ্রনাথের ঠিক স্বাভাবিক রচনা বলে মনে করেননি। একদিকে তখন কার নব্য বঙ্গযুবক, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি অংশের গোঁড়ামি, - এ দুয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়াই বোধ হয় "এই অরৈবিক প্রবন্ধগুলির জন্ম দিয়েছিলো।"[৩৯] এই রচনাগুলিকে তিনি প্রতিক্রিয়াপ্রসূত রচনা বলে মনে করেন। স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এই বলে —

এই প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্র রচনাবলীর অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক একটি
অংশই জুড়ে রয়েছে।[৪০]

মানুষের মর্যাদা, মানুষের মুক্তির দাবিই রবীন্দ্র রচনায় ধ্রুবপদের মতো ঘুরে ফিরে এসেছে।

আর এ বিষয়েও সন্দেহ নেই যে, তাঁর জ্বলন্ত বাণীই বঙ্গ ভাষীর
পক্ষে মনুষ্য ধর্মে প্রথম দীক্ষা।[৪১]

'কবিতা আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় 'নতুনবই' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'ছেলেবেলা'তে ও প্রাচীন বা সেকালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা টান স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

আধুনিক এই যুগ রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসেন না, চিরকালের
মতো হারিয়ে যাওয়া সেকালেই তাঁর মান প্রাণ বাঁধা। সেকেলে
সবই ভালো, একেলে সবই খারাপ, তাঁর এই মনের কথাটি
'ছেলেবেলা'য় লুকানো থাকেনি ... 'ছেলেবেলা'য় সেই সেকালেই
তিনি ফিরেছেন।[৪২]

'ছেলেবেলায়' রবীন্দ্রনাথ সেকালের গৌরব করেছেন। এই সেকালের গৌরব রোমান্টিক কবির অতীত চারিতার একটি লক্ষণ। তবু,এর একটি বিশেষ স্থান আছে বাংলা সাহিত্যে। কারণ —

১) এতে আছে গল্পের রস, রূপকথার জাদু, আছে তথ্য তারিখের ভারমুক্ত ইতিহাসের আত্মা।[৪৩]

২) বইটি কোনো প্ল্যানে বাঁধা নয়, এলোমেলো চলন, যখন যেখানে খুসি দেরি করা, পরের কথা আগে এসে গেলো তো গেলোই, অবারিত ছুটির হাওয়া আগাগোড়া বইছে।[৪৪]

৩) বইটির তৃতীয় বিশেষত্ব হল এর ভাষা। 'ছেলেবেলা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বইটি বালভাষিত গদ্যে লেখা। বুদ্ধদেবরে মতে,

এমন অদ্ভুত সহজ গদ্য বাংলা সাহিত্যে বোধহয় এর আগে
আর দেখাই যায় নি, কিন্তু এ গদ্য ঠিক 'বাংলাভাষিত' নয়,

বরং বলা যেতে আরে যে এখানে রবীন্দ্রনাথ basic বাংলার
প্রবর্তন করেছেন।[৪৫]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০ সংখ্যায় 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেতিনি বলেন —

রচনাটি সাহিত্যিকের ও সাহিত্য সমালোচকের বার বার পাঠ।[৪৬]

আর, 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি সম্পর্কে লিখেছেন,

বিভিন্ন উপলক্ষে সাহিত্যের মূল সূত্রের আলোচনাই তিনি করেছেন।[৪৭]

অতএব এগুলিও সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকের পাঠ্য। 'চিঠিপত্র' সমালোচনা প্রসঙ্গেও বুদ্ধদেব বক্তব্য হলো কবির জীবদ্দশায় তাঁর যত চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তা সবই সাহিত্যিক কারণেই মূল্যবান,[৪৮] চিঠিপত্রগুলি টীকা সম্বলিত হলে আরো মূল্যবান হতো। কারন,

উল্লেখের অভাবে অনেক ঠাট্টা মাঠে মারা গেছে।[৪৯]

'চিঠিপত্র' খণ্ড প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এটি পড়ে ওঠার প্রথম লাভ রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
নিবিড়তর পরিচয়, আর দ্বিতীয় - হয়তো মহত্তর লাভ এই যে
মাঝে মাঝে তাঁর গদ্যের লীলায় নতুন করে আমরা মন্দ্রিত হই।[৫০]

অবশ্য,

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে হালকা চাল যা, 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'
থেকে ভানুসিংহের পত্রাবলী পর্যন্ত সম্মোহিত করে রাখে আমাদের -
সেই কৌতুকে কটাক্ষে ভাবুকতায় মেশা সাবলীলতার
চিহ্ন নেই এখানে,।[৫১]

তবুও বাংলা ভাষা ও বাংলা গদ্যের পরিণতির সূত্রে এগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং এগুলির সাহিত্যরসত্ত আস্বাদনযোগ্য।

সবশেষে একথা বলা যায় যে 'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় বুদ্ধদেবের মূল প্রসঙ্গ গুলির সংকলন করলে পাওয়া যায় -

১) রবীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা
২) উপন্যাসের মধ্যে নীতি দুর্নীতির প্রশ্ন
৩) সাহিত্যের স্থায়িত্ব

বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন, এগুলি মূলতঃ রবীন্দ্র উপন্যাসের, বা কথা সাহিত্যের স্থায়িত্বের কারন। এক হিসেবে, রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের আনন্দ উৎস। তাঁর প্রবন্ধ বা চিঠিপত্র গুলিও সাহিত্যিক করনেই যথেষ্ট মূল্যবান।

গ্রন্থভুক্ত রবীন্দ্র-সমালোচনা হিসেবে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য' গ্রন্থটি। গ্রন্থের আলোচনা কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেব বেছে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' এবং বিশেষ কয়েকটি উপন্যাসকে। যে উপন্যাসগুলি তাঁর মতে, কথাসাহিত্যিক ও গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করবে।

'অবতরণিকা' অংশটিকে বাদ দিলে, 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের অধ্যায় আটটি। এই আটটি অধ্যায় হলো যথাক্রমে - 'কাহিনী ও রচনা', 'গল্পগুচ্ছ', 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', ও 'ঘরেবাইরে', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়'। এছাড়া, বইটির 'পরিশিষ্ট' অংশে সংযোজিত হয়েছে 'চোখের বালি', 'রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ', অমিয় চক্রবর্তীর লেখা 'শেষের কবিতা ও লাবণ্য' এবং বুদ্ধদেব বসুর লেখা 'শেষের কবিতা ও অমিত রায়'।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থের 'অবতরনিকা' অংশে কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহার শুধুনয়, তাঁর উপন্যাস রচনারীতি, প্লট গঠন ইত্যাদি নিয়ে ও সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক বুদ্ধদেব। গ্রন্থের 'অবতরণিকা' অংশটি এই জন্যই মূল্যবান যে এই অংশে প্রায় সমগ্র গ্রন্থটির একটি সূত্র রচনা করেছেন তিনি। আলোচনা করেছেন শুধু রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প - উপন্যাসের শিল্প সফলতার দিকই নয়, ভাষাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বিবর্তন বিষয়েও তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ এখানে পাই। চলিত ভাষার প্রবর্তনের প্রসঙ্গটি তো আছেই, এছাড়াও বুদ্ধদেবের বক্তব্য এইরকম —

> গদ্যে এতদিন সতর্কভাবে চলেছিলেন, যেন তারই ক্ষতিপূরণ
> স্বরূপ একেবারে নির্ভয় হলেন এবার। ... আরম্ভ করলেন
> ভাষা নিয়ে পরীক্ষা; ভাঙলেন, গড়লেন, ছেঁটে দিলেন,
> জুড়ে দিলেন।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের ভাষাব্যবহার সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের এই বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্য লেখায় হাত দেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যজগতের একচ্ছত্র অধিপতি। যে কোনো সাহিত্যব্রতীর পক্ষে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথও পারেন নি। এ অধ্যায়ের শেষে বুদ্ধদেব এই সিদ্ধান্ত করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পকার হিসেবে যতটা সফল ঔপন্যাসিক হিসেবে ততটা নন। বহুদিন পর্যন্ত বঙ্কিম প্রবর্তিত রক্ষণশীল পথ ধরেই তিনি চলেছেন। উপন্যাসের প্লট গঠনেও রবীন্দ্রনাথ তেমন কুশলী নন, বরং দুর্বল - একথাও তিনি বলেছেন।

> উপন্যাসের রূপের দিকেও বদল হলো।[৫৩]

বুদ্ধদেবের এ মন্তব্য খুবই যুক্তিসঙ্গত। কারণ 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) প্রকাশিত হবার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকী প্লটপ্রধান উপন্যাসের মোহ কাটিয়ে উঠলেন। তাঁর উপন্যাস হয়ে উঠলো বক্তব্যপ্রধান ও ভাবনির্ভর। সেই সঙ্গে শুরু করলেন কথাশিল্পের কলাকৌশল নিয়ে বিচিত্র করমের পরীক্ষা। পত্রাকারে গল্প, ডায়েরিধর্মী উপন্যাস, 'চতুরঙ্গে'র মতো অভিনব আঙ্গিকের উপন্যাস এবং 'শেষের কবিতা'র মতন বিশুদ্ধ গীতিময়তার সৌন্দর্যে পূর্ণ উপন্যাস। উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে এই যে নতুন নতুন নিরীক্ষা, এর মাধ্যমে তিনি খুঁজেছিলেন —

> উপন্যাসের এমন একটি রূপ, যা কবির স্বভাবের পক্ষে অনুকূল।
> তাঁর ভিতরকার কবিটি যাতে প্রশ্রয় পায়, কবিত্ব সহযোগী হয়
> কথাশিল্পে, এই ছিলো রবীন্দ্রনাথের সচেতন না হোক
> অচেতন মনের লক্ষ্য।[৫৪]

তাই উপন্যাসের প্রথাবদ্ধ, গতানুগতিক ধরণাগুলি তাঁর পছন্দ হ'লো না - 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬), 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি মুক্তির পথ খুঁজলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলি যেমন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) কে আলোচনার অযোগ্য বলে মনে করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'চোখের বালি'র (১৯০৩) মতো পরিণত, মনস্তত্বমূলক উপন্যাসের পর রবীন্দ্রনাথ 'নৌকাডুবি'র মতো কৃত্রিম প্লটনির্ভর উপন্যাস কিভাবে লিখলেন এ ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছে সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর কাছে। তাঁর মতে, 'নৌকাডুবি' হল "ঘটনাজটিল অসংগতি বহুল উপন্যাস।"[৫৫] রবীন্দ্রনাথ কখনো যে এ রকম বই লিখতে রাজি হয়েছিলেন, এ কথাটি ও তাঁর কাছে দুঃখজনক মনে হয়েছে।

কিন্তু, 'চোখের বালি' সম্বন্ধে তাঁর মত এই যে, অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিকতার দিকে পা বাড়ালেন। 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তত্ত্ব প্রধান উপন্যাস। এখানে বাইরের দিক থেকে কৃত্রিমভাবে ঘটনা সাজানো হয়নি, মানুষের অর্ন্তলোকের গভীরে ডুব দেওয়াই এখানে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম পেরেছিলেন —

> মানুষের গহন মনে আলো ফেলতে।[৫৬]

মনের কারখানা ঘরে প্রবেশ করে, মানুষের আঁতের কথা কে বিশ্লেষণ করতে 'চোখের বালি' বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নিশ্চিত সফলতার আভাস। বঙ্কিম-শরতের সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল থাকলে ও, নরনারীর জীবনে ত্রিভূজ প্রেমের প্রস্ফুটন ও পরিণাম প্রদর্শনে এ উপন্যাসে বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবকে ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হন নি। তাঁর -

> স্বভাবে আর উত্তরাধিকারে যে - বিরোধ ছিলো, তার দুষ্ক্রিয়তার
> সবচেয়ে শোচনীয় দৃষ্টান্ত 'চোখের বালি'র উপসংহার।[৫৭]

বিনোদিনী বিধবা। তাই তার সমাজনীতি-সঙ্গত শাস্তিপ্রদান করেছিলেন তাকে কাশী পাঠিয়ে। যেটা তখনকার দিনের বিধবাদের জীবনে ছিল প্রায় অবধারিত পরিণাম। বিধবার জীবনে প্রেমকে স্বীকৃতি দেবার সাহস ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাই,

তৎকালীন কানুনমতো কাহিনীটিকে সুগোলভাবে শেষ করতে[৫৮]
চেয়েছিলেন তিনি। বিধবার শাস্তিবিধান এবং কাহিনীর সমাজ অনুমোদিত উপসংহার - এই দুই -এর টানাপোড়েন 'চোখের বালি'র শিল্পগত সৌন্দর্যের ও সফলতার হানি ঘটিয়েছে। বুদ্ধদেব এক বলেছেন - "অপঘাত"।[৫৯]

আধুনিক য়ুরোপীয় উপন্যাসে প্লটের ধারনা বদলালেও রবীন্দ্রনাথের সামনে আদর্শ হিসেবে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই 'বউঠাকুরাণীর হাট' বা 'নৌকাডুবি'তে আমরা পাই সেই ক্রমাগত কৃত্রিম উপায়ে প্লট বয়ন, অনাবশ্যক পাঠক-ভোলানোর জটিলতা। কিন্তু, এসব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব মনে করেছেন যে, এই যান্ত্রিক প্লট রচনায় খুব বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না রবীন্দ্রনাথ। যে উপন্যাসে তিনি প্লটের দাবি সবটুকু মিটিয়েও নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাবে বলতে পেরেছেন সে উপন্যাসটি হলো 'গোরা' (১৯১০)। যদিও এই উপন্যাসের গল্পাংশের সূচনাই একটি গাড়ির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তবু, বক্তব্যের দৃঢ়তায়, আন্তরিক অনুভবের গভীরতায় - প্লট এখানে তুচ্ছ হয়ে যায়, যা পাওয়া যায় তা নিছক প্লটের চেয়ে অনেক বেশী। এখানে রবীন্দ্রনাথের কবি ও কথা সাহিত্যিক এই দুই সত্তার সমন্বয় ঘটেছে। এদিক থেকে 'গোরা' উপন্যাসটি একটি উজ্জ্বল আসন অধিকার করে আছে। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস আলোচনায় কাব্যধর্মিতা আর প্লটমুখ্যতার এক দ্বিধান্বিত বিন্যাসের মডেল গড়েছেন। 'গোরা' তাঁর মতে, সেই দ্বিকোটির মধ্যবর্তী ভারসমতায় পৌঁছেছে। বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি যুগের সম্পূর্ণ মর্মকথা এই গ্রন্থে প্রকাশিত। বুদ্ধদেব পরবর্তী কালে 'গোরা' সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করেছেন। এটি উল্লেখযোগ্য —

> কাল অসুখে শুয়ে বহুকাল পর 'গোরা' পড়ছিলাম - উপন্যাস
> হিসেবে খুব যে ভালো লাগছিলো তা নয়। কিন্তু দেখছিলাম
> যে ভারতবর্ষ বিষয়ে এমন কোনো চিন্তা নেই যা রবীন্দ্রনাথ
> ভাবেননি- আধুনিক ভারতের এমন কোনো সমস্যা নেই যা
> তাঁর চিত্তে প্রতিভাত না হয়েছিলো।[৬০]

'গোরা' উপন্যাসের গল্পাংশ রবীন্দ্রনাথের সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক চিন্তাধারার বাহন মাত্র নয়। তা হলে, এই উপন্যাসের মূল্য আজকের দিনে প্রয়ে কিছুই থাকতো না। কেননা,

> হিন্দু - ব্রাহ্মের বিরোধ আজকের দিনে অস্তিত্বহীন।[৬১]

'গোরা'র কোনো চরিত্রকে অস্পষ্ট বলে মনে করেন নি বুদ্ধদেব, হারাণবাবু, বরদা সুন্দরী, কৈলাস, হরিমোহিনী - এই গৌণ চরিত্রগুলিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রো উদ্ভাসিত। তাছাড়া, আনন্দময়ীর মতো প্রাণবন্ত চরিত্রও রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের পাশাপাশি পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকটা দুর্বল ও নিষ্ক্রিয়। বঙ্কিমসাহিত্য নারীচরিত্র যতটা সক্রিয়, পুরুষ চরিত্রগুলি তুলনায় অনেকটা কর্মবিমুখ, তাদের কর্মজীবনের কোনো খবর আমরা জানতে পারি না। তাই, বুদ্ধদেব বসুর কথার সঙ্গে একমত হয়ে

বলা যায় যে গোরার মতো এরকম প্রবল পুরুষ চরিত্রও রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্লভ। সেকারনেই হয়তো

রবীন্দ্রনাথ গোরাকে শ্বেতাঙ্গতণয় করেছেন।[৬২]

রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) ও 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাস দুটিও বুদ্ধদেব একটি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি এই দুটো উপন্যাসে অনেক সামান্য লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। উপন্যাস দুটি সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্যগুলির অধিকাংশই ভাষা এবং কারুকৌশল সম্পর্কিত। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' প্রথম বই

যেখানে উপন্যাসের পুরনো পদ্ধতি আর তাঁর যথেষ্ট বা
উপযোগী বলে মনে হলো না, নতুন পথ নিতে হলো।[৬৩]

সাধুভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' এবং চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস 'ঘরেবাইরে',। এই অমিলের মধ্যেও বুদ্ধদেব বসু একটি মিল দেখতে পেয়েছেন তা হল -

'চতুরঙ্গে'র সাধুভাষায় চলিত ভাষার অনেক গুণ বর্তমান, আর
'ঘরে বাইরে'র চলিত ভাষা অনেকাংশে সাধুভাষা।[৬৪]

'চতুরঙ্গে'র ভাষাকে নানাভাবে খেলাতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে শ্রান্ত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই এখানে ভাষা হয়েছে —

এমন স্বল্প ও চাপা যেন আগাগোড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলা,
কোথাও দম ফেলার জায়গা নেই।[৬৫]

আর 'ঘরে বাইরে'র ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —

অলংকারের এমন প্রাচুর্য যে কথাগুলি প্রায়ই বক্তৃতাঢঙের হায় পড়ে।[৬৬]

চতুরঙ্গের ভাষাকে তিনি বলেছেন 'ভূষণবিরল'[৬৭] আর 'ঘরেবাইরে'র ভাষাকে বলেছেন —

চলতে ফিরতে পায়ে মুক্তো ঠেকে।[৬৮]

নানা ত্রুটি সত্ত্বেও " 'ঘরে বাইরে' কে আধুনিক বাংলা গদ্যের একটি উৎস"[৬৯] হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও 'ঘরেবাইরে' চলিত ভাষার প্রথম উপন্যাস তাই এতে কিছুটা আত্মসচেতনতা অনিবার্য ছিল। কিন্তু

একে তিনি নিয়ে গেলেন একেবারে সমারোহের উচ্চশিখরে।[৭০]

ভাষার ক্ষেত্রে এই আত্মহারা অবস্থা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কাটিয়ে উঠেছিলেন। তবুও একথা ঠিক যে ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা নিরীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে 'চতুরঙ্গ'ও 'ঘরেবাইরে'।

'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে বুদ্ধদেব দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি এক আধুনিক মূর্ত্তি। লিখেছেন -

আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়,
কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তর যেন আমাদের কল্পিত
রবীন্দ্রযুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো, ...।[৭১]

উপন্যাসটির ভাষাই সবচেয়ে বেশী চমক সৃষ্টি করেছিলো

এর ভাষা গতিশীল, দ্যুতিময় বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে
এভাষা চোখে পড়েনি।[৭২]

তাঁর মতে বাংলাগদ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতির মূলে অনেকখানি রয়েছে এই গ্রন্থের প্রভাব। 'ঘরেবাইরে'তে চলতি ভাষায় উপন্যাস রচনার যাত্রা শুরু। 'শেষের কবিতা'র পর থেকেই চলতি ভাষার ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠলো সাহিত্যে। এই কারনে এই গ্রন্থকে "বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা"[৭৩] বলে উল্লেখ করছেন তিনি।

উপন্যাস হিসেবে দেখতে গিয়ে শেষের কবিতা সম্বন্ধে অনেকগুলি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন বুদ্ধদেব —

ক) এখানে কবিত্বশক্তির আপপ্ররোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। উপন্যাসটির অনেক অংশ উদ্ধৃত করে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ সেখানে অকারণে কবিত্ব করেছেন। সংলাপকে করে তুলেছেন "পীড়াদায়ক"[৭৪] এতে আছে দশটি রীতিমতো কবিতা, গ্রন্থের পক্ষে এগুলির যাথার্থ্য স্বীকার করলেও "ভাষার মায়াজাল"[৭৫] সৃষ্টি করে কবিত্বশক্তির অপব্যবহার করা হয়েছে।

খ) রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যে সংলাপের বিষয়ে যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাও উঠতে পারে শুধু শেষের কবিতা আর পরবর্তী রচনাগুলি সম্পর্কে —

অমিত রায়ের বাক্যবন্ধে, রাবীন্দ্রিক দীপ্তিপাত শুধু স্বাভাবিক
নয় অনিবার্য বলে ধরে নেয়া যায় - নেয়া যেতো যদি না সে
মাঝে মাঝে তুচ্ছ কথাও জাঁকালো করে বলতে গিয়ে
অনুপাতবোধে ব্যাঘাত ঘটাতো।[৭৬]

গ) এই উপন্যাসের জন্য ভুল নায়ক নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[৭৭]

অমিত রায় কথার কারিগর। কিন্তু ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে তার অন্তঃ সারশূন্যতা, তার বাগ্মিতার ফাঁপা আওয়াজ। তার নাবালক চরিত্র। উপন্যাসে এহেন অমিতের প্রভাব যথেষ্ট। বুদ্ধদেব তা মেনে নিতে পারেননি।

তাছাড়া, 'শেষের কবিতা'য় যে প্রেম-বেদনার সুর ছড়িয়ে আছে তা ও অমিত-লাবণ্যর কথাবার্তার মধ্যে লাগেনি। বলে তিনি মনে করেছেন। বরং এই সুর একটু খুঁজে পাওয়া যায় কেটির রঙ করা গালের উপর দেয়ে গড়িয়ে পড়া চোখের জলে। আর তাই তিনি বলেন যে

লাবণ্যের চেয়ে কেটি অনেক জীবন্ত, শোভন পালের চেয়ে
অনেক বেশি উজ্জ্বল নরেন মিটার, ...।[৭৮]

সমালোচক বুদ্ধদেবের এই সমালোচনাটিকে আমরা খুব একটা মেনে নিতে পারিনা। কেননা, প্রেম-বেদনার সুর যে শুধুমাত্র চোখের জলে মাপা যায় না তা আমরা সবাই জানি। আসলে, 'শেষের কবিতায় বুদ্ধদেব মূলতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন এর ভাষা এবং শৈলীগত আলোচনার উপর। এদিক থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভের অধিকারী। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এটি

সার্থক নয় বলে তিনি মনে করেছেন।

'দুইবোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাস দুটি বুদ্ধদেব একই প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। 'চতুরঙ্গ' ও ঘরেবাইরে'র প্রকরণগত মিলের কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে'র সাদৃশ্যকে তিনি আরো ''দূরস্পর্শী''[৭৯] বলেছেন। দুটি উপন্যাসেই

প্রণয় ব্যাপারে অনেক বেশী সাবালক ভাব পাওয়া যায়।[৮০]

এর আগে 'চোখের বালি' ও 'ঘরেবাইরে'তে সামাজিক বিধি বিধানের কাছে সত্য বিসর্জিত হয়েছিলো। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী সর্বগুণে গুণান্বিতা হয়েও তার প্রেম শেষ পর্যন্ত বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি খোঁজে। আর 'ঘরে বাইরে'র বিমলা বাইরে বেরিয়েছিল বলেই তার যা পোড়ার পুড়ে ছাই হয়ে যায়, বুদ্ধদেব বলেন যে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভেবেই নিয়েছিলেন

হৃদয়ের উপর শাস্ত্রনীতিকে জয়ী হতে দেবেন না।[৮১]

আর তাই সামাজিক বেড়ি ভেঙ্গে বেড়িয়ে এলো নায়ক পুরুষ। অর্থ্যাৎ বুদ্ধদেবের সমালোচনায় আত্মভাবনার দর্পন একটা থাকছেই। প্রথম পর্বে তাঁর রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রনীতিকে হৃদয় বোধের উপর জয়ী করবেন স্থির করে উপন্যাস লিখেছিলেন। আর শেষ পর্বে এর উল্টোটা স্থির করে লিখেছেন। দুইক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে লিখেছেন। কোনো খানেই স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নন। এই pre conceived idea নিয়ে লেখাকে সমালোচক তাঁর পছন্দমতো ভালোমন্দ বলতে পারেন।

দুটি উপন্যাসেই অনেক অসংগতির কথাবলেছেন বুদ্ধদেব। কামনার স্বার্থপরতাকে দৃঢ়চিত্তে অনুসরণ করতে গিয়ে -

'মালঞ্চ'কে তিনি করে তুলেছেন একটি নিষ্ঠুর কাহিনী।[৮২]

নীরজা চরিত্রটিও তাঁর কাছে

উৎকট অবিচারের দৃষ্টান্তস্থল।[৮৩]

যে কঠিন শাস্তির মধ্য দিয়ে নীরজার মৃত্য হলো, এজন্য কাহিনীর মধ্যে যে বাতাবরণ সৃষ্টি করা দরকার রবীন্দ্রনাথ তা করেননি। নীরজার সঙ্গে তাঁর স্বামীর কত সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে, সরলাকে পেয়ে সেই স্বামীই নীরজার প্রতি বিমুখ হয়েছে। এরমধ্যে সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্বও স্থান পায়নি। আর তাই সমালোচক শ্রীবসুর মতে —

এখানে দ্বন্দ্বের অভাবে যথার্থ্যের ক্ষতি হয়েছে।[৮৪]

কিন্তু, 'মালঞ্চে'র বিষয় সমগ্র রবীন্দ্র জীবনে এবং রবীন্দ্রনাথের আজীবনের সাহিত্যে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে, আমরা জানি। 'জীবনস্মৃতি'তে পেনেটির বাগানে বাড়ির কথা আছে, এছাড়া, চন্দননগরের বাগান বাড়ির কথা আছে 'জীবনস্মৃতি, ও 'আত্মপরিচয়ে'। সাহিত্যে বাগান বাড়ি কখনো মানুষের মন কখনো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীকায়িত রূপকে বোঝায়। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' 'মনের বাগানবাড়ি' নামক প্রবন্ধে আমাদের প্রত্যেকের মনের এই বাগান বাড়ির কথা বলা হয়েছে। সে বাগান বাড়ি সকলের

জন্যে নয়, সে যাকে ভালোবাসে তাকেই ডেকে নেয়। বাগান হল নিজের হাতে তৈরী প্রকৃতি - সেখানে কোনো কদর্যতা নেই, সমস্ত তুচ্ছতা, দৈন্যকে আমরা অতিক্রম করতে পারি। 'বেশী দেখা ও কম দেখা' প্রবন্ধেও এই বাগানের কথা আছে। 'চোখের বালি'তে ও আছে এই বাগানবাড়ির প্রসঙ্গ যা বিনোদিনী ও বিহারীর সম্পর্কের দ্যোতক হয়ে যায়। বাগান নিয়েই গল্প গড়ে উঠেছে 'ব্যবধান', 'নষ্টনীড়' প্রভৃতি। এরই একটি পূর্ণ রূপ, আমরা দেখতে পাই 'মালঞ্চেও'। এখানে দুটি বাগান যেন এক হয়ে গেছে। একটি নীরজা ও আদিত্যের দাম্পত্য সম্পর্কের নন্দন কানন ছিল। নীরজার বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাগানকেও সে স্বামীর মতোই পরম মমতায় গ্রহণ করে। অধিক বয়সে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাগানকেই সে সন্তানরূপে প্রতিপালন করে। কিন্তু সরলার সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্কের সূত্র ধরে সেই বাগানকেও সে হারাতে বসে। তাই তার মনটি আগাছায় ভরে যায়। ক্ষুদ্র ঈর্ষা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির জন্মনেয়, অন্যদিকে আর একটি বাগান হল সরলা ও আদিত্যের সম্পর্কের বাগান। যার জন্ম নীরজার অসুস্থতা থেকে তো নয়ই বরং আরো অনেক আগে থেকেই। সরলার সঙ্গে শৈশব থেকেই আদিত্যের পরিচয়, বাগানের পরিচর্যার সূত্রে তাদের মনের বাগান কখন গড়ে উঠেছিল তা তারা জানত না। নীরজার অসুস্থতার সূত্র ধরে - নীরজারই সন্দেহের কারণে এর মূলে টান পাড়ে। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় অন্য চেতনা। খোঁজ পায় হারিয়ে যাওয়া বাগোনের গভীর জলের ঝাঁপসা গান্ধ। তারা দুজনেই অনুভব করে যে এই বাগানের গাছের শিকড় কত গভীর যা তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার ব্যর্থতা বিড়ম্বনায় কখনো হারাবার নয়। আর তাই একথা বলা যায় যে শুধুমাত্র নীরজার স্বাস্থ্যহীনতাই তাদের সম্পর্কের ভাঙন ঘটায় না, বরং সবশেষে নীরজার মৃত্যু ও এর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকালীন চিন্ত াভাবনাই অনেক পরিমানে কাজ করেছে।

'দুই বোনে'র অসংগতি হিসেবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন যে, শ্যালিকা উর্মিলার সঙ্গে শশাঙ্কের প্রণয় মসৃণভাবে এগিয়েছে। যেন, তাদের কোনো পিছুটান নেই, দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। অথচ এতেও দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ছিলো। বুদ্ধদেবের মতে 'দুইবোন' 'মালঞ্চে'র তুলনায় বিশ্বাসযোগ্য। শশাঙ্ক উর্মিলার প্রেমপর্বের জন্য রবীন্দ্রনাথ খানিকটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন যে শর্মিলা মায়ের জাতের মেয়ে, আর উর্মিলা প্রিয়ার জাতের। তাই উর্মিলার জন্যে শশাঙ্কের মনে চাহিদা সৃষ্টি স্বাভাবিক ছিলো। আর উর্মিলাও শশাঙ্ককে মনে মনে পছন্দই করতো।

শশাঙ্ক-উর্মির প্রণয়বন্ধনে, তাই যথার্থ অনিবার্যতা আছে।[৮৫]

শশাঙ্ক একদিকে শ্যালিকার সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত, অন্যদিকে, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত করতে সে আপিসঘরে স্ত্রীর ছবি টানিয়ে ফুল সাজিয়ে রাখে। স্ত্রী ও প্রেমিকার দ্বৈত টানাপোড়েনে শশাঙ্কের এই হাস্যকর উপস্থাপনার জন্যই 'দুইবোন' প্রানবন্ত হয়েছে। 'মালঞ্চে'র তুলনায় 'দুই বোনের বিশ্বাসযোগ্যতার কথা বলেও বুদ্ধদেব এখানে একটি ভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। 'দুই বোনে' শশাঙ্ক তার স্ত্রী শর্মিলাকে দেবীর আসনে বসিয়ে শ্যালিকার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে। শশাঙ্কের এই অবস্থাকে, বুদ্ধদেব 'ভাবালুতা'[৮৬] বলেছেন। 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ও দুদিক বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'দুইবোনে'

এই ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শর্মিলাকে দেবী বানিয়ে তুললেন।[৮৭]

এমনও হতে পারে যে, আধুনিক পাঠকের মানসিকতার কথা বিবেচনা করেই রবীন্দ্রনাথ শর্মিলার স্বামীকে প্রেমিকার হাতে তুলে দিলেন।

'চার আধ্যায়ে'র (১৯৩৪) সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু কারুকৌশল এবং বিষয়বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দুটি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য পাশাপাশি এমন জড়িয়ে আছে যে সেগুলিকে পৃথক করা দুরূহ। 'চার অধ্যায়' কে তিনি বলেছেন আগাগোড়া নাটকের চালে লেখা। চারটি অধ্যায়কে নাটকের চারটি অঙ্ক হিসেবেই দেখা যায়। এটি রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস হলে ও এর মধ্যে আখ্যান অংশ খুবই কম।[৮৮] এর বিষয় বস্তুতে যে উপাদান আছে তা নিয়ে নাটক বা উপন্যাস রচনা করা গেলেও রবীন্দ্রনাথ তা করেন নি। তাঁর উদ্দেশ্য - এলা-অতীনের মরণান্ত ভালোবাসা দেখানো যা কিনা 'কচ-ও দেবযানী'র মতো কাব্যালাপে কিংবা 'ক্যামেলিয়া'র মতো গদ্য কবিতাতেই সম্ভব। তাই বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

> 'চারঅধ্যায়' বিষয়ে সত্য কথাটা এই যে, জিনিশটা কাব্য,
> 'শেষের কবিতা'র চেয়ে ও নিবিড় অর্থে তা-ই; কাব্য হিশেবে
> দেখলেই এর প্রতি বিচার হ'তে, পারে।[৮৯]

অন্য একটি কারণেও 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্র সাহিত্যে ও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ সম্মানের অধিকারী। তা হল - 'ল্যাবরেটরী' গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন "তার আর একটি উদাহরণ চারঅধ্যায়।"[৯০] 'চার অধ্যায়ে'র পাঠযোগ্যতার কারণ সন্ধান করে বুদ্ধদেব বসু এর কবিত্ব গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ঘরেবাইরে'র সময় থেকেই এই কবিত্ব শক্তির জাগরণ ঘটে।

বুদ্ধদেব বসু নিজে কথাসাহিত্যের তুলনায় কবিতার স্থায়িত্বের কথা বলেছেন।[৯১] গদ্যও পদ্যের মধ্যে তাঁর পক্ষপাত পদ্য অর্থ্যাৎ কবিতায়। তাঁর মতে, রবীন্দ্রনাথের পদ্যগ্রন্থ গুলির প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এই প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে ছন্দের অদম্য গতি থেকে। কবিতা তাঁর ছন্দের পাখায় ভর করে ইঙ্গিতময় ভাবমণ্ডলে ভ্রমন করে চিরকালটাকে জয় করে নেয়।[৯২]অন্যদিকে, ঔপন্যাসিক, কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ জীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে উপাদান সংগ্রহ করেন। সমাজব্যবস্থা যেহেতু অবিরতই পরিবর্তিত হচ্ছে তাই আজকের দিনে যাকে অভিনব ও কৌতূহলের বিষয় মনে করা হয়, কিছুদিন পর তাতে আর আগ্রহ বজায় থাকে না। অর্থ্যাৎ, বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য আলোচনায় চিরন্তনতার উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কোনো রচনা স্থায়িত্বের মর্যাদা পেতে পারে যদি লেখক তার দেশকাল থেকে উপাদান আহরণ করেও সেই দেশকালকে অতিক্রম করতে পারেন। অর্থ্যাৎ, রচনা যেখানে নিজের কালকে আশ্রয় করে চিরকালের হয়ে ওঠে সেখানেই তার শিল্পগুণ।

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের গল্প আলোচনা করতে গিয়ে কবিতা আর গল্পের পার্থক্য দেখিয়েছেন। সেখানে, একদিকে দেখা যায় ভাবের প্রাধান্য, সেটা কবিতার রাজ্য। আর যেখানে যাকে চলতি কালের জীবনের বৈচিত্র্য সেটা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্র। এই চলতিকালের জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যেই তিনি খুঁজেছেন চিরকালের সম্পদ। এই ভাবে সমালোচনায় গল্প, উপন্যাসকে কবিতা থেকে আলাদা করেও

তাকে কবিত্বের ধর্ম থেকে, বাইরে রাখেন নি। গল্প উপন্যাসে চাই চিরকালের বাণী। আর সেই চিরকালের বাণীর সম্পদ কবিতার ভাবের জগতের সম্পদ। কবিতার সঙ্গে গল্পকে এইভাবে পৃথকীকৃত করে তিনি গল্পের স্থায়িত্বের নতুন বৈশিষ্ট্য সন্ধান করেছেন। তার প্রথম বৈশিষ্ট্য সে সমকালের জীবনের উপরে স্থায়ীকালের ভাবধর্মকে ফুটিয়ে তুলেছে। আর তার দ্বিতীয় গুণগত বৈশিষ্ট হল সে প্রকৃতির পটে মানব জীবনের চিরন্তনতাকে উত্থাপন করেছে।

কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে ও তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরেবাইরে' - প্রভৃতি কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ এই চিরকালীন আবেদনের খদ্ধ, বিশ্বমানবিক পটভূমিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর যেখানে এই চিরকালীন আবেদনকে তিনি মূল্য দেননি, কথাসাহিত্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে ও সেগুলি সার্থক হতে পারেনি। 'গল্পগুচ্ছে'র গল্প গুলি

> বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণপূর্ণ অম্লানতার স্পর্শ পেয়েছে।[৯৩]

প্রকৃতির মধ্যে যে "অজেয়জৈব শক্তি"[৯৪] আছে গল্পগুলিও যেন সেই শক্তি থেকেই উৎসারিত। প্রকৃতি যেমন পুরনো হয় না, এই গল্পগুলোও তেমনি। 'গল্পগুচ্ছে'র অনেক গল্প থেকে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন যে প্রকৃতি সেখানে কিরকম সচল, সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। যেমন - 'মেঘও রৌদ্র' গল্প। এখানে বারে বারেই এসেছে —

> বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ নির্বিকার উদাসীনতার সঙ্গে মানব জীবনের
> ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক ঘটনা বিক্ষোভের প্রতিতুলনা।[৯৫]

ব্যাপ্ত বিশ্বের পটভূমিতেই গল্পগুচ্ছের প্রকৃতি ও মানব চরিত্র পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিক অনুভূতি হয়েছে বিশ্বজাত। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পেও

> ব্যক্তিগত শোক বিশ্বশোকে রূপান্তরিত হয়েছে।[৯৬]

রতনের শোককে মাটির পাত্রে জল পড়ার মাধ্যমে প্রতীকায়িত করেছেন লেখক। এখানে রতনের বেদনার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বচরাচরের বেদনা যেন এক হয়ে গেছে। প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি এখানে অভিন্ন। প্রকৃতিই যেন আবহমান মানব প্রকৃতি। 'গল্প গুচ্ছে'র আরো অনেক গল্প ও গল্পাংশ উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন প্রকৃতি সেখানে জীবনের অংশ, গল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতিকে অবস্থান করেই 'গল্প গুচ্ছ' বিশ্বজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির বাণীরূপ তুলে ধরতে পেরেছে।

> সমগ্র 'গল্পগুচ্ছে'র ভিতরে এই বিশ্বজীবনের আভাস ব্যাপ্ত
> হয়ে ছড়িয়ে আছে, কখনো প্রছন্ন কখনো প্রকাশিত,
> কখনো তার ঈষৎ ছোওয়া লাগে।[৯৭]

বুদ্ধদেব বসু 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিতে প্রধনাতঃ যা লক্ষ্য করেছেন তা হল এর বাস্তবগ্রাহ্যতা। নদীস্রোত থেকে আরম্ভ করে বাঁশবন, চণ্ডীমণ্ডপ, ভয়, লজ্জা, হাসি, কান্না সমস্তই যেন গ্রামবাংলা থেকে উঠে এসেছে। আর তাই, গল্পগুলি আজও প্রাণের বেগে স্পন্দমান, যেন

আমাদেরই জীবন প্রবাহ তাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।[৯৮]

অথচ রবীন্দ্রগল্পের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে এযুগের গল্পের নায়ক-নায়িকাদের বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রগল্পের নায়ক-নায়িকারা

এক দেশকালাতীত ভাবলোকের অধিবাসী[৯৯]

তা সত্ত্বেও তার গল্পকে অবান্তর বলে মনে হয় না। বরং জীবনঘনিষ্ঠ ও সত্য বলে প্রতিভাত হয়। 'গল্প গুচ্ছে'র আট অথবা তেরো বছর বয়সের নায়িকার কার্যকলাপ অস্বাভাবিক নয়, তুলনায় শেক্সপীয়রের নায়ক নায়িকারা অনেক সময়েই স্বাভাবিকতার বাইরে গিয়ে আচরণ করে। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েটে'র সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন —

'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' পড়বার সময় তাকে আমরা নিতান্ত বালিকা বলে সবসময় অনুভব করি না।[১০০]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ী —

... প্রকৃতই বালিকা, সে ব্যবহার জানে না, কথা বলতে জানে না,
মনের ভাব সে লুকোতেও জানে না। ... অথচ প্রেম এসে নিজের
অজান্তেই তাকে যখন ধীরে ধীরে যুবতী করে তুললো,
তার সেই রূপান্তরিত মূর্তিতে পৃথিবীর যেকোনো প্রেমিকাকেই
আমরা দেখতে পেলাম।[১০১]

ফলে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির চিরকালীনত্ব স্বীকার করতেই হয়। বর্তমান যুগও জীবনের আচার, আচরণ, ব্যবহার প্রভৃতি নানাদিক থেকে তাদের কিছুটা বিসদৃশ মনে হলেও মোটের উপর তারা মানব প্রকৃতির আন্তর্নিহিত সত্যকেই উদ্ঘাটিত করে। তাই আপাত বৈষম্যকে ছাড়িয়ে তাদের যাবতীয় জীবনানুভূতিকেই যথাযথ মনে হয়। আর তাই বুদ্ধদেবের বক্তব্য —

এই যাথার্থ্যের অনুভূতিটাই আসল জিনিশ। এটা যখন আমাদের
মনে সংক্রামিত হয়, তখন গল্পে বর্ণিত জীবনের সঙ্গে আমাদের
জীবনের আচার ব্যবহারের বৈষম্যে কিছু এসে যায় না।[১০২]

'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতিতে অভিনবত্ব বিশেষ কিছু নেই। যেখানে বিশেষত্ব ফুটেছে, বুদ্ধদেব সেগুলির উল্লেখ করেছেন পৃথকভাবে —

ক) 'গল্পগুচ্ছে'র রচনারীতি সরল ও সুমিত, কোথাও জমকালো নয়
... সব মিলিয়ে গল্পগুলি 'শাস্তি' গল্পের ছিদামের দেহের মতো,
একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায় ;
এই গুণটির আমরা নাম দিতে পারি সাত্ত্বিকতা।[১০৩]

উদাহরণ হিসেবে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন 'নষ্টনীড়', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'শাস্তি' গল্পের বিশেষ অংশ। যেখানে কত সুমিত বাকবিন্যাসে গল্পের চূড়ান্ত কথাটি বলে দিতে পেরেছেন তিনি অনায়াসে।

খ) এতে গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারাটিও লক্ষ্য করা যায়।

সাধু থেকে চলিত ভাষায়, ঋজু থেকে বঙ্কিম ভঙ্গিতে, সরলতা
থেকে সমৃদ্ধ কারুকলায়-বিবর্তনের সবগুলো ধাপই
... চিহ্নিত হয়ে আছে।[১০৪]

গ) গল্পগুলোর ভাষা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —

উপমার যথার্থ্যে, বর্ণনার বাস্তব ঘনতায়, এখানে একটি সুন্দর
সৌষম্য অনুভব করি — উঁচু নীচু নেই, ... শুধু কাহিনীকে
এগিয়ে দেয়াই তার উদ্দেশ্য।[১০৫]

ঘ) 'গল্পগুচ্ছে'র বিশেষণ ও উপমা ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

গল্পগুচ্ছে বিশেষণ ও উপমা সুপ্রচুর, কিন্তু তাদের একটিও অনর্থক নয় ;
বিশেষণগুলি অর্জুনের তীরের মতো লক্ষ্যভেদী ...।[১০৬]

যেমন 'ছুটি' গল্পে ফটিকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি বিশেষণ পর-পর ব্যবহার করেছেন,

কিন্তু একটিও বেশী হয় নি, কিংবা কোনোটিই অন্য
কোনো একটির আংশিক পুণরুক্তি নয়, প্রত্যেকটি
স্বতন্ত্র ও প্রয়োজনীয়।[১০৭]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস শিল্পগতভাবে দুর্বল। প্রথম থেকেই বঙ্কিমের অনুগামী। কিন্তু ছোটগল্পে প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রভাব কাটিয়ে উঠলেন, নিজের স্বাধীন পথ খুঁজে পেলেন। সমস্ত 'গল্পগুচ্ছে'র উপাদানে একমাত্র 'মহামায়া' গল্প ছাড়া আর কোথাও বঙ্কিমের অনুগামিতা নেই।

'পোষ্টমাষ্টার', 'একরাত্রি'র মতো গীতিধর্মী গল্প তো তিনি লিখলেনই - 'দুরাশা', 'দৃষ্টিদান', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি সাহিত্যগুণান্বিত নিটোল ছোটগল্পে অবশ্য

প্লটের উগ্রতাকে তিনি ক্রমশ ঃ আপন মানসরসায়নে
নমনীয় করে আনলেন, তার সঙ্গে মেশালেন মনস্তত্ত্ব,
কবিত্ব, জীবনদর্শন।[১০৮]

প্লটের যান্ত্রিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবিক মানসিক প্রবণতার একটা বিরোধ ছিল বলে মনে করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর এওমনে হয়েছে যে, 'গোরা' উপন্যাসে এই বিরোধের শুভ পরিণয় ঘটেছে। কিন্তু গল্প রচনার ক্ষেত্রে এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর প্রতিভাকে পীড়ণ করেছে, কোনো কোনো গল্পকে অখণ্ডভাবে রূপায়িত হতে দেয়নি। 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'সমাপ্তি'র মতো গল্পকে তাই অনেক সমালোচকের মতো বুদ্ধদেব বসুর মনে হয় নড়বড়ে, যেন গাঁটে গাঁটে ভাগ করা যায়। বেশ কিছু গল্পের উদাহরণ দিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'শুভদৃষ্টি'কে তাঁর মনে হয় নিছক প্লটের গল্প। আবার 'সদর ও অন্দরের' মতো বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বের গল্পকেও তাঁর মনে হয়েছে গল্পের খসড়া মাত্র। কিন্তু, প্লটের উচ্চতম লক্ষ্য যে রহস্যঘনতা, তাকেও রবীন্দ্রনাথ অবহেলা করেন নি। তাঁর 'মাষ্টারমশাই' আর 'মণিহারা' গল্পে

ঘটনার উত্তেজনা আর জীবনের ব্যঞ্জনা মিলেমিশে এক হয়েছে।[১০৯]

এখানে রবীন্দ্রনাথ প্লটের উপর তর্কাতীত কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন। কিন্তু, সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মনে করেন, এর পরেও রবীন্দ্রনাথের আরও একটি ধাপের প্রয়োজন ছিল। যা না হলে রবীন্দ্র প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হতে পারতো না। বুদ্ধদেবের মতে, 'কাবুলিওয়ালা' ও 'নষ্টনীড়' এরকম সুসম্পূর্ণ রচনার নিদর্শন।

বুদ্ধদেব বসু 'গল্প গুচ্ছে'র গল্পগুলি পড়ে তাঁর মনের ভালোলাগার বর্ণনা দিয়েছেন। আবার, এর পাশাপাশি ভালোলাগার কারণগুলিও খুঁজেছেন। তাঁর মতে, 'গল্পগুচ্ছে'র আবেদন কোনোদিন শেষ হবে না, কারণ - গল্পযোগ্য অন্যান্য গুণের সঙ্গে এখানে মিশে আছে আরও কতগুলি বিশেষত। যেমন - ১) চিরন্তনতা, ২) বাস্তবতা, ৩) প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্তি এবং ৪) কাব্য ধর্মিতা।
এই বৈশিষ্ট্যগুলিই 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলিকে চিরনূতন করে রেখেছে।

শুদ্ধশিল্পবাদী বুদ্ধদেব রবীন্দ্র রচনার ক্ষেত্রে যা কিছু বিশুদ্ধ লিরিক্যাল, গীতিময়, ব্যক্তিগত ভাবনার ছন্দে স্পন্দিত দেখেছেন তাতেই আকৃষ্ট হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। প্রায় ঐন্দ্রজালিক ভাষাশিল্পে তিনি এর বিশ্লেষণ করেছেন। সেই সঙ্গে মিশেছে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ঝক ঝকে গদ্যশৈলী। তাঁর লেখার সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে বিশ্বসাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান সম্পন্ন এক উজ্জ্বল মনস্বিতা। 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' নিবন্ধটিতে তাঁর এই মনোলোকের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই আমরা। নিবন্ধটি সুরু হয়েছে এই ভাবে -

> রবীন্দ্রনাথ গদ্য লিখেছেন কবির মতো ; তাঁর গদ্যের গুণ
> কবিতারই গুণ ; যা কবিতা আমাদের দিতে পারে, তা-ই
> গদ্যের উপঢৌকন।[১১০]

এখানেই প্রবন্ধের সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়েও তিনি বলেছেন —

> সাহিত্য ব্যাপারে সৃষ্টিকর্মই প্রধান ও প্রাথমিক, সমালোচনা
> তার অনুগামী মাত্র;[১১১]

এই নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রায় সব কটি মূল সূত্রই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। যাকে আমরা কবির হাতের প্রবন্ধ বলে থাকি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যেন তাই।

> যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো আলোচনায় বিষয়টাকে ছাপিয়ে
> ওঠে তার স্বর, দ্যুতি, স্পন্দন, বেগ, তরঙ্গ এক কথায় তাঁর
> ব্যক্তিস্বরূপ। অর্থ্যাৎ প্রবন্ধ যেমনটি হওয়া উচিত নয় বলে
> আমরা জানি - অন্তত পক্ষে পাঠশালায় যা শেখানো হয়ে থাকে -
> তাঁর প্রবন্ধ ঠিক তা-ই।[১১২]

প্রবন্ধ রচনায় যা দোষ বলে গণ্য হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সেগুলি গুণ।

যুক্তির বদলে তিনি দেন উপমা, তথ্যের বদলে চিত্রকল্প; যেখানে
পাঠককে স্বমতে টেনে আনা তাঁর প্রকাশ্য অভিপ্রায় সেখানে
তিনি তীক্ষ্ণ করে তোলেন তাঁর ইন্দ্রিয় গুলিকে। যেখানে বুদ্ধির
কাছে প্রমাণ দিতে হবে সেখানে তিনি আইনিভাবে আমাদের
হৃদয়ের আর্দ্রতা সম্পাদন করেন।[১১৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব এরকম মূল্যায়ণ-ই করেছেন।

। খ ।

কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের চিন্তা বহুদিনের। নানা সূত্রে সেগুলি গ্রথিত হয়ে 'কবিতা'র বিভিন্ন প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। তবু সেই রচনাগুলির মধ্যেও যেন তাঁর মতাদর্শের সম্পূর্ণ সুগ্রথিত রূপ ফুটে ওঠেনি। তবে কবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র অন্বেষণ তাঁর রবীন্দ্র কবিতা বিচারের মূল জিজ্ঞাসা। একটি সূত্রকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যমহত্ত্বের স্বরূপ সন্ধান এর মূল কথা। আর, এখানে তিনি বিচ্ছিন্ন কাব্য বিশ্লেষণ করে তাঁর মতাদর্শ ব্যাখ্যা করেন নি। বরং, পৃথক পৃথক ভাবে কবিতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত চয়ণ করে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র কবিতা বিচারের একটি অংশ পাওয়া যায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। যার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে তাঁর নিজেরই সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় (১৯৩৫) প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনা। এছাড়া, 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধ গুলিতেও রবীন্দ্র সাহিত্যের নানাদিকের পর্যালোচনা করেছেন তিনি। বিরুদ্ধবাদীদের রবীন্দ্র সমালোচনার উত্তরও দিয়েছেন বুদ্ধদেব। যে সব সাময়িক পত্র রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করতো যেমন সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' - তাদের যথোচিত প্রতিবাদও করেছেন ঐ 'কবিতার'ই পাতায়।

মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনা সংস্থার পক্ষ থেকে গজেন্দ্র কুমার মিত্র সম্পাদিত 'সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ' নামক একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। এই বইতেই আছে বুদ্ধদেব বসুর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা'। এই নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' ছাড়া ও আছে 'খেয়া', 'ক্ষণিকা', 'বলাকা', 'শিশু' প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা।

'কবিতা পত্রিকায় রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত' থেকে শুরু করে একের পর এক রবীন্দ্র-কবিতার সমালোচনা লিখেছেন। এইসব সমালোচনাতে তিনি মূলতঃ গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্র-কবিতার আঙ্গিকের উপর। আঙ্গিকের অভিনবত্বের-কথাই ঘুরে-ফিরে এসেছে বুদ্ধদেবের সমালোচনায়। বুদ্ধদেবের বক্তব্য —

তাঁর হাতে রীতি কখনো মুদ্রাদোষে অধঃপতিত হয় না, কেননা একটি
রীতি একবারের বেশি তিনি ব্যবহার করেন না। তাঁর প্রত্যেকটি

কাব্য গ্রন্থ রীতিতে ও বিষয় বস্তুতে স্বতন্ত্র। ... রবীন্দ্রনাথকে
কখনো আত্ম - অনুকরণের দোষ স্পর্শ করেনি।[১১৪]

তাঁর আর একটি বক্তব্য —

সাহিত্যের অজস্র রূপ ও রীতি, ভঙ্গিও সুর তিনি সৃষ্টি করেছেন,
উদ্ভাবন করেছেন আঙ্গিকের অফুরন্ত কলাকৌশল, যা অবলম্বন
করে বাংলাসহিত্য আজ ভারতের সীমান্ত - পেরিয়ে বিশ্বের সাহিত্য
অলকায় নিজস্ব মর্যাদার দাবি রাখে।[১১৫]

রবীন্দ্র রচনাবলী সমালোচনার সূত্রে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাতসঙ্গীত', 'মানসী', 'সৌনারতরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'কল্পনা', প্রভৃতি কাব্য একক ভাবেও আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। এবং তখনও তিনি কারুকৃতির উপর-ই জোর দিয়েছেন বেশি। 'মানসী'র কবিতাগুলি সম্বন্ধে লিখেছেন —

তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ
তিনি দেখালেন - উন্মুক্ত করলেন বাংলা কবিতার একটি বিরাট
সম্ভাবনার দরজা।[১১৬]

বুদ্ধদেবের মতে,

সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যের মূল বিষয়গুলি 'মানসী' তে লভ্য[১১৭]

এবং, তাঁর হাতে যেসব ছন্দ কখনো বীণা, কখনো শঙ্খ হয়ে মধুর
কি গম্ভীর সুরে বেজেছে।[১১৮]

'সোনারতরী' সম্পর্কে লিখেছেন —

এ কবিতাগুলির আলোচনায় কবিত্বশক্তির প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও
নিছক ছন্দের নৈপুণ্য, কবির virtuosity -ই পদে পদে আমাদের
মুগ্ধ করে।[১১৯]

'সোনারতরী' তে উল্লেখযোগ্য হ'লো,

বিজোড় - মাত্রার ছন্দে কবির আধিপত্য বিস্তার।[১২০]

বুদ্ধদেব মনে করেন,

'সোনার তরী'র পরে রবীন্দ্রনাথ নতুন ছন্দ আর উদ্‌ভাবন করেননি।[১২১]

"চিত্রা" কাব্যসমালোচনায় বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা - সম্পর্কিত তর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। রচনাবলীতে (৪র্থ খণ্ডে) 'চিত্রা' কাব্যের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই এসম্পর্কে উল্লেখ করেছেন -

বস্তুত 'চিত্রা'য় জীবনরঙ্গ ভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ
হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই
এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থলাভিষিক্ত নয়।[১২২]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮ সংখ্যায় বুদ্ধদেব রবীন্দ্র নাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, শুধু কি কবিতা লেখায় একজন কর্তা কবিকে আতিক্রম করে তাঁর লেখনী চালনা করেছেন ? এমন নয়া। বরং যে জীবন গঠিত হচ্ছে, সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ নিয়ে যিনি জীবনকে রচনা করে চলেছেন, তাঁকেই কবি তাঁর কাব্যে জীবনদেবতা নাম দিতে চেয়েছেন।[১২৩] বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> জীবন দেবতার এর চেয়ে প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা অসম্ভব।[১২৪]

তিনি এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন আরো কয়েকটি কথা - রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার অন্তর্গত "দ্বিত্বের অনুভূতির"[১২৫] সঙ্গে তিনি ইউরোপের কবি ডি. এইচ. লরেন্স ও ইয়েটসের কবিসত্তার তুলনা করে বলেন -

> ইয়েটস্ যাকে বলেছেন Mask বা Anti-self, লরেন্স যাকে
> বলেছেন ghost বা Demon, রবীন্দ্রনাথের অন্তর্যামী কি
> জীবনদেবতাও তা-ই।[১২৬]

আবার, 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ডের সমালোচনা - সূত্রে "চৈতালি", "কল্পনা" এবং "কাহিনী"র নাটকীয় কবিতাগুলি নিয়ে বুদ্ধদেব আলোচনা করেছেন পৃথকভাবে। এখানেও আলোচনা মুখ্যতঃ আঙ্গিকের উপর। "কাহিনী"র অন্তর্গত 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> পদ্যে চলতি ভাষায় ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের হাতে এই প্রথম -
> ... বাংলা কথোপকথনের বিশুদ্ধতা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বজায়
> রেখেও যে নিখুঁত পদ্যের ছাঁচে ঢালা যায়, তা রবীন্দ্রনাথ
> এখানেই প্রথম দেখালেন।[১২৭]

'কবিতা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের শেষপর্যায়ের কাব্যগুলি নিয়েও আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'কবিতা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্যের শেষ পর্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আলোচ্য কাব্যগুলি হলো - ক) 'বীথিকা', খ) 'পত্রপুট', গ) 'শ্যামলী', ঘ) 'খাপাছাড়া', ঙ) 'নবজাতক', চ) 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' ছ) 'জন্মদিনে' জ) 'ছড়া', ঝ) 'শেষ লেখা'। 'কবিতা' ঃ প্রথমবর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪২, 'নতুন কবিতা' শিরোনামে পুস্তক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা' কাব্যের সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'বীথিকা'র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

> রবীন্দ্রনাথ যেন রূপকথার কবি, তার চিরন্তন যৌবন।[১২৮]

'কবিতা' দ্বিতীয়বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩-এ নতুন কবিতা, শিরোনামে 'পত্রপুট' এর সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মনে হয়েছে, 'শেষ সপ্তকে'র রচনাগুলি তত্ত্বমুখী, কবির গভীর ও জটিল চিন্তাপ্রসূত।

কবিতাঃ দ্বিতীয়বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৩-এ 'শ্যামলী' কাব্যের আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে 'শ্যমলী'র কোনো কোনো কবিতা নাটকীয় কবিতা যেখানে আছে আমাদের পরিচিত জীবনের

ছোট ছোট ছবি আর

গদ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ঝোঁকটা খুব বেশি করেই এইদিকে।[১২৯]

'শ্যামলী' কাব্যটিকে বুদ্ধদেব একটি আধুনিক কাব্য হিসেবেও দেখেছেন। এর সমস্যাকে তিনি - 'আধুনিক' বলেছেন। তাঁর মতে, আধুনিক মননশীলতার প্রকাশ ঘটেছে 'শ্যামলী' কাব্যে।

'কবিতা' ঃ তৃতীয়বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৫-এ 'নতুন কবিতা' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' ও 'সে' গ্রন্থের আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'খাপছাড়া' কে তিনি বলেছেন -

মহাকবির অবসরের ফুলকি।[১৩০]

তাঁর মতে এটি গদ্যে-পদ্যে মেশানো 'গল্পসল্পে'র পূর্বসূরী। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোলে'র সঙ্গেও 'খাপছাড়া'র তুলনা করেছেন তিনি।

'কবিতা' - আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭ -এ 'নবজাতক'-এর পুস্তকসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বুদ্ধদেবের অস্বাক্ষরিত সমালোচনা এটি। 'নবজাতকে'র কবিতাগুলির দুটি বিশেষত্বের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। প্রথমতঃ কবিতাগুলিকে তিনি 'স্বল্পভাষী' বলেছেন।[১৩১] অলংকার বর্জন করে, কোনো আপাত চমৎকারিত্বের আশ্রয় না-নিয়ে কবিতাগুলি লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব - তাদের বিষয় বস্তুতে। কতগুলি আধুনিক বিষয় কবিতাগুলিতে স্থান পেয়েছে।

কবিতাগুলি সবই বিশ শতকের যন্ত্র সভ্যতাপীড়িত মানুষের
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা।[১৩২]

আধুনিক জীবনের বাস্তবদিক সম্বন্ধে এখানে কবি সচেতন।[১৩৩]

'কবিতা', রবীন্দ্র সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৮ এ (৮ই মে, ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের 'নতুন কবিতা' শিরোনামে বুদ্ধদেব 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, -

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই বই দুটির বিশিষ্ট স্থান
আছে। তাঁর কারন প্রধানত আঙ্গিকের। কবিতাগুলি ক্ষুদ্র ও
সংহত এবং এহিসেবে রবীন্দ্রনাথের মূল কাব্যশরীর থেকে
একটু স্বতন্ত্র।[১৩৪]

'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্যে'র কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে বুদ্ধদেব বসু দেখাতে চেয়েছেন —

তাঁর মতো সুক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন দুর্লভ, অতএব তাঁর মতো
সমাজসচেতন, সময় সচেতন কবিও দুর্লভ। ... আজ এই
বয়সেও তাঁর বৈরাগ্য আসেনি, এখনো বিশ্বের সমস্যা নিয়ে
মানুষের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে তিনি ব্যাকুল।[১৩৫]

'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৮ সংখ্যায় 'মৃত্যুর কবিতা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'জন্মদিনে' কাব্য গ্রন্থের সুদীর্ঘ আলোচনা পাওনা যায় সম্পাদকীয় অংশে। পৌষ ১৩৪৮ সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা। 'কবিতা' ৭ম বর্ষ ; আশ্বিন ১৩৪৮ - আষাঢ় ১৩৪৯-এ রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা করে বুদ্ধদেব লেখেন —

> সাহিত্যের যে-সব তত্ত্বের সাহায্যে আমরা কাব্যবিচার করি,
> তার কোনোটিই যেন এখানে খাঁটে না। কাব্যকলার সকল
> বিশ্লেষণ এ ছড়িয়ে যায়।[১৩৬]

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম যে বইটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা পাই, সেটি হ'লো 'সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৩)। বইটিতে দুটি ভাগ আছে। সঙ্গ নিঃসঙ্গতা এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বিভাগে "বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গঃ মানসী" নিবন্ধটিতে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-কবিতা মূল্যায়ণের সূত্রপাত। সে হিসেবে এ বইটির আলাদা গুরুত্ব আছে। এছাড়াও এ গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' নামক নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমার ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'Tagore : portrait of a poet' বইটির প্রথম সংস্করণ ১৯৬২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৬৬ সালে ভারবি প্রকাশনা সংস্থা প্রকাশ করেন 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে বুদ্ধদেবের প্রথম পূর্নাবয়ব আলোচনাগ্রন্থ এটি। গ্রন্থটিতে সংকলিত প্রবন্ধগুলি হ'লো যথাক্রমে - 'কবিতার সাতসিঁড়ি', 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ', 'এপার-ওপার' এবং 'ইংরেজীতে রবীন্দ্রনাথ' শেষের প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে পৃথক ভাবে। অর্থাৎ, একে বইয়ের অন্তর্গত আরেকটি বিভাগও বলা যায়।

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, (১৯৫৫) গ্রন্থের শুরুতে বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন - রবীন্দ্রনাথের কবিতা সমালোচনার মতো

> বিরাট বিষয়ের সমকক্ষ হ'তে আমার দেরি আছে।[১৩৭]

১৯৬৫ সালে 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সেই সমকক্ষতা তিনি হয়তো অর্জন করেছেন। কারন , 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি শুধুমাত্র রবীন্দ্রকবিতার -ই বিশ্লেষণ। এই একটি বইতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে তাঁর সমগ্র বক্তব্যকে সংহতকরবার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিষয়ে মৌলিক চিন্তার প্রকাশে 'কবি রবীন্দ্রনাথ' বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেবের 'An Acre of Green Grass' এর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক নিবন্ধটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। 'সঙ্গ নিঃ সঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ', গ্রন্থটির অন্তর্গত 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ ঃ মানসী প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১৮৯০) কাব্য গ্রন্থটি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে তিনি লিখেছেন—

> কলাকৌশলে, এবং ভাব বস্তুতেও 'মানসী'কে রবীন্দ্র কাব্যের
> অনুবিশ্ব বলা যায়।[১৩৮]

মূলত ঃ 'কবিতা', পত্রিকার রবীন্দ্রসমালোচনার বাইরে এসে যখন বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখলেন, তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' বইটি। শ্রী শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন

'মানসী'র উপর এতটা ভর করবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন নির্দিষ্ট
হয়ে গেল তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনার পথ। এরপর এটা যেন
প্রত্যাশিতই ছিল যে, 'কবি রবীন্দ্রনাথ' এর আলোচনায় তাঁর গণ্ডী
তৈরী হবে 'মানসী' থেকে 'গীতাঞ্জলি' পর্যন্ত।[১৩৯]

'মানসী'তে ছন্দ ব্যবহার সম্বন্ধেও বুদ্ধদেবের বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় "বাংলা কবিতার স্বপ্ন ভঙ্গ ঃ মানসী" প্রবন্ধটিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন যে, ছন্দের যুক্তবর্ণের যথার্থ ও বিচিত্র ব্যবহারের উদাহরণ দেখালেন তিনি। তাঁর নিজের ও সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথের উপমা' নামক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপমার ব্যবহার বিষয়ে বুদ্ধদেবের মূল্যবান মতামত ও বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। প্রবন্ধটিতে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে 'উপমাশিল্পী' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েছেন —

রবীন্দ্রনাথ উক্তি প্রধান কবি উপমা-প্রধান নন।[১৪০]

অথচ, উপমা ও কবিত্ব যে সহবাসী বুদ্ধদেব সেকথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন। জীবনানন্দ তো উপমাকেই কবিত্ব বলেছেন। ফলে, বুদ্ধদেবের এই মন্তব্য অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি উক্তিপ্রধান কবি বললেন, তা ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। তাছাড়া, বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে 'উক্তি প্রধান কবি' বললেও পরে যখন তিনিই বলেন, তাঁর কবিতায় উপমার রহস্য অফুরাণ এবং সেজন্য অনেক কবিতাই খাঁটি কবিতা হতে পেরেছে, - এ ধরনের বক্তব্যও স্ববিরোধী বলে মনে হয়।

'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রকাব্যের বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে যোগসূত্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, রবীন্দ্রকাব্যের মূল সূত্রগুলির অন্যতম হ'লো প্রেম। 'মানসী' প্রধানতঃ প্রেমের কাব্য। তবে, 'মানসী'তে কবি যার উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করেছেন তিনি

এক অনির্দিষ্ট পরিবর্তনশীল সত্তা।[১৪১]

এখানে কবি নায়ক রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর প্রেমময়ী কল্পনাকে, যিনি কাব্যলক্ষ্মী প্রেয়সী থেকে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। 'সোনার তরী'তে এসে এর মধ্যেই যুক্ত হ'লো নতুন মাত্রা -

মরণ ঃ একটি নতুন তন্ত্রীতে আঘাত লাগলো, একটি নতুন
চরিত্রের আবির্ভাব হ'লো রঙ্গমঞ্চে।[১৪২]

এই রহস্যময়ী প্রেমমীয় নায়িকা কবির চালিকাশক্তি। বুদ্ধদেবের মতে, এরপরে এই নায়ক নায়িকা বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করবে। মোহিনী নারীকে আর দেখা যাবেনা। কবি নিজের উপর -ই আরোপ করবেন নারীত্ব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এর নাম-ই 'জীবন দেবতা'।[১৪৩]

'চিত্রা', পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে - 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' পেরিয়ে এমনকি, 'বলাকা' পর্যন্ত এই দেবতাই রইলেন কবির সহযাত্রী। তবে তিনি আর জীবন দেবতা নন্, বন্ধু, গুরু, পান্থ, প্রিয়তম ইত্যাদি।[১৪৪] বুদ্ধদেব মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের এই জীবন দেবতাই গীতাঞ্জলি পর্বে বিশ্বদেবতার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।[১৪৫]

রবীন্দ্র-কবিতা বিচারে বুদ্ধদেবের মূল জিজ্ঞাসাগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে নিলে দেখি 'কান্তা ও কবিতা' শিরোনামের অধ্যায়ে বুদ্ধদেব প্রস্তুত করেছেন রবীন্দ্রকাব্য সৃষ্টিতে 'নেই' - এর তালিকা। বুদ্ধদেবের ভাষায় -

> তাঁর কবিতায় চলতিকালের জীবন অথবা কথ্য ভাষার আস্বাদন নেই। তাঁর কাব্যের সমগ্র পটভূমি মধ্যযুগ ও পুরাকাল থেকে সংগৃহিতঃ বাঁশি, ধান, পদ্মফুল ... এ ধরনের সামগ্রী তাঁর রচনায় এমন আজগ্র ও পুনরাবৃত্ত যে, একহাজার পংক্তি পড়ে উঠেও এই তথ্যটা 'বোধগম্য' নাও হতে পারে যে, কবির অর্দ্ধেক জীবন বিশ শতকে অতিবাহিত হয়েছিলো, ...।[১৪৬]

বুদ্ধদেব মনে করেন, কিছু গদ্য রচনা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচনায় -

> তাঁর জন্মস্থান ও পৈতৃক বাসভূমি কলকাতা স্থান পায়নি।[১৪৭]

অর্থ্যাৎ, যা কিছু নাগরিক নয়, এমন সব সামগ্রী কবিতায় ব্যবহৃত হ'লেই যদি সেই কবির সমগ্র 'কাব্য-প্রেক্ষাপটকে মধ্যযুগীয় যা পুরাকালের মনে হয়, কবিকেও বলতে হয় আধুনিক নাগরিক নন তিনি। তাহলে অনেক আধুনিক কবি বিশেষতঃ জীবনানন্দের অনেক কাব্য পটই মধ্যযুগীয় আখ্যা পাবে। এবং, জীবনা নন্দকেও আধুনিক নাগরিক কবি বলা যাবে না। কিন্তু, 'রূপসী বাংলা' যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরিবেশকে তিনি মধ্যযুগীয় বলেন নি কখনো।

'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ন অধ্যায় - 'দেবতা ও বধূ'। সেখানে তিনি উন্মোচন করেন রবীন্দ্রকাব্য ধারায় আন্তর্লীন এক নাটককে। এই নাট্যসূত্র আবিষ্কারেও বুদ্ধদেব কিন্তু সীমানা করে নেন 'গীতাঞ্জলি' পর্ব পর্যন্ত। তিনি জানিয়েছেন, নাটকীয় দ্বন্দ্বের সমাধান 'গীতাঞ্জলি'তে যাকে বড় জোর 'গীতালি', 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায় । কারণ, তার মতে, এই তিনটি আসলে একই কাব্য। কিন্তু এর পরেও যে রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্যজগৎ - 'বলাকা' বা 'পূরবী' থেকে শুরু করে একেবারে শেষপর্যায়ের কাব্য ধারা পর্যন্ত ; রবীন্দ্রকাব্যের অন্তর্নাট্য সম্পর্কে বুদ্ধদেব এখানে একেবারে নীরব।

'গীতাঞ্জলি'র সবগুলি রচনাকে বুদ্ধদেব পরস্পরের সম্পৃক্ত ও একই প্রেরণাও মনোভাব সঞ্জাত মনে করেন।[১৪৮] একই প্রেরণা ও মনোভাব থেকে লেখা বলেই 'গীতাঞ্জলি'র রচনা গুলিকে নানা পর্যায়ে বিভক্ত করাকে অসংগতিপূর্ণ বলে মনে করেন বুদ্ধদেব।[১৪৯] অর্থ্যাৎ, রবীন্দ্র সৃষ্টিকে তিনি টুকরো করে দেখতে চান না, দেখতে চান সমগ্ররূপে। আর এই সমগ্ররূপে দেখতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্র সৃষ্টির মধ্যে আবিষ্কার করেন এক অন্তর্গূঢ় যোগসূত্র, এক অন্তর্লীন নাটক। 'কান্তা ও কবিতা', 'দেবতা ও বধূ', 'এপার ওপার' ইত্যাদি শিরোনামের অধ্যায়গুলিতে তিনি এই নাট্যরূপ উদঘাটন করতে চেয়েছেন। কবি নায়করূপে তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে নানারূপে পর্যবেক্ষণ করার পর দেখা যাবে

> এই বণিতা ও কবিতা, এই মানস সুন্দরী ওবিদেশিনী - সব এক পুরুষ দেবতার মধ্যে লীন হয়ে যাবে।[১৫০]

এখানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে অজিত চক্রবর্ত্তীর বক্তব্যের প্রভেদ সামান্য।[১৫১] বুদ্ধদেব নিজেও জানিয়েছেন যে, পূর্বসূরী সমালোচকের পথ ধরেই তিনি আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে চেয়েছেন মাত্র। আর, জীবনদেবতার এই পুরুষমূর্ত্তি আবিস্কার বুদ্ধদেবের একান্ত নিজস্ব। বুদ্ধদেব জীবন দেবতার এই অন্তর্নাট্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করলেও প্রশ্ন দেখা দেয় তাঁর এই সমগ্র দর্শনে। কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের সূচনায় তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন যে, রবীন্দ্রসৃষ্টির এই আলোচনায় তাঁর কোনো একটি বিশেষ পর্যায়ে নিজেকে তিনি আবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের অন্তর্গত যোগ সূত্রটিকে। তাঁর মনে হয়েছে, প্রেম, বিরহ, পুনর্মিলনের নাট্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে রবীন্দ্র-কাব্য গুচ্ছ। যার নান্দীপাঠ 'সন্ধ্যাসঙ্গী'তে, যবানিকা উত্তোলন 'মানসী'তে, দ্বন্দ্বের সমাধান 'গীতাঞ্জলি'তে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'গীতাঞ্জলি' - কবি রবীন্দ্রনাথের এই মধ্যজীবন পর্যন্ত যদি বুদ্ধদেবের আলোচনার পরিধি হয়, তাহলে, এই প্রশ্ন সংগত হয়ে পড়ে যে,

> সত্যি সত্যি কি বুদ্ধদেব সমগ্ররূপে দেখতে চান রবীন্দ্রনাথ কে ?[১৫২]

কবি রবীন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্র-বিষয়ক তাঁর অন্যান্য আলোচনা থেকে এই রকম একটা জিজ্ঞাসাই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'কবিতার সাতসিঁড়ি' অধ্যায়ের আলোচনা থেকেও একথাই মনে হয় যে বুদ্ধদেব কেবলই টুকরো করে দেখতে চাইছেন রবীন্দ্র-সৃষ্টিকে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিসত্তাকে এমনকি শব্দে শব্দে যে ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন কবি, তাকেও কখনো অতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করে সুন্দর ছবিটিকেই ছিন্ন-ভিন্ন করেছেন। 'কবিতার সাত সিঁড়ি' অধ্যায়ে 'সোনারতরী' কবিতার দুটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' - এখানে শুধু মিলের জন্যেই
> ভরসাহীন হতে হ'লো ; আর তৃতীয় স্তবকে 'ঢেউগুলি' যে
> 'নিরুপায়' তারও অন্য কোনো কারন নেই।[১৫৩]

শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন —

> ঢেউগুলি নিরুপায় / ভাঙে দুধারে - এই সহজ এবং সুন্দর ছবিটিতে
> তত্ত্ব খুঁজতে না গেলে অসম্ভাব্যতা কিছু চোখে পড়ে না, বোঝা যায়
> না কেন একজন সমালোচক ভাববেন কেবল মিলের কারনেই
> 'নিরুপায়' শব্দটির ব্যবহার।[১৫৪]

আবার তিনি লিখেছেন

> প্রথম স্তবকের 'নাহি ভরসা' এবং অন্তিম স্তবকের 'শূন্য নদীর
> তীরে রহিনু পড়ি' উচ্চারণের সঙ্গে ... তৈরি হয় আদ্যন্ত এক
> সংগতি। কবিতাটিকে এই সমগ্ররূপে কি দেখতে চাননি
> বুদ্ধদেব ?[১৫৫]

তাছাড়া, 'কবিতার সাতসিড়ি' তে রবীন্দ্র কবিতার নানাস্তর আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে ভাবে রবীন্দ্রনাথের

উৎকৃষ্ট কবিতা নির্দেশ করে দেন, তার মধ্যেও কবির সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্গত কোনো সুস্পষ্ট পরিণতির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

কবি রবীন্দ্রনাথকে সমগ্ররূপে দেখার আর একটি অন্তরায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে যখন বুদ্ধদেব তাঁকে বিশ্বের পটে উপস্থাপিত করেন। তখনও দেখা যায় সমালোচক তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র সৃষ্টিকে যে ভাবে দেখাতে চান, তাতে অনেক সময়-ই রবীন্দ্রকাব্যের সমগ্ররূপের বদলে বিচ্ছিন্ন কিছু অংশকে তিনি তুলে ধরেন। শঙ্খঘোষও তাঁর 'ছন্দোময় জীবন' -এ এই বিষয়টির উল্লেখ করেই জানিয়েছেন —

> রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের এবং জটিল জীবনের পুরো চেহারার
> পট তিনি ব্যবহার করছেন না, নির্বাচন করে নিচ্ছেন মানসকতার
> কয়েকটি আপাত - বিযুক্ত অংশ।[১৫৬]

'কান্তা ও কবিতা' নামক প্রবন্ধে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট কাব্যের পটভূমিকে যে পুরাকালের ও মধ্যযুগীয় বলে উল্লেখ করেছেন - তাও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যপটে নেই, তা তাঁর শেষ পর্বের কবিতা-গ্রন্থের প্রতি মনোযোগী হলেই চোখে পড়বে। মনে হয়, বুদ্দদেব যেন তাঁর আলোচনার সীমা করে নিয়েছেন রবীন্দ্র কাব্যের একটা পর্ব পর্যন্তই, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য ধারা তাঁর বিবেচ্য নয়।

বুদ্ধদেবের 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ শেষ হয়েছিল 'গীতাঞ্জলি' পর্বে এসে। সেই পর্যন্ত রচনাগুলিতে তিনি দেখেছিলেন এক সংহত সম্পৃক্তি। কিন্তু তাঁর এই রবীন্দ্র-দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিলো পাঠক মহলে। পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্য সেই সংহতিসূত্রে গ্রাহ্য হয়েছে কি-না ? 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, প্রায় ধারাবাহিক ভাবে তার আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে

> শুধু আলোচনাই নয়, বাংলা কবিতার আধুনিকতা কোথায় রবীন্দ্রিকতা
> থেকে অপসৃত হচ্ছে, কোথায় বা তা ঋদ্ধ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথেরই
> উত্তরসাধনায় - সে কথাও ধরা পড়েছে বুদ্ধদেবের এই আলোচনার
> সূত্রে।[১৫৭]

শেষ পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনার বুদ্ধদেব মূলতঃ গুরূত্ব দিয়েছেন কবিতা গুলির আধুনিকতার উপর। অন্যদিকে, গুরুত্ব পেয়েছে আঙ্গিকের আলোচনা। একহিসেবে দেখতে গেলে তাঁর রবীন্দ্র সমালোচনায় আঙ্গিকগত আলোচনাই প্রধান।

'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সমালোচনা' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> যে লেখা রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেবে, তাঁর বই পড়ে যা পাওয়া
> যায়, তার উপরেও আরো কিছু যোগ করবে, সেরকম সমালোচনায়
> সিদ্ধি বড় দুরূহ।[১৫৮]

রবীন্দ্রসমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেব নিজে সেই চেষ্টাই করেছেন । কবি, কথাশিল্পী, গদ্যশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে

চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন, তাঁর কাব্যশিল্পের মধ্যে এক অন্তনাট্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন যা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ধারার বৈচিত্র্যের মধ্যে, যোগসূত্র স্বরূপ। এসব ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি প্রশ্নাতীত নয়। কবি ও কথাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি আধুনিকতার যে তত্ত্ব, সূত্র গুলি খুঁজে নিতে চেয়েছেন, সেক্ষেত্রেও ততটা সার্থক তিনি হতে পারেননি, যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্যভাবে নাট্যসূত্র আবিষ্কার করলেও তাঁর এই রবীন্দ্রদর্শন সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যকে চিনিয়ে দিতেও সাহায্য করেনা। তাছাড়া, 'ছিন্নপত্রে' বা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেছেন, বুদ্ধদেবের মতে, রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশি জানবার জন্য সমালোচকের দ্বারস্থ না হয়ে বরং বেশি করে রবীন্দ্রনাথ পড়াই প্রকৃষ্ট উপায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, চেতনা ও রচনার সঙ্গে আমাদের উপলব্ধির সেতু রচনাও করে তাঁর নিজেরই রচনা। তাই বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> তাঁর আপন ভাষ্যের সীমানার বাইরে তাঁকে দেখতে পাওয়া
> আজ পর্যন্ত সহজ হয়নি।[১৫৯]

এটিও রবীন্দ্রসমালোচনা লেখার অন্তরায় বলে তিনি মনে করেন। এভাবে দেখলে অবশ্য, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় থেকে অজিত চক্রবর্তী, প্রমাথ নাথ বিশীর রবীন্দ্র-দর্শন সম্পর্কেও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। বুদ্ধদেব মনে করেন, তাঁদের রবীন্দ্র-প্রীতি তাঁদের পরিশ্রমকে সার্থক করেছেন। তাহলেও,

> আদর্শের যে পূর্বপ্রস্তুত স্বকীয়তায় সমালোচনা মেরুদণ্ড পায়, যার
> জোরে নিজের পায়ে সে দাঁড়াতে পারে, তারই অভাব আমাদের
> রবিচর্চার প্রায় সামান্য লক্ষণ।[১৬০]

বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে, সমালোচনার যে আদর্শ সামনে রেখে সমালোচক সমালোচনা করেন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটি নির্ণয় করাও কঠিন। কেননা,

> সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে আধুনিক মনের থই মেলেনা, স্বদেশী
> ঐতিহ্যে তুল্য কোনো কবি নেই, আবার, পশ্চিমী আদর্শ প্রয়োগ
> করতে গেলেও ভুল হবে। যদিও এই বিশ্ব মানবের আলোচনায়
> বিশ্ববোধ অপরিহার্য প্রয়োজন।[১৬১]

বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে চেয়েছেন মূলতঃ আধুনিক কবি হিসেবেই। 'কবিতা' পত্রিকায়

> ব্যাপক রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে হয়তো আধুনিকতারই পথ খুঁজে
> নিতে চাইছিলেন বুদ্ধদেব।[১৬২]

রবীন্দ্র বিরোধিতায় তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন বার বার। কিন্তু, তাঁর মতো আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে আর কেউ এভাবে রবীন্দ্ররচনার অবিরল সমালোচনা লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেন নি।

> রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়, তাঁকে সামনে রেখেই
> সে আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এ মূল সত্যটি
> বুদ্ধদেবই প্রথম বুঝেছিলেন।[১৬৩]

তাই, কথাসাহিত্যিক ও কবি রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা সমালোচনা করে তিনি আধুনিকতার দর্শন ও সূত্রগুলিই খুঁজে নিতে চেয়েছেন। আধুনিক বাংলা কবিতা কোথায় রাবীন্দ্রিকতা থেকে দূরে সরে আত্ম আবিস্কারে সচেষ্ট হয়েছে - এই সবই বুদ্ধদেবের রবীন্দ্র দর্শনে প্রতিপাদ্য হয়েছে। 'গোরা', 'চার অধ্যায়', 'ঘরে-বাইরে' আর 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা তাঁর আগ্রহের বিষয়। কিন্তু, 'চোখের বালি'তে শাস্ত্রগত নীতিবচনের কাছে আত্মসমর্পনকারী রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিতে পারেননি বুদ্ধদেব আর, কবিতায়, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলিতে তিনি দেখেছেন আধুনিকতারই বিচিত্র রূপায়ণ।

বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্র-সাহিত্য বিচার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, তাঁর রবীন্দ্র-দর্শণ কোনো প্রথাগত নীতি মেনে চলে না। তিনি কখনোই রবীন্দ্র-সাহিত্যের উপর কোনো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, বা দার্শনিক তত্ত্ব আরোপ করেন নি। একজন আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানার ও রবীন্দ্র সাহিত্যকে বোঝার চেষ্টা করেছেন মাত্র। তাঁর রবীন্দ্র-দর্শণ তাই পাঠ্য বইয়ের বাঁধাগুলি নয়, সমালোচকের অ্যাকাডেমিক তত্ত্বকথাও নয়। তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ একান্তই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, নিজের ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে নিয়ে। তাই, শিল্প-বিচারে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী বুদ্ধদেবের পছন্দ রবীন্দ্র সাহিত্যজগতের সেই অংশগুলি, যেখানে রবীন্দ্র গীতিকবিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। আত্মভাব প্রধান রোমান্টিক কবিমনটি সেখানে তাঁর সবটুকু রঙ, সবটুকু উত্তাপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

নির্দেশিকা

১। Eliot, T. S. To criticize the critic Faber & Faber, London, Boston, 1965, Page- 26

২। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭, পৃঃ ৩

৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্য চর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১১৮

৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', ২২শে শ্রাবণ, কলকাতা, কবিতা ভবন, আগষ্ট ১৯৪২, পৃঃ ৪

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর রবীন্দ্র দৃষ্টি', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল - জুন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫০

৬। তদেব, পৃঃ ১৫০

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গান ভঙ্গ', কথা ও কাহিনী

৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা', সাহিত্য চর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৫৪, পৃঃ ১৩২

৯। তদেব, পৃঃ ১৩২

১০। তদেব, পৃঃ ১৩২

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা, 'সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর রবীন্দ্র দৃষ্টি', সাহিত্য ও সংস্কৃতি, এপ্রিল - জুন, ১৯৭৭, পৃঃ ১৫০

১২। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬

১৩। তদেব, ভূমিকা

১৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংকরণ, ১৩৮৪

১৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র - রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, সমালোচনা, 'কবিতা',আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬২

১৬। তদেব, পৃঃ ৬২

১৭। তদেব, পৃঃ ৬৩

১৮। তদেব, পৃঃ ৬২

১৯। তদেব, পৃঃ ৬৩

২০। তদেব, পৃঃ ৬৩

২১। তদেব, পৃঃ ৬৪

২২। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের চিঠি বুদ্ধদেব বসুকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৫৯৯

২৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, সমালোচনা, 'কবিতা' (সম্পাদিত), বুদ্ধদেব বসু, আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫০

২৪। তদেব, পৃঃ ৫১

২৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২-য় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৯

২৬। তদেব, পৃঃ ৫৯

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডসমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬০

২৮। তদেব, পৃঃ ৬০

২৯। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২৭

৩০। তদেব, পৃঃ ২৭

৩১। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদনা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬১

৩২। তদেব, পৃঃ ৬১

৩৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২৯

৩৪। তদেব, পৃঃ ২৯-৩০

৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৬৬

৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪-র্থ খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৩১

৩৭। তদেব, পৃঃ ৩৩

৩৮। তদেব, পৃঃ ৩৩

৩৯। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪০। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪১। তদেব, পৃঃ ৩৫

৪২। বসু, বুদ্ধদেব, 'নতুন বই' শিরোনামে রবীন্দ্র নাথের 'ছেলেবেলা'র সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫৭

৪৩। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৪। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৫। তদেব, পৃঃ ৫৫

৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০, পৃঃ ২৩৮

৪৭। তদেব, পৃঃ ২৩৮

৪৮। তদেব, পৃঃ ২৩৯

৪৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'চিঠিপত্র' ৫ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৯ - আষাঢ় ১৩৫০, পৃঃ ২৫৯

৫০। বসু, বুদ্ধদেব, চিঠিপত্র ৬ষ্ঠখন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), বর্ষ-২২, সংখ্যা-১, পৃঃ ৬৬

৫১। তদেব, পৃঃ ৬৭

৫২। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১৫

৫৩। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৪। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৫। তদেব, পৃঃ ১৩

৫৬। তদেব, পৃঃ ১৬

৫৭। তদেব, পৃঃ ১৪

৫৮। তদেব, পৃঃ ১৪

৫৯। তদেব, পৃঃ ১৪

৬০। বসু, বুদ্ধদেব, ১৮.০৩.৭২, কনিষ্ঠ কন্যাকে পত্র, দেশ, ২৯শে জুলাই, ১৯৮৯

৬১। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৬৬

৬২। তদেব, পৃঃ ৭৪

৬৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮০

৬৪। তদেব, পৃঃ ৮০

৬৫। তদেব, পৃঃ ৮৪

৬৬। তদেব, পৃঃ ৮৫

৬৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮৬

৬৮। তদেব, পৃঃ ৮৬

৬৯। তদেব, পৃঃ ৮৬

৭০। তদেব, পৃঃ ৮৭

৭১। বসু, বুদ্ধদেব, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৮৮

৭২। তদেব, পৃঃ ৮৯

৭৩। তদেব, পৃঃ ৯০

৭৪। তদেব, পৃঃ ৯০

৭৫। তদেব, পৃঃ ৯১

৭৬। তদেব, পৃঃ ৯৫

৭৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'শেষের কবিতা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ৯৫

৭৮। তদেব, পৃঃ ৯৮

৭৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'দুইবোন ও মালঞ্চ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১০১

৮০। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮১। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮২। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮৩। তদেব, পৃঃ ১০৩

৮৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১০৭

৮৫। তদেব, পৃঃ ১১১

৮৬। তদেব, পৃঃ ১১০

৮৭। তদেব, পৃঃ ১১০

৮৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'চার অধ্যায়', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ১১৪

৮৯। তদেব, পৃঃ ১১৮

৯০। তদেব, পৃঃ ১২০

৯১। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫, পৃঃ ২৬

৯২। তদেব, পৃঃ ২৮

৯৩। তদেব, পৃঃ ৩৬

৯৪। তদেব, পৃঃ ৩৬

৯৫। তদেব, পৃঃ ৩৮

৯৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছে চিরন্তনের পটভুমি', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৪০

৯৭। তদেব, পৃঃ ৪২

৯৮। তদেব, পৃঃ ৪৪

৯৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছ কি গীত ধর্মী?', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, পৃঃ ৪৫

১০০। তদেব, পৃঃ ৪৫

১০১। তদেব, পৃঃ ৪৫

১০২। তদেব, পৃঃ ৪৬

১০৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি ', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ৪৭

১০৪। তদেব, পৃঃ ৫১

১০৫। তদেব, পৃঃ ৫১

১০৬। তদেব, পৃঃ ৫৮

১০৭। তদেব, পৃঃ ৫৯

১০৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'কাহিনী ও রচনা', রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃঃ ২৩

১০৯। তদেব, পৃঃ ২৩

১১০। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্য শিল্প', সঙ্গ ঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১০৫

১১১। তদেব, পৃঃ ১০৬

১১২। তদেব, পৃঃ ১০৫

১১৩। তদেব, পৃঃ ১০৫-১০৬

১১৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৪

১১৫। তদেব, পৃঃ ৫৫

১১৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২-য় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৬-৫৭

১১৭। তদেব, পৃঃ ৫৭

১১৮। তদেব, পৃঃ ৫৭

১১৯। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ডের সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৫৭

১২০। তদেব, পৃঃ ৫৫

১২১। তদেব, পৃঃ ৫৮

১২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভুমিকা, 'চিত্রা'

১২৩। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন

১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ২১

১২৪। তদেব, পৃঃ ২১

১২৫। তদেব, পৃঃ ২১

১২৬। তদেব, পৃঃ ২২

১২৭। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খন্ড সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৭ - আষাঢ় ১৩৪৮, পৃঃ ৫০

১২৮। ভট্টাচার্য, গৌতম, 'কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ১৩৯২, পৃঃ ৩০

১২৯। তদেব, পৃঃ ৪০

১৩০। তদেব, পৃঃ ৪২

১৩১। বসু, বুদ্ধদেব, 'নবজাতক পুস্তক সমালোচনা', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৪

১৩২। তদেব, পৃঃ ৪৪

১৩৩। তদেব, পৃঃ ৪৫

১৩৪। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের 'নতুন কবিতা', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), রবীন্দ্র সংখ্যা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৮, পৃঃ ১০৪

১৩৫। তদেব, পৃঃ ১০৭

১৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, রবীন্দ্রনাথের 'শেষ লেখা'র সমালোচনা, 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা), আশ্বিন ১৩৪৮ - আষাঢ় ১৩৪৯, পৃঃ ৩৭

১৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১ম প্রকাশ, মে ১৯৫৫

১৩৮। ১৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গঃ মানসী, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলকতা, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ১৭৮

১৩৯। ঘোষ, , শঙ্খ 'বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ' বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (স ম্পা), কলিকাতা বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৬৩

১৪০। বসু, বদ্ধদেব, সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ১৯৭

১৪১। বসু, বুদ্ধদেব, ' কান্তা ও কবিতা ', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ৩৩

১৪২। তদেব, পৃঃ ৪১.

১৪৩। তদেব, পৃঃ ৫২

১৪৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'দেবতা ও বধূ', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৬২

১৪৫। তদেব, পৃঃ ৭০

১৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'কান্তা ও কবিতা', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ২৯

১৪৭। তদেব, পৃঃ ২৯

১৪৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'এপার - ওপার', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬, পৃঃ ৭১

১৪৯। তদেব, পৃঃ ৭৯

১৫০। বসু ,বুদ্ধদেব,'কান্তা ও কবিতা', কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬ পৃঃ ৫২

১৫১। ভট্টাচার্য, সুতপা, কবির চোখে কবি, কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭, পৃ ৮১

১৫২। ঘোষ, শঙ্খ, 'টুকরো থেকে সমগ্রে', ছন্দোময় জীবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা বৈশাখ, ১৪০০ পৃঃ ১০৮

১৫৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'কবিতার সাত সিঁড়ি' কবি রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, জুন ১৯৬৬ পৃঃ ১৮

১৫৪। ঘোষ, শঙ্খ, ছন্দোময় জীবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা বৈশাখ, ১৪০০, পৃঃ ১০৯

১৫৫। তদেব পৃঃ ১০৯

১৫৬। তদেব পৃঃ ১০৮

১৫৭। ভট্টাচার্য, গৌতম ' কবিতা' য় রবীন্দ্রনাথ, প্যাপিরাস-১ম সংস্করণ ১৩৯২ পৃঃ ২৯

১৫৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সমালোচনা', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫৪

১৫৯। তদেব, পৃঃ ১৩১

১৬০। তদেব, পৃঃ ১৩২

১৬১। তদেব, পৃঃ১৩৩

১৬২। ভট্টাচার্য, গৌতম, 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও আধুনিকতার সূত্র' ,'কবিতা'য় রবীন্দ্র নাথ, প্যাপিরাস, ১ম সংস্করণ ১৩৯২, পৃঃ ১

১৬৩। তদেব, পৃঃ১

ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধদেব-ই প্রথম আন্তর্জাতিক কাব্য-কবিতার দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মোহনীয় রোমান্টিক কাব্য-সম্ভার আধুনিকদের সামনে থাকার ফলে তাঁদের নিজেদের কাব্যপ্রবাহ অন্য খাতে বইয়ে দেবার প্রয়োজন প্রথম থেকেই তাঁরা অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও কাব্যদর্শের বাইরে গিয়ে আধুনিকরা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। যে প্রাত্যাহিক জীবনের গ্লানি, সময়ের নিয়ত অবক্ষয় বাস্তব ও আদর্শের যে আবহমান দ্বন্দ্ব আধুনিক মানুষকে বিহ্বল করছিলো, সেই মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের খোরাক রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাননি। অথচ রবীন্দ্রনাথেই তাঁরা খোঁজেন কল্পলোকের মুক্তি। বুদ্ধদেবের নিজের সাক্ষ - সারাদিন নানা তর্কে-বিতর্কে বরীন্দ্র-কবিতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন ও নস্যাৎ করেছেন তাঁর কাব্য ও কাব্যাদর্শকে। অন্যদিক, রাত্রে বাড়িতে ফিরে সারাদিনের চিত্ত-মালিন্য যাতে ধুয়ে-মুছে যায়, সেজন্য মুগ্ধবৎ তিনি আবৃত্তি করেছেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতা। এই যে ভিতর ও বাইরের দ্বন্দ্ব, এই যে প্রবহমাণ পৃথিবী ও রবীন্দ্রকাব্যের স্থির সৌন্দর্যের দ্বিরালোক - এরই মধ্যে হয়তো নিহিত আছে বুদ্ধদেবের কাব্য-সমালোচনার একটি সূত্র। বুদ্ধদেব আজীবন সন্দেহাতীতভাবে রবীন্দ্রকাব্যে নিমগ্ন। আবার, এই মগ্নতার বাইরে তিনি সন্ধান করেন নবীন কাব্যাদর্শ, নিজের স্বাতন্ত্র্য ধর্ম বজায় রাখবার নতুন সূত্র।

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নতুনদের বিদ্রোহ কাব্য-সাহিত্যে অভিনব নয়। প্রবীণদের বিরুদ্ধে এরকম বিদ্রোহ করেই নতুনদের আসতে হয়। এই সূত্রে মোহিতলালকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'আধুনিকোত্তম'। কেননা, রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মায়া থেকে মোহিতলালের দেহাত্মবাদের সিঁড়ি দিয়েই তাঁদের আধুনিকতাবাদে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছিল। অথচ, মোহিতলাল, নজরুল কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত - এঁদের রচনায়ও সেই উন্মুক্ত অবসর খুঁজে পাওয়া গেল না যেখানে আধুনিক কবিরা কবিতার বিশুদ্ধ ভুবন রচনা করতে পারেন। মোহিতলালের দেহচেতনা ও ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, নজরুলের রোমান্টিক ভাব-বিদ্রোহ ও উচ্চরোল, যতীন্দ্রনাথের ভাব-নৈরাশ্য - এ সমস্তই আধুনিকতার ইন্ধন হিসেবে কাজ করেছে নিশ্চয়। কিন্তু, এসবের মধ্যে কোনো একটি সমগ্র কাব্য - বিশ্ব রচনার যাবতীয় উপাদান যেন ছিলোইনা। এজন্যই অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) কাব্যের ভাবপরিমন্ডল বিস্তারের প্রয়োজনে কাব্যের বিশ্বলোক অনুসন্ধান করে ঘুরতে হ'লো বুদ্ধদেবকে।

এমন নয় যে, তাঁর আগে এসব কাজ হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ছিলেন ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যে যথেষ্ট আগ্রহী। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বহু পাশ্চত্ত্য কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। মোহিতলাল বহু পাশ্চত্ত্য কাব্য-তাত্ত্বিকের সাহিত্যতত্ত্ব বাংলায় এনেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে যাকে বলেছিলেন 'পাশ্চত্ত্য চিত্তের অভিঘাতে প্রাচ্য চিত্তের জাগরণ' তা কিন্তু এসব কবিতায় হয়নি। আজীবন য়ুরোপীয় কাব্য-কবিতার প্রতি অনুরক্ত থেকেও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি মোহিতলালের অত্যানুরাগ শেষ জীবনে প্রায় একটা passion -এর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর, ক্রমাগত সবকিছুর উপর সমালোচনার প্রবল

আক্রমণের ফলে তিনি নিজেও যেন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। মোহিতলালের উপরে আধুনিকরাও আস্থাহীন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষতঃ আধুনিকতার প্রতি তাঁর কটু সমালোচনায়। আর, লক্ষ্যকরলে দেখা যায়, তখন রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ প্রায় উপচ্ছায়ার মতো ছিলেন। তাঁদের নিজেদের অবস্থান রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তাঁরা নিজেরা কোনো কাব্যবংশ সৃষ্টি করতে পারেননি। এমনকি, নজরুল বা মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথও নয়। অন্যপক্ষে, 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, 'পরিচয়' এর সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে - এঁরা সকলেই বাংলা কবিতায় আধুনিক ধারার প্রবর্তক। সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে — এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার পোষক। বুদ্ধদেব ছিলেন এই আধুনিকতা আন্দোলনের পুরোধা। এবং এই আধুনিক কবিতা-প্রবাহই পরবর্তীকালে বলবত্তর হয়েছে।

বুদ্ধদেব কোথা থেকে এই নতুন কবিতার আদর্শ পেয়েছিলেন? হয়তো এজন্যই তাঁকে চোখ ফেরাতে হচ্ছে পশ্চিমের নতুন কাব্যতত্ত্বের দিকে। এমন নয় যে, বোদলেয়ার ছিলেন বুদ্ধদেবের পক্ষে সাম্প্রতিক বা সমসাময়িক। তাঁর অনুবাদের প্রায় একশ বছর আগে বোদলেয়ার-এর মৃত্যু (১৮৬৭) হয়েছে। কিন্তু বাংলা কবিতার রোমান্টিক আবহ থেকে সরে গিয়ে অথচ সম্পূর্ণতঃ রোমান্টিকতা বর্জন না করেও বোদলেয়ারের কবিতায় পাওয়া যায় নতুন একটি কাব্যাদর্শ। কেননা, বুদ্ধদেব নিজেই বলেন রোমান্টিক আর ক্লাসিক দুয়ের মধ্যে প্রকৃতই যে কোনো অমিল নেই, বোদলেয়ারের কাব্যপাঠেই তা বোঝা যায়। বুদ্ধদেবের মনের ভিতরে যে একজন বিশুদ্ধ শিল্পপ্রাণ রোমান্টিক কবিসত্তা ছিলো তার-ই একরকম প্রকাশ দেখি হোল্ডার্লিন, রিল্‌কের মতো কবির অনুবাদ ও প্রচারে। আসলে, বাংলা কবিতায় যে শুদ্ধ কাব্যতত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে বুদ্ধদেব আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, সেই কাব্যাদর্শ রিল্কে বা হোল্ডার্লিনের আত্মমগ্ন কবিতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন। সুতরাং রিল্কে, হোল্ডার্লিন বা বোদলেয়ার অনুবাদে তিনি যেন খুঁজে পাচ্ছেন তার অন্তর্মনের আততিকে। তা দিয়ে তদানীন্তন বহির্বিশ্বকেও প্রকটিত করা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে 'কবিতা' পত্রিকায় ইউরোপীয় কবি ও কবিতা বিষয়ক কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধদেবের। 'কবিতা' র পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (আশ্বিন-পৌষ, ১৩৫৬, ক্রমিক সংখ্যা -৬৩) সম্পাদকীয় বক্তব্যে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> 'কবিতা' র সংখ্যা আরম্ভ হলো সেই মহাকবির, মহামানবের
> আলোচনায়, যাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী ১৯৪১-এ বিশ্বসাহিত্যের
> বড়ো ঘটনা। এ উপলক্ষে ইংলন্ডে আমেরিকায় এত নতুন আলোচনা
> হয়েছে, নতুন অনুবাদও এত বেরিয়েছে, বেরোচ্ছে, যে গ্যাটে
> আধুনিক মানুষের মনে নতুন করে জন্মালেন বলা যায়। যুদ্ধের পরে
> এমন শুভ ঘটনা আর ঘটেনি। .... অবসাদপ্রাপ্ত বাংলা সাহিত্যে
> তাঁর ভাস্বর কবিসত্তাকে আমরা আহ্বান করি।[১]

হোল্ডার্লিনের কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন —

'গত চল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য
পাশ্চত্ত্য সাহিত্যের চর্চা যদিও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সুধীন্দ্রনাথ
তাঁর সংবর্তের একটি পংক্তিতে 'গ্যাটে, হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, টমাস
মান্'কে বাঙালির পক্ষে স্মরণীয় করেছেন, তবু, আমার ধারনা,
আমাদের এই সাংস্কৃতিক দৈণ্যময় মফস্বলে হোল্ডর্লিন এখনো
শিক্ষিত বা সাহিত্যিক মহলেও প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত।[২]

এই গ্রন্থেই 'অনুবাদকের বক্তব্য' অংশে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ জানাই, তাঁরা যেন বইখানাকে
'হ্যেল্ডার্লিন প্রবেশিকা' হিশেবে গ্রহন করেন, ... অর্থাৎ আমাদের
দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের প্রাথমিক
পরিচয় ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।[৩]

'রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা' অনুবাদের ভূমিকায়ও বুদ্ধদেব লিখেছেন —

আমি চেষ্টা করেছি স্বল্প পরিসরের মধ্যে রিলকের বিবর্তনের
রেখাচিত্র আঁকতে .... যাতে মহত্তম রিলকের সঙ্গে পাঠকের
পরিচয় কিছুটা নিবিড় হ'তে পারে।[৪]

বুদ্ধদেব এভাবেই ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। নিজে পাশ্চত্ত্য কবি ও কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন। ইংরেজি, ফরাশি, জার্মান ভাষা তিনি শিখে নিয়েছিলেন। ফলে, বিদেশি সাহিত্যের মূলগ্রন্থ তিনি পাঠ করতে পারতেন। আর, সেই সাহিত্যরস থেকে সাধারণ পাঠকও যাতে বঞ্চিত না হয়, এজন্যে তিনি এসব কবিতার অনুবাদ করেছেন, ইউরোপীয় কবি ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে সে সম্পর্কে একটা ধারনা প্রচার করতে চেয়েছেন। 'কবিতা'য় ইউরোপীয় কবির কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর সেই অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'কবিতা'র বিভিন্ন সংখ্যায় এসময় বাঙালি বুদ্ধিজীবী অনেকেরই এই ইউরোপীয় সাহিত্য-প্রীতি লক্ষ্য করা গেছে। ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা করে বুদ্ধদেব আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে সমকালীন বাংলা কবিতাকে দেখতে চেয়েছেন। এক হিসেবে, আধুনিক কবিতার নানা সূত্র তিনি খুঁজে নিতে চেয়েছেন গোটা ইউরোপের কবিতা থেকে। এগুলি এমনভাবে সমন্বিত করতে চেয়েছেন, যাতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে একটা সমগ্র ধারনা গড়ে তোলা যায়। ইউরোপীয় কবিতার দর্শন তুলে ধরে বাংলা কবিতার মোড় ফেরাকে তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বিশ্বযুদ্ধ -পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারা বদলকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপট থেকে।

বুদ্ধদেব-কৃত ইউরোপীয় কবি ও কবিতার সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হলো —

(ক) 'শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৬১)

(খ) 'রাইনের মারিয়া রিল্কের কবিতা' - অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৭০)

(গ) 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা' - অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা (প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৬৭)

'হাউই' নামে অসকার ওয়াইল্ডের গল্প অনুবাদের ভূমিকা (১৩৫১ সালে লেখা), বরিস পাস্তেরনাকের অনুবাদ গ্রন্থ 'ড. জিভাগো'র ভূমিকাটিও ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ থেকেই বুদ্ধদেব লিখেছেন। ১৯৫৮ সালে পাস্তেরনাক ড. জিভাগো উপন্যাসের জন্য সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওই উপন্যাসে গ্রথিত জিভাগো কবিতাগুচ্ছ অনুবাদ করলেন বুদ্ধদেব বসু। ড. জিভাগো উপন্যাসের একটি বাংলা অনুবাদে তারা স্থান পেল। অনুবাদটি অবশ্য বুদ্ধদেবের নয়

> বস্তুত পাস্তেরনাকের প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতায় অগভীর,
> ... বুদ্ধদেবের মধ্যে তাঁর প্রভাব ১৯৫৮ পরবর্তী কবিতায়
> কিছু পড়েছিল।[৫]

। ক ।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে চিরাচরিত ধারনা যে বদলে যাচ্ছে, বুদ্ধদেব এর সূত্র সন্ধান করেছেন বোদলেয়ার-এর কবিতায়। তিনি উদ্ধৃত করেছেন বোদলেয়ার বিষয়ে তরুণ র‍্যাঁবোর উক্তি - 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'[৬]। নিজেই প্রশ্ন করেছেন - প্রথম কেন? 'দ্রষ্টা' - সে তো কবির একটি সনাতন ও সাধারণ অভিধা, আত্মিক দৃষ্টি যাঁর নেই তিনি কি কবি হতে পারেন? তাঁর মনে হয়েছিলো, কল্পনার স্বাধীনতালাভ সত্ত্বেও কবিতা ঠিক সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে পারলোনা। রোমান্টিকেরা মন্ময় ভঙ্গিতে উপদেশ দেন, তাঁদের কবিতা রাখাল, সন্ন্যাসী বা পর্যটকের স্বগতোক্তি।[৭] এরা দ্রষ্টার গুণে দরিদ্র নন, কিন্তু যেহেতু তাঁরা কবিকে ভেবেছিলেন জগতের হিতসাধক, 'অস্বীকৃত বিধানকর্তা', আর, কবিতাকে ভেবেছিলেন আবেগের প্রবহণমাত্র, তাই যা কবিতা নয়, এমন অনেক পদার্থের চাপে তাঁদের দৃষ্টিকণিকা শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হতে পারেনি।[৮] এই শুদ্ধতা ভের্লেন প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন বোদলেয়ারের রচনায়। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' এর রচনারীতিকে তিনি বলেছেন 'অলৌকিক শুদ্ধতাসম্পন্ন।'[৯] র‍্যাঁবো, মালার্মে, ভের্লেন ছাড়াও অন্য অনেক আধুনিক কবি বোদলেয়ারপন্থী হয়ে উঠেছিলেন এইসময়। বোদলেয়ার-এর কাছ থেকেই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, স্বকীয় ও অনন্য দৃষ্টির কাছে একান্ত ও বিনীতভাবে - আত্মসমর্পণ করাই কবির স্বধর্ম। বুঝতে পেরেছিলেন - আত্মার একটি অবস্থার নামই কবিতা। বুদ্ধদেব লিখেছেন যে, ভের্লেন ও মালার্মের পক্ষে এরকম কথা বলা সম্ভব হতোনা, যদি না তাঁরা বোদলেয়ারের পরে জন্মাতেন। বোঝা যায়, বোদলেয়ারের পর থেকে কবিতা সম্পর্কে ধারনাই বদলে গেলো। বদলে গেলো, চিরাচরিত কবিতার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেনী বিভাজন। রোমান্টিকতা সম্পর্কে ধারনা পাল্টে গেলো। ক্লাসিক ও রোমান্টিকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান গেলো ঘুচে। বোদলেয়ার-পূববর্তী অনেক কবির রচনায় আধুনিকতার পূর্বাভাস ছিলো। যেমন, ইংলন্ডের ব্লেক, কীটস, কোলরিজ, জার্মানিতে হ্যেল্ডার্লিন, ফ্রান্সে, গ্যয়টে, আমেরিকার এডগার অ্যালানপো, হুইটম্যান ইত্যাদি। এঁদের আদর্শ বা পরামর্শকে, কোনো-না-কোনো দিকে থেকে, আধুনিক কবিতার প্রকরণে অথবা মর্মস্থলে ফলপ্রসূ হতে দেখেছি আমরা।[১০] কিন্তু, কবিতা বিষয়ে এঁদের চেতনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষীণ অথবা খন্ডিত, কিন্তু বোদলেয়ারের চৈতন্য নিজের বিষয়ে ও কবিতার

বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর। বোদলেয়ারের মধ্যেই বুদ্ধদেব দেখেছেন আধুনিক কবিতার সূত্রপাত। এমনকি, যা-কিছু কবিতা নয়, তা থেকে কবিতা-মুক্তির প্রথম দলিল বলেছেন 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' -এর কবিতাগুচ্ছকে।

কাব্যকলায় বোদলেয়ারের কীর্তির উল্লেখ করে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

১) ক্লাসিক ও রোমান্টিকের চিরাচরিত দ্বৈতকে তিনি লুপ্ত করে দিয়েছেন। প্রথম কবি তিনি, যাঁকে পড়ে উপলব্ধি করি যে, ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ধারনা দুটি অমোঘভাবে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের জন্য তৃষিত এবং একই রচনার মধ্যে দুই ধারার সংশ্লেষ ঘটলে তবেই কবিতায় তীব্রতম মুহূর্তটিকে পাওয়া যায়। ক্লাসিক রীতি সত্ত্বেও তিনি পরম রোমান্টিক।

২) তাঁর রচনায় রোমান্টিকের লাগাম-ছাড়া উচ্ছ্বাস নেই, তেমনি নেই আধুনিক দুর্বোধ্যতা। তাঁর রচনা প্রাঞ্জল, ঘন-গভীর, আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু ইঙ্গিতে দূর প্রসারী। তিনি কবিতাকে করে তুলেছেন যুগপৎ নির্ভর ও ভাবনামগ্ন, গম্ভীর, সহৃদয় ও সুপ্রবেশ্য।

৩) রোমান্টিকদের কবিতা ছিলো কবিত্বমন্ডিত রচনা, যার কোনো কোনো পংক্তি বা অংশ কবিতা হলেও অনেক অংশই কবিতা নয়। কিন্তু বোদলেয়ার কবিতা বলতে বুঝলেন এমন রচনা, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছুই নেই, যার প্রতিটি পংক্তি ও শব্দ, মিল ও অনুপ্রাস, রসের দ্বারা সমগ্র সুপক্ক ফলটির মতো কবিতার দ্বারা আক্রান্ত।

৪) রোমান্টিকদের বিষাদে বিলাসের একটি অংশ আছে, শেলি, বায়রণ, ওঅর্ডস্বার্থ- এঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখের জন্য দায়ী করেছেন অন্য মানুষকে এবং অন্য মানুষের দুঃখের জন্য রাষ্ট্র বা সমাজকে। কিন্তু, বোদলেয়ার সেই রোমান্টিকশ্রেষ্ঠ, যিনি জানেন যে, তাঁর যন্ত্রনার কারণ তিনি নিজেই। দুঃখকে যিনি মানুষের একটি প্রয়োজন বলে অনুভব করেন। আর এটাই রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর মূল পার্থক্য যে মানব-স্বভাব রোমান্টিক মতে সহজাতভাবে শুদ্ধ, তাকে বোদলেয়ার দেখেছিলেন দুর্বারভাবে পাপোন্মুখ বলে।

৫) রোমান্টিকেরা আত্মকরুনা করেন, বোদলেয়ার আত্মপরীক্ষা, তাঁরা দোষ দেন অন্যদের তিনি নিজেকে, তাঁরা চান আদর্শ রাষ্ট্র। আর তিনি চান প্রার্থনার দ্বারা আত্মশোধন।

৬) আদি পাপে বিশ্বাসী বলে তিনি কদর্যতা বা মহিমায় ধনী-দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকার করেছেন, বুঝেছেন - যে শুধু তাই সর্বমানবের সাধারণ সম্পত্তি হ'তে পারে যা, সুরা, স্বপ্ন বা ঈশ্বরের মতো, মানুষকে তার দৈহিক অবরোধ থেকে মুক্তি দেয়।

৭) এবং এই কারণে তাঁর বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায় - শুধু জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি, এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ - যা ব্যাপ্ত হয় অমরত্বে, অন্তহীন যার পরিমাণ।

৮) রোমান্টিক বিষাদে আশা ছিলো, ছিলো কৃতী, যন্ত্র ও উত্তম আইনের দ্বারা প্রনীত স্বর্গরাজ্যের সম্ভাবনা, কবিরা নিজেদের ভাবতে পারতেন - নিষ্পাপ হরিণ ও পৃথিবীকে শ্বাপদ ব'লে। কিন্তু, বোদলেয়ার

যেহেতু নিজেকেই যাবতীয় কার্য ও কারণের উৎস বলে জেনেছেন, তাই তাঁর দুঃখ অনেক বেশী সত্যবাদী এবং দুশ্চিকিৎস্য।

৯) তিনি মানবাত্মাকে বহুস্তর বলে চিনেছিলেন ঃ ব্যাধি ও স্বাস্থ্য, প্রেম ও ঘৃনা, আনন্দ ও আতঙ্ক, দ্রোহ আর আত্মসমর্পন - এই বিরোধী ভাবগুলি তাঁর ধারনায় পরস্পর সংবদ্ধ শুধু নয়, পরস্পরের পরিপূরক। এই বৈপরীত্যবোধ বা বিপরীতের সংযুক্তি বোদলেয়ায়ের কাব্যে অবিরল। বুদ্ধদেব লিখেছেন -স্বর্গে সব বৈপরীত্য অবসিত হয় ব'লে বোদলেয়ারের কাব্যে স্বর্গের উপস্থিতি নেই, নেই, 'গীতাঞ্জলি'র মতো ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের উন্মাদনা। কিন্তু, বোদলেয়ারের কাব্যেই তিনি দেখেছেন - মানুষ অমৃতকে আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সেই অমৃতলোকে সে পৌঁছুতে পারেনা। সকল দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান, সকল বিরোধের যেখানে শান্তি, তা মানুষের অধিগম্য নয়। তাই, বোদলেয়ারে আমরা পাই অলব্ধের জন্য অসহ্য বেদনাবোধ। 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' - এর যে কোনো কবিতা পড়লেই দেখা যাবে এই উচ্চারণ —

আমি বেরিয়েছি অসীমের সন্ধানে - একা আমি গুরু নেই,
নেই কান্ডারী বা উপদেষ্টা, পাল পর্যন্ত নেই আমার তরীতে।[১১]

- এই অসহায় কাতরতা, এই অজ্ঞাতপূর্ব রোমাঞ্চকর যাত্রাপথ এবং তার জন্য আপনমনে যন্ত্রনার উপলব্ধি রোমান্টিকতার মর্মকথা। বুদ্ধদেবের মতে, এর উচ্চারণ 'ফ্ল্যর দ্যু মাল' এ যেমন শুদ্ধ, সংহত ও নির্ভীক, পূর্ববর্তী চিহ্নিত রোমান্টিকদের কারো কাব্যেই সে-রকম নয়।

১০) রোমান্টিক কবি দূর-প্রেমিক। অজানা, অসীম অপ্রাপনীয়ের আকাঙ্ক্ষায় তারা নিরন্তর ধাবিত হয় সীমাহীন, গন্তব্যহীন পথে। রোমান্টিকের এই গন্তব্যহীন গতি ও স্থিতির দ্বন্দ্ব বোদলেয়ারে অনেক বেশি প্রখর। কেননা, রবীন্দ্রনাথে দুই বিপরীত ভাবের কবিতাগুলিকে আমরা স্পষ্টভাবে ভাগ করে নিতে পারি, দুয়ের মধ্যে মিশ্রণ ঘটে না, তাঁর মন যখন যেদিকে উন্মুখ হয়, তখনকার মতো সেখানেই আত্মসমর্পন করে। কিন্তু বোদলেয়ার তাঁর সমগ্র রচনায়, আর কখনো বা একই কবিতার মধ্যে বুঝিয়ে দেন যে, তাঁর পক্ষে গতি যেমন নিরন্তর মোহময়, স্থিতিও তেমনি ক্ষমাহীনরূপে আহ্বানকারী, এবং উভয় আকর্ষন তাঁর মনে যুগপৎ বিরাজমান।

১১) রোমান্টিকের মনোগত দ্বন্দ্ব, দুরন্ত বাসনা, বাসনার অতৃপ্তি, দুরপনেয় আকাঙ্ক্ষার বোধ জেগে ওঠে চৈতন্যের গভীরতম পীড়ণ ও বিবেকের দংশন থেকে।

বোদলেয়ারে এমন কেউ নেই, ... যে চৈতণ্যের দ্বারা আক্রান্ত ও
পীড়িত নয়, ভাবনা যার অন্ত্রে-তন্ত্রে দংশন করেনি,
কিংবা যার বিবেকের ভার প্রতিভূ কবি বহন করছেন না।[১২]

চৈতন্য ও বিবেক-পীড়িত মানুষের বিষন্নবোধের কথা আছে বোদলেয়ারের কাব্যে। বোদলেয়ারের সমগ্র কাব্যে যা নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে, তা হ'লো —

'মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী, মানুষ পাপী, কিন্তু সে

জানুক সে পাপী, ... মানুষ অমৃতাকাঙক্ষী, কিন্তু সে জানুক
সে অমৃতাকাঙক্ষী।[১৩]

আধুনিক মানব-চৈতণ্যের এই আত্মগত জ্ঞানকে বোদলেয়ার তাঁর নিজস্ব রোমান্টিকতার ধারণা নিয়ে কাব্যময় রূপ দিয়েছেন। বিবেক ও চৈতণ্যের অসম্ভব আন্দোলন-জাত এই আত্মগত জ্ঞানকে বুদ্ধদেব আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান বলেছেন। এবং এদিক থেকে তাঁর মনে হয়েছে, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক। বোদলেয়ার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন - সমগ্র রোমান্টিকতাকেই তিনি আত্মসাৎ করে নেন - তার মধ্যে যা দাগি, ময়লা বা রং-চটা, সব শুদ্ধ, সেই বহু ব্যবহৃত স্তূপ থেকেই ছেঁকে তোলেন যে কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত এবং ভবিষ্যতের। রোমান্টিকতার প্রচলিত ধারনার সঙ্গে দুস্তর তার ব্যবধান। মানব প্রকৃতির কামনা-বাসনা-ক্লেদ-পঙিকলতা-আবেগ-হতাশা-নৈরাশ্য - যাবতীয় চিত্তবৃত্তি রোমান্টিক কবিতায় উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হ'লো। বোদলেয়ারীয় এই সমগ্র রোমান্টিকতা'র মুখোমুখি হয়েই বুদ্ধদেব হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন,

তারই নাম রোমান্টিকতা, যা ব্যক্তিমানুষকে মুক্তিদান করে,
... শুধু ইস্ত্রি করা, এটিকেট মানা সামাজিক জীবনটিকে নয়,
নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে, তার মধ্যে
যা-কিছু অযৌক্তিক, যা যুক্তির অতীত, অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও
রহস্যময়, যা-কিছু গোপন, পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু
গোপন, ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় - সেই বিশাল স্বতোবিরোধময়
বিস্ময়ের সামনে, সন্দেহ নেই, মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির
নাম-ই রোমান্টিকতা।[১৪]

কবিতা বিষয়ে বোদলেয়ারের বিভিন্ন ধারণার সঙ্গে এভাবেই বুদ্ধদের নিজের ধারণাকে মিলিয়ে নিয়েছেন।

। খ ।

পশ্চিমী কাব্য-কবিতায় বুদ্ধদেবের আগ্রহ ও উৎসাহের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছেন বোদলেয়ার। এর পরেই, যদি কোনো একজন য়োরোপীয় কবির প্রতি বুদ্ধদেবের আগ্রহের কথা বলতে হয়, তিনি অবশ্যই জার্মান কবি রাইনের মারিয়া রিলকে (১৮৭৫-১৯২৬)। রিলকে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

এমন এক কবি, যিনি সর্বতোভাবে কবি হ'ত চেয়েছিলেন।
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে কবি। দৈনন্দিনতম জীবনের অর্থহীনতম
মুহূর্তেও। ভ্রমনে ও মননে, বাক্যে, ব্যবহারে, পত্র রচনায়।
... যখন তিনি অসুস্থ বা হতাশ বা মনঃক্ষুন্ন, তখনও।[১৫]

অবিরত কবিতার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন রিলকে। জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা কবিতার ইন্ধন রূপে ব্যবহার করেছেন। রিলকে যেমন প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে কবি হতে চেয়েছিলেন, দৈনন্দিনতম অভিজ্ঞতাও কবিতার

জন্য উৎসর্গ করেছেন, নিজেকেই কবিতার বাহন করে তুলতে চেয়েছেন, এক হিসেবে বুদ্ধদেব নিজেও ছিলেন কবিতার জন্য নিরন্তর সমর্পিত-প্রাণ। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কবিতার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন ক্লান্তিবিহীন কবি ও কর্মী। তবে, রিলকে তাঁর সমকালীন স্টেফান গেয়র্গের মতো কোনো গোষ্ঠীর নেতা বা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, কোনো আন্দোলনে যোগ দেননি কখনো, এলিয়টের মতো সমালোচনা লিখে আধুনিকতার এবং পরোক্ষে নিজের রচনার স্বপক্ষে পাঠকের রুচি গঠন করতে চাননি তিনি। বুদ্ধদেব কবিতার জন্য এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার মোড়-ফেরা ও আন্দোলনে প্রতিনিধি স্থানীয় এক কবি। নিজেই বাংলা ও ইউরোপীয় কাব্য কবিতার সমালোচনা লিখে পাঠকের রুচি গঠন করতে চেয়েছিলেন। কাব্য-কবিতার আদর্শ বদলের সঙ্গে সাধারন পাঠকের যোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার ধারা-বদলকে স্থায়ী ভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। কবিতার প্রতি নিরন্তর উন্মুখতা থেকেই রিলকের প্রতিও উৎসাহবোধ করেছেন বুদ্ধদেব।

রিলকের কবিতা অনুবাদ গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় (১ম প্রকাশ, ১৯৭০) বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছেন, রিলকে কোন্ ধরনের কবি ছিলেন, তার অনন্যতা কোথায় এবং বিশশতকী বিশ্ব-কবিতায় তাঁর বিশেষ অবদানই বা কী। ইউরোপের এই মহত্তর খ্যাতিমান কবির সঙ্গে সাধারন বাঙালী পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। তিনি মনে করেন,

> যাঁরা কবি বা হতে চান, ... নিজেদের কবি বলে
> কল্পনা করেন, তাঁদের পক্ষে রিল্‌কের উদাহরণ শিক্ষাপ্রদ
> ও মনোমুগ্ধকর।[১৬]

কবি-জীবনের সকল দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তিনি নিজে জেনে ছিলেন এবং তার বিস্তীর্ণ দলিল রেখে গেছেন তাঁর পত্রাবলীতে ও 'মান্টে লাউরিড্‌জ ব্রিগগে' নামক গদ্য গ্রন্থে। রিলকের কল্পনার স্বাভাবিক বাহন ছিলো এমন ভাষা, যা ছন্দোবদ্ধ, মিলে ও অনুপ্রাসে ধ্বনিময়। 'প্রহর পুঁথি'র লেখক রিলকে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব লিখেছেন - আমাদের মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকে। দুটি সামান্য লক্ষণ দৃষ্টিপাতমাত্র ধরা পড়ে। 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথের মতোই 'প্রহরপুঁথি'র রিলকে রূপমুগ্ধ ও পার্থিবের প্রেমিক। তাঁর ঈশ্বরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যেই সহস্ররূপে আবির্ভূত। প্রথম পর্বের রূপমুগ্ধ রিলকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে উত্তর সময়ে। বুদ্ধদেব এর ঐতিহাসিক কারণ সন্ধান করেছেন। বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপে রোমান্টিক যুগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়েছে, বোদলেয়ার এবং পরবর্তী ফরাসী প্রতীকী কবিদের প্রভাবে কবিতার ধারনায়ও একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, ফ্র্যান্সের কয়েকজন চিত্রশিল্পীর কাছে জগৎ নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে এই সময়। প্যারিসের বিখ্যাত শিল্পী রঁদার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে রিলকের। এবং রঁদার সঙ্গে সঙ্গে সেজান, ভ্যান গ, বোদলেয়ার - এঁদের অসামান্য শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধেও উৎসাহবোধ করেছেন তিনি। এই ঐতিহাসিক কারণে এবং তিনি নিজে যেহেতু পরিণতি-প্রবণ, রিলকের মন বিমুখ হ'লো সেই হার্দ্য কবিতার প্রতি, যা এযাবৎ তাঁর অবলম্বন ছিলো।[১৭] তিনি সেজানের আঁকা

ছবিতে, বোদলেয়ারের কবিতায় দেখলেন শিল্পীর নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টি। বোদলেয়ারের মতো, আপাত বীভৎসকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিভঙ্গীকে তিনি নিজেও স্বীকার করে নিলেন। রিলকের মনে হ'লো, শিল্পীর পক্ষে এটাই সাধু আচরণ ঃ এই বিষয়নিরপেক্ষ তন্ময় দৃষ্টি, বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতি এই শ্রদ্ধা। মনে হ'লো, 'প্রহর পুঁথি' বা কর্নেটের মতো আবেগধর্মী কাব্যরচনা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় - সম্ভব হলেও সমীচীন নয়। উচ্ছ্বলতা নয়, সংহতি, আকৃতি নয়, দৃষ্ট বস্তু, বর্ননা নয় সাক্ষাৎ উপস্থাপনা, উক্তি নয়, চিত্রকল্প ঃ এই হ'লো এখন থেকে তাঁর অন্বিষ্ট।[১৮] তাঁর কবিতাকে নতুন করে তুললেন তিনি। দুইখন্ডে প্রকাশিত 'নতুন কবিতা'য়

> কবি নিজে আর সেখানে নেই, আছে শুধু কবিতা,
> তাঁর সব পুরোনো অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছেন তিনি, বর্জন
> করেছেন পক্ষপাতী ভক্তি ও ভালোবাসা, এখন তিনি
> চক্ষুস্মান, বিশুদ্ধ অস্তিত্বের আবিষ্কারক।[১৯]

নতুন কবিতা'য় দেখা দিল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। কবিতার সামান্য লক্ষণ হিসেবে দেখা দিল বিশুদ্ধ তন্ময়তা, এক নিবিড়, অনাসক্ত দৃষ্টি, যা সম্পূর্ণ তদ্গত, যার সামনে প্রতিটি বস্তু নিজেকে নিজের পরম মহিমায় উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছে। রিলকের এই বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল অখন্ড চিত্রকল্প রচনারও দক্ষতা। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চিত্রকল্প দিয়েই তিনি প্রকাশ করলেন কবিতার সাঙ্কেতিক বাচন। এই রূপান্তরিত রিলকে কে বুদ্ধদেব বলেছেন - রূপকল্পের উপাসক।[২০] তাঁকে তিনি বলেছেন - 'অনিন্দ্যভাবে গঠনদক্ষ'।[২১] যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রিলকের মধ্যে আরেক ধরনের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। লিখেছেন - রিলকের যুদ্ধকালীন চিঠিপত্রে আমরা পাই এক বিবর্ধমান মনোবেদনা, বিশ্বব্যাপী আর্তি ও চিত্তভ্রংশের সামনে অসহায় অক্ষমতাবোধ। .... রিলকে যেন এই প্রথম বুঝলেন যে জগৎকে বদলে দেবার, জনতাকে অনুপ্রানিত করার কোনো ক্ষমতাই শিল্পকলার নেই।[২২] ১৯১৫ - জুন মাসে লেখা রিলকের চিঠি উদ্ধৃত করেছেন বুদ্ধদেব —

> আশ্চর্য নয় কি - এই যে বিশাল দুঃখ স্বীকৃত হচ্ছে সকলের
> দ্বারা সর্বত্র ... এই নীরন্ধ্র সর্বনাশের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে এত
> সাহস ও আত্মত্যাগ ? এদিকে আমরা - সব শিল্পকলা,
> নাট্যশালা আমরা এই একই জনতার মধ্যে কিছুই জাগাতে পারিনি
> ... কাউকেই বদলাতে পারিনি।[২৩]

১৯১৬, ১৯১৭, ১৯১৮-র বছরগুলিতে রিলকে সৃষ্টি করেছেন সামান্য। যুদ্ধজনিত যন্ত্রনা আর অবরোধের অবসানের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। ১৯২০ সালে আকস্মিক একটি ঘটনায় রিলকে ফিরে পেলেন তাঁর পুরোনো বিশ্বাস ও আস্থা। রিলকের জীবনের ব্যক্তিগত অশান্তি, যুদ্ধজনিত হতাশা - ও আত্মসন্ধান তাঁর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অংশ। অনুল্লিখিত কিন্তু সংহতভাবে সেখানে সবকিছু স্বীকৃত ও সার্থকীকৃত। বুদ্ধদেব মনে করেন, রিলকের এলিজি ও সনেটগুচ্ছ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে, রিলকের

যা কিছু অভিজ্ঞতা, সব এখানে নির্যাসরূপে সংকলিত হয়েছে - অবশেষে উত্তীর্ণ ও রূপান্তরিত। কিছুই বিস্মৃত বা বর্জিত হয় নি, না 'প্রহর পুঁথির ভক্তি, না 'নতুন কবিতা'র বস্তুনিষ্ঠা, না মান্টের চৈতণ্যপীড়া, বা 'রেকুইয়েম্' এর দ্বন্দ্ববোধ - কিন্তু কিছুই অপরিবর্তিত নেই। এই পর্যায়গুলি - যার ভেদরেখা এযাবৎ স্পষ্ট ছিলো আমাদের মনে - সেগুলো আর আলাদা হয়ে রইলো না এখানে, গৃহীত হ'লো এক বৃহত্তর সংশ্লেষে, এক নতুন যোগসূত্রে গ্রথিত হ'লো। নূতন, কিন্তু অভিনব নয়, পূর্বার্জিত সব শিক্ষার দ্বারা লাভবান, অথচ পদে পদে তার সীমাতিক্রান্ত, কবি যেন যুগপৎ তাঁর অতীতের বিরুদ্ধাচারী ও সহকর্মী।

শুধু কবিতার বিষয়বস্তুতে নয়, এরকম একটা নির্বাচন ও সংশ্লেষ রিলকের কবিতার গঠনশৈলীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। এলিজি ও সনেটগুচ্ছ রিলকের রূপকরণের দক্ষতার কথা বলেছেন তিনি। এলিজিগুচ্ছের দ্রুত ধাবমান বিসর্পিত অমিত্রাক্ষর, অনির্বচনীয়কে ভাষায় ধরার চেষ্টায় রুদ্ধশ্বাস বাক্যের ব্যবহার - কাব্যকলায় তাঁর কৃতিত্বের অভিজ্ঞান। ভাষার 'ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব'[২৪] ছিলো নতুন কবিতার রীতিলক্ষণ। কিন্তু, 'ডুয়িনো এলিজি'তে ভাষা বেগান্বিত ও প্রবহমান। বুদ্ধদেব মনে করেন, উক্তি ও চিত্রকল্পের একান্তর বিন্যাসের জন্যই 'ডুয়িনো এলিজি' এমন একাধারে প্রগাঢ় ও গতিশীল, তর্কপরায়ণ ও আবেগস্পন্দিত। আবার, 'নতুন কবিতা'র ভাস্কর্যোপম শৈলীর তুলনায় বা প্রতিতুলনায় 'অর্ফিয়ুস' এর চিত্রকল্পগুলি গতিশীল ও রূপান্তরপ্রবণ। তাদের আবেদন আমাদের চক্ষুতে আবদ্ধ নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ে সঞ্চরমান।

রিলকের জীবন ও কবিতা বিষয়ক দীর্ঘ প্রবন্ধে বুদ্ধদেব রিলকের কবিতার একটা বিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথমদিকে রিলকের রচনায় যথেষ্ট বহিরাশ্রয় ছিলোনা। চেতনা ও জড়বিশ্বের দ্বন্দ্ব স্পর্শ করেনি তাঁকে। আবেগ-সঞ্জাত একটি বক্তব্যকে ঘিরে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। ভাষা তখন ছন্দোবদ্ধ, মিল ও অনুপ্রাসে ধ্বনিময়। কিন্তু, রিলকের সঙ্গে যখন ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী রঁদার পরিচয় হলো এবং সেইসূত্রে বোদলেয়ার, ভ্যান গঁগ ও সেজানের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় হলো তার, রূপমুগ্ধ রিলকের শিল্প-প্রকৃতির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেলো। শিল্পীর নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি আকৃষ্ট করলো রিলকে কে। তাঁর ঈশ্বরানুভূতি, কল্পনা ও আবেগের আতিশয্য, রূপান্তরিত হ'লো বিষয়নিরপেক্ষ সংহত তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিশুদ্ধ অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর কবিতার ভাষা হয়ে উঠলো ইঙ্গিতধর্মী। আর, মহাযুদ্ধ শুরু হ'লে রিলকের শিল্পভাবনাতে শুরু হ'লো আন্দোলন। তাঁর কেবল-ই মনে হ'লো - এই শিল্প-নাটক-কবিতা যন্ত্রনাজর্জর জীবনকে কিছু দিতে পারছে না, কিছুই বদলাতে পারছে না। তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও আত্মসন্ধান কবিতায় ব্যবহৃত ও রূপান্তরিত হ'লো। এক রূপমুগ্ধ ঈশ্বরবোধে মগ্ন কবি ক্রমে বিবর্তিত হয়েছেন। সংশয়-দ্বন্দ্ব-পীড়িত মানব-চৈতন্যের বানীবাহক হয়েছেন। বিষয়গত রূপ দিয়েছে তার পরিবর্তিত ভাষা। কল্পনার স্বাভাবিক বাহন হিসেবে যে ছন্দোময় ধ্বনিময় আবেগপ্রবণ ভাষা রিলকের কবিতায় প্রথম দিকে দেখা দিয়েছে, সেই ভাষাকেই ক্রমে দক্ষ শিল্পীর মতো ব্যবহার করেছেন তিনি। কখনো তাঁর ভাষা লাভ করেছে ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য ও ঘনত্ব, কখনো সেই ভাষা হয়েছে বেগান্বিত ও প্রবহমান। তাঁর এলিজিগুচ্ছের ভাষা নিয়ে এলো 'বচনাতীতের বার্তা'।[২৫] বুদ্ধদেব লিখেছেন

যে, কবিতার ভাষা কতদূর পর্যন্ত অর্থবহ ও ইঙ্গিতময় হ'তে পারে, বিশ শতকী বিশ্ব-কবিতায় তার একটি চরম সীমা এই এলিজিগুচ্ছ।

রিলকের প্রথমদিকে কবিতাগুলি বাদ দিলে কবি হিসেবে রিলকে পুরোপুরি বোদলেয়ারপন্থী। বোদলেয়ার -এর কবিতা দ্বারা তিনি গভীরভাবে অনুপ্রানিত। বোদলেয়ার এর 'এক শব' কবিতা দ্বারা তিনি এতদূর পর্যন্ত অনুপ্রানিত যে, ১৯০৭ সালে স্ত্রী ক্লারাকে এ বিষয়ে চিঠি লিখেছেন।[২৬] সেজানের আঁকা একটি আপেলের ছবি দেখে তাঁর মনে হলো, যে নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ধারা সেজানে দেখা যাচ্ছে, এই কবিতাটি না থাকলে তা সম্ভব হ'তো না। আপাত বীভৎসকে নির্মোহ, নিরাসক্ত ভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি নিজেও সেখান থেকেই অর্জন করে নিলেন। তাঁর নতুন নৈর্ব্যক্তিক রীতির উদাহরণ হ'য়ে রইলো 'চিতাবাঘ' কবিতা, যার সঙ্গে আমাদের হৃদয়বৃত্তির কোনো সম্বন্ধ নেই। কবির উপরে জয় হ'লো কবিতার। কবিতা বিষয়ে রিলকে কোনো অভিনব ধারনার প্রবক্তা নন। কোনো নব্য রীতি-প্রকরণের স্রষ্টা নন তিনি। কিন্তু, কবিতা বিষয়ে তিনি ক্রমাগত সচেষ্ট, সচেতন ও বিবর্তনপন্থী। তাই ঐতিহাসিক কারণে কবিতার নতুন মোড়-ফেরাকে তিনি সহজেই আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমাগত নতুন করে তুলেছেন নিজের কবিতা। বোদলেয়ার-পরবর্তী এই কবিতাগুলিকে বুদ্ধদেব ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার ধারায় বিশিষ্ট স্থানলাভের অধিকারী ব'লে মনে করেন। বিশ শতকী আধুনিক কবিতার জগতেও এগুলিকে মূল্যবান মনে করেন।

। গ ।

দীর্ঘ ভূমিকাসহ 'হ্যেল্ডার্লিন-এর কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থ বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন ১৯৬৭ সালে। এই গ্রন্থ রচনার অনেক আগে কবিতা পত্রিকাতে হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব। হ্যেল্ডার্লিন সম্বন্ধে তার প্রবন্ধ মূলতঃ হ্যেল্ডার্লিন সমালোচনার জন্য নয়। বরং জার্মান কবি হ্যেল্ডার্লিনকে বাঙালি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি লিখেছেন - আমাদের দেশে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কবির সঙ্গে বিদগ্ধ সমাজের প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোই এর উদ্দেশ্য।[২৭]

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সাংস্কৃতিক দৈন্যময় মফস্বলী পাঠকের মনোজগতের কিঞ্চিৎ বিস্তারের জন্যই একাজ করেছেন তিনি। আধুনিক কবিরা চেতনার বিশ্বরূপকে বিস্তৃত করেছেন বহু পঠনশীলতায়। সুতরাং, যাকে বলা যায় সমালোচনা - এসব ক্ষেত্রে ঠিক তা হয়নি। বুদ্ধদেব মূলতঃ তাঁর কাব্যধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন।

হ্যেল্ডার্লিনকে তিনি গ্যেটের বিপরীত মেরুতে স্থান দিয়েছেন। একজন বহুমুখী, বহুপ্রসূ, বিস্তীর্ণ, রাজকীয়, বিজয়ী, যুগস্রষ্টা বা যুগপ্রতিভূ, আর অন্যজন একতন্ত্রী, নিবিষ্ট, সীমিত, প্রগাঢ় এবং অবহেলিত, তীব্র ও ঐকান্তিক। হ্যেল্ডার্লিনকে তিনি একতন্ত্রী, নিবিষ্ট' কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্লেকের সঙ্গে তুলনায় হ্যেল্ডার্লিনকে তাঁর মনে হয়েছে, ব্লেকের মতই ধর্মকেন্দ্রিক, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে খ্রীষ্টান নন, একই ধরনের চার্চের বিরোধী। কিন্তু ব্লেকের প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াকর্মে একটা অস্থিরতা ছিলো,

তুলনায় হ্যেল্ডার্লিনের কবিচরিত্রে আমরা লক্ষ্য করি এক আশ্চর্য শান্তি ও স্থিরতা, সমাহিত তিনি, নিজের ভাবনায় আবৃত ও সংবৃত, সব বিতর্কের বাইরে, সমাজ-সংসার থেকে পলাতক নন কিন্তু তার দ্বারা অস্পৃষ্ট যেন। 'ধ্যানী কবি'র উদাহরণ হিসেবে হ্যেল্ডার্লিন-এর নাম করেছেন বুদ্ধদেব।

হ্যেল্ডার্লিন-এর কাব্যকলা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নিম্নরূপ —

১) হ্যেল্ডার্লিনের অধিকাংশ কবিতা সরল অথচ ধ্যানগম্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাঢ়। এবং তাঁর রচনায় নেই তির্যক ভঙ্গিও সেই উভমুখিতা, যা বিশশতকী আধুনিকতার একটি লক্ষণ। বরং ওঅর্ডস্বার্থ, কিংবা শেলির মতোই তিনি প্রত্যক্ষভাবে ঋজু উক্তির আকারে, প্রাবন্ধিক ধরনে, বক্তব্যকে উপস্থিত করেন।

২) আদিযুগের প্রায় প্রত্যেক রোমান্টিকের মতো, তাঁরও আস্থা ছিলো জগতের ও মানব-জাতির মঙ্গলপ্রবনতায়, আনন্দিত হওয়াকেই মানুষের 'স্বাভাবিক' অবস্থা বলে মেনেছিলেন।

৩) হ্যেল্ডার্লিন ছিলেন গ্রীসের যোগ্যতর শিষ্য, গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মেনে নিয়েছিলেন কঠিন রূপকল্পের বন্ধন, শিখেছিলেন ধ্রপদী সংযম, মিতভাষণের কারুশিল্প।

৪) তাঁর চিত্রকল্পগুলি যথাসম্ভব স্পষ্ট ও সর্বজনীন যা সকলেরই অভিজ্ঞতায় অর্ন্তভুক্ত, তার বাইরে তিনি সাধারনতঃ দৃষ্টিপাত করেন না।

৫) তাঁর বিষয়বস্তুতেও শেষ পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা ছাড়া, কোনো অভিনবত্ব নেই, সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক উল্লেখও বিরল, যা আছে তা সর্বজনজ্ঞাত। সংকীর্ন তাঁর জগৎ, বৈচিত্রহীন, একাভিমুখী।

৬) অথচ তাঁর প্রতিটি উক্তি যেন সদ্যোজাত, অম্লেয়রূপে তরুণ, অবিরলভাবে প্রফুল্ল ও সপ্রতিভ। বুদ্ধদেব মনে করেন এর মূলে আছে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেরই বৈশিষ্ট্য, যাকে তাঁরা সরলতা ও আস্থা বলে তা-ই। নিরাভরণ ও বিশুদ্ধ উক্তির আকারে মর্মকথা প্রকাশ করার একটি অসামান্য ক্ষমতা ছিলো তাঁর।

৭) শেষ পর্যায়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিলো পরিবর্তন। পূর্ব রচনার তুলনায় আকার বাক্য-বিন্যাসে ও ভাষা ব্যবহারও জটিল হয়ে উঠলো। এসব রচনা স্থাপত্যধর্মী নেই আর, ভাষা তার স্বচ্ছতা হারিয়েছে, কবিতার গঠন হয়েছে নম্য, স্থিতিস্থাপক, পংক্তিগুলি পরস্পর জড়িয়ে যাচ্ছে। মেঘচ্ছুরিত সূর্যরশ্মির মতো শব্দগুলি যেন বহুবর্ণ ও রহস্যময় - যেন, তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তার সবটুকু নির্বাচিত আধারে ধরানো যাচ্ছে না, বক্তব্য ছাপিয়ে যাচ্ছে রূপকল্পের অবয়ব, অংশত হয়তো হারিয়েও যাবে, যদি না পাঠকের থাকে পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা।[২৮] কবির বক্তব্য ও চিন্তা রচনার সীমা ছাড়িয়ে যায়। পাঠকের মনে যা-কিছু পৌঁছয় তার তুলনায় অপ্রতুল মনে হয় 'বিষয় বা উপলক্ষটিকে, অর্থাৎ এদের অভিঘাতের একটা অংশ হলো উদ্ধৃত্ত বা অতিরিক্ত, পাঠক যাতে অধিকতর লাভবান হচ্ছেন।

বোদলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই হ্যেল্ডার্লিন-এর কবি-জীবন সমাপ্ত হয়েছে। ফলে, বোদলেয়ার-পরবর্তী ইউরোপীয় কবিতার নবজন্ম তাঁকে স্পর্শ করেনি। বিশশতকী আধুনিকতার বিভিন্ন লক্ষণও দেখা যায়নি তাঁর মধ্যে। পুরোনো রোমান্টিক কবিদের মতো

তিনি আস্থাশীল ছিলেন জগৎ ও জীবনের মঙ্গলবোধে। কিন্তু, তাঁর বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যে অনুরঞ্জিত। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে —

> হ্যেল্ডার্লিনের স্বতঃস্ফূর্ত পুণ্যচেতনার সঙ্গে তুলনা করলে,
> ধরা যাক, এলিয়টের 'ককটেল পার্টি'র ধর্মবোধকে মনে হবে
> একটি চেষ্টাকৃত বানিয়ে তোলা পদার্থ হৃদয় প্রনোদিত ভক্তি নয়,
> সাহিত্যরচনার একটি উপাদান বা অবলম্বন।[২৯]

আবার, হ্যেল্ডার্লিনের শেষ পর্যায়ের সব কবিতার মতো জটিল ও দুর্বোধ্য হ'লেও 'পাৎমস' সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> গীতিকবিতা নয়, মিস্টিকদের আত্মহারা উচ্চারণ নয়,
> একটি সুদীর্ঘ, শিল্পিত, সুনিয়ন্ত্রিত, বহুলাঙ্গ ঈশ্বর বিষয়ক
> কবিতা - তাতে এতদূর পর্যন্ত অনাস্থার অপনোদন সাহিত্যের
> একটি অসামান্য ঘটনা বলে চিহ্নিত হতে পারে।[৩০]

হ্যেল্ডার্লিনের বিশিষ্টতা বিশ শতকের আধুনিক কবিদের তুলনায় ভিন্নতর। ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য এক কবি। 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা' অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন —

> তাঁর কবিতা যতবার পড়ি বা স্মরণে আনি, আমার মনে হয়
> তিনি যেন সত্যি দেবতাদের দ্বারা লালিত হয়েছিলেন ...
> তাঁর ছন্দোবদ্ধ অমল পংক্তিগুলি যেন কোনো অলোকদ্রষ্টা
> ভক্ত হৃদয়ের স্তবগান। সেই আনন্দের অংশ দেবার আগ্রহ
> থেকেই এই অনুবাদগুচ্ছের জন্ম।[৩১]

ইউরোপীয় কবি ও কাব্যের কাছে আধুনিক বাংলা কবিতার ঋণ এখন সর্বজনবিদিত। ওইসব কবিতা থেকেই আধুনিক বাংলা কবিতা নতুন সৃষ্টিপথের সন্ধান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যভাবনার সঙ্গে এজরা পাউন্ড, ডি.এইচ.লরেন্স, বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোঁ, হ্যেল্ডার্লিন, রাইনের মারিয়া রিলকে প্রভৃতি ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের কাব্যচর্চার সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।[৩২] তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলনে পাউন্ড, পাস্তেরনাক, বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে ব্যতীত কামিংস, ওয়ালেস স্টীভেন্স প্রভৃতি আমেরিকান কবিদের অনুবাদও লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, গদ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে অসকার ওয়াইল্ড, জিভাগো উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের প্রতি বাঙালি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা গ্রহন করেছিলো।

ইউরোপীয় কবি ও কবিতার যে আলোচনা বুদ্ধদেব করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন কবি হলেন, বোদলেয়ার, হ্যেল্ডার্লিন ও রিলকে। এঁদের মধ্যে বোদলেয়ারের প্রতি তাঁর সীমাহীন উৎসাহ ও একাত্মতা। হ্যেল্ডার্লিন, রিলকে, জিভাগো - প্রভৃতি অনুবাদ গ্রন্থগুলির ভূমিকায় ইউরোপীয় কবি ও

কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। 'হাউই' নামে অসকারওয়াইল্ডের গল্প অনুবাদের ভূমিকা ও ডঃ 'জিভাগো'র ভূমিকাটি নাতিদীর্ঘ। এঁদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও স্বল্প।

এইসব অনুবাদকে ছাড়িয়ে গিয়েছে তাঁর বোদলেয়ারের কবিতার অনুবাদ - এতটাই একাত্মতা বোধ করেছিলেন তিনি বোদলেয়ারের সঙ্গে। যেন বোদলেয়ারের মধ্যে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।[৩৩] বোদলেয়ার সম্বন্ধে এলিয়ট বলেছিলেন তিনি ফ্রান্সে আধুনিকতার প্রথম উন্মোচক, আধুনিকতার rebivation হয়েছিল তাঁর লেখায়। আর বুদ্ধদেবের লেখায় দেখা গিয়েছিলো, আপাদমস্তক আধুনিক হওয়ার আগ্রহ, আধুনিকতার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম। তাঁর-ই মতো বুদ্ধদেবেরও লেখায় দেখা দিয়েছিলো 'renovation of an attitude towards life' এবং এলিয়টের সমালোচনা থেকে তুলে এনে আমরা বলতে পারি তা 'no less radical and no less important'[৩৪]

বাংলা কবিতার প্রচলিত ধারা ও প্রকরণে স্বস্তি পাননি বুদ্ধদেব। চিরাচরিত মঙ্গলবোধ ও কল্যাণবোধের যে ধারণা বাংলা কবিতায় বহু-প্রচারিত, সেই পুরানো ব্যবহৃত ধারণা নিয়ে কবিতা রচনা আর সম্ভব নয়, এমন-ই মনে হ'লো তাঁর। জীবনের নির্বাচিত খন্ড - বিচ্ছিন্ন অনুভূতি নয়, বাসনা-কামনা-লোভ-লালসা-যাবতীয় পাশবিক বৃত্তিগুলি মিলিয়ে যে মানুষ, তার সমগ্র অনুভুতি ও চৈতন্যকেই সাহিত্যে স্থান দিতে চেয়েছেন। এই অভিনব পথে আত্ম-আবিষ্কারের চেষ্টায় বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমূখ পথ খুঁজেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণবোধ ও মঙ্গলবোধের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে তাঁরা ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দিকে ফিরে তাকালেন। ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলাসাহিত্য অবশ্য সব সময়ই প্রেরণা পেয়ে আসছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করতেন। বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচনার সময় প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপের প্রেরনা কাজ করেছে। আর, মহাযুদ্ধ যখন এক বিরাট নেতিবোধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল বিশ্বজোড়া মানুষকে, ভারতবর্ষীয় ঔপনিষদিক অস্তি বাচকতায় আর আস্থা খুঁজে পেলোনা বাঙালি কবি। পর-পর দুটি যুদ্ধ তাঁদের জীবনবোধকেই পাল্টে দিল। রবীন্দ্র পরবর্তী অনেক কবিই ইউরোপীয়-দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছেন। জীবনের ভয়াবহ শূন্যতা, বিরাট 'নাস্তি'র শেকড় তারা প্রোথিত দেখলেন ইউরোপের দর্শনে। জীবনের-ই রূপায়ণের জন্য তাঁরা ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দিকে মুখ ফেরালেন। তাছাড়া, স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশের জন্যও এই সময় রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের ফিরে তাকাতে হয়েছিলো ইউরোপের দিকে। এঁদের মনে হয়েছে, দীর্ঘ ব্যবহারে জীর্ণ ভারতবর্ষীয় কাব্য উপাদান নিঃশেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রবলয় প্রতিধ্বনি করে নাম-মাত্র কবি হ'তে তাঁরা চাননি। রবীন্দ্রলয় অতিক্রম করে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাইলেন। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতার দর্শনে বাংলা কবিতা রচনার একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলো। ইউরোপীয় কাব্য-কবিতা ও শিল্প সমালোচনার মাধ্যমে কবিতার নতুন সূত্র সন্ধান করেছেন বুদ্ধদেব। প্রথম থেকেই বাংলা আধুনিক কবিতা সমালোচিত হতে শুরু করেছিলো। সমালোচনা যাঁরা করেছেন, তাঁরাও মূলতঃ পাশ্চত্ত্য আদর্শে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব-পূর্ববর্তী মোহিতলালের আদর্শগত ধারনার ভিত্তি ছিলো ম্যাথুআর্নল্ড, ওয়ালটার পেটার, সোপেন হাওয়ার, অসকার ওয়াইল্ড। মোহিতলালের তুলনায় বুদ্ধদেব গ্রহন করলেন একটু পরবর্তী ইউরোপীয় কাব্য-

কবিতার ধারনাকে। বোদলেয়ার-হ্যেল্ডার্লিন-রিলকের সমালোচনা অনেকটা এই আগ্রহেরই ফল। ইউরোপীয় কবিতার ইতিহাসে এঁরা প্রত্যেকে বিশিষ্ট কবি। কিন্তু, এঁদের প্রতিষ্ঠা ভূমি মূলতঃ বোদলেয়ার। বোদলেয়ারে অনুপ্রাণিত হয়েই কবিতায় ক্রমাগত বিবর্তিত হয়েছেন রিলকে। বোদলেয়ারের হাতেই ইউরোপীয় কবিতার জন্মান্তর ঘটলো।

> তিনিই রোপণ করে দিয়ে যান সাহিত্যে সাঙ্কেতিক আন্দোলনের
> বীজ, এই বীজ-ই মহীরূহের আকার ধারন করে র‍্যাঁবো
> ও মালার্মের কবিতায়। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই ফরাসী
> symbolist / সাঙ্কেতিক / প্রতীকী আন্দোলন গভীর প্রভাব
> বিস্তার করেছিলো।[৩৫]

নতুন কবিতার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট বুদ্ধদেব বোদলেয়ারে খুঁজে পেলেন কবিতার এক নতুন উপনিবেশ। কবিতাকে যাতে নতুন করে তোলা যায়, পেলেন সেই পথ-প্রকরণ ও প্রেরণা। বোদলেয়ারকে তাঁর মনে হ'লো - 'কবিতার বিষয়ে পূর্ণতাপে নিরন্তর ভাস্বর'।[৩৬] জন্ম-রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেব বোদলেয়ার-এ দেখলেন রোমান্টিকতার এক নতুন জগৎ। রোমান্টিকদের মন্ময় আত্মহারা অনুভূতির বদলে জায়গা পেয়েছে বিবেক ও চৈতন্যপীড়িত মানুষের অসহায় আত্মগত বোধ। বোদলেয়ারের মধ্যে দেখতে পেলেন রোমান্টিকতার পরিশোধন ও পরিশীলন।[৩৭] যাবতীয় রোমান্টিক বিলাসিতা ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছেছিলেন এমন এক তুরীয় অবস্থায়, যেখানে বিষাদ পরিণত হয়েছে বিতৃষ্ণায়, এবং বিতৃষ্ণা থেকে সঞ্জাত হয়েছে নির্বেদ। যার প্রভাবে সময়ের মন্থরতা অসহ্য হয়ে ওঠে, নিজেকে মনে হয় - 'নামহীন ত্রাসে পরিবৃত এক শিলাখন্ড মাত্র'।[৩৮] সময়ের এই ভয়ঙ্কর ভার থেকে মুক্তি অনায়ত্ত বলেই বোদলেয়ারে ব্যপ্ত হয়ে আছে এক বিবর্তনহীন বিশ্ব-বিষাদ। আত্মশোধনের জন্য আছে ক্রমাগত আত্মপরীক্ষা, আত্ম-নির্যাতন-যন্ত্রনার নিবিড়তম অভিজ্ঞতা। ওঅর্ডস্বার্থ, কোলরিজ, শেলি-বায়রণের রোমান্টিক বিষন্নতা ছাড়িয়ে বোদলেয়ার যেন আরও খানিকটা দূরস্পর্শী, তাঁর দুঃখসাধনা আরও মর্মান্তিক। বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে বোদলেয়ারের এই রোমান্টিক দুঃখসাধনা 'অনেক বেশী সত্যবাদী', অনেক বেশী 'সার্থক'।[৩৯] এভাবেই, কবিতা বিষয়ে বোদলেয়ারের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন বুদ্ধদেব। বোদলেয়ারের কবিতা অনুবাদের ভূমিকায়, দীর্ঘ প্রবন্ধে অবিরত সমর্থন করেছেন বোদলেয়ারকে। বোদলেয়ারের মতো বুদ্ধদেব কবিতা বলতে বোঝাতে চাইলেন এমন রচনা যাতে সব অবান্তরতা বর্জন করে কবিতাকেই সর্বস্ব মনে হয়, যার মধ্যে কবিতা ছাড়া কিছু নেই। যার প্রতিটি অংশই কবিতা দ্বারা আক্রান্ত। আধুনিক কবিতার যাবতীয় সূত্র খুঁজে পেলেন বোদলেয়ারে। ইংলন্ডের ব্লেক, কীটস, কোলরিজ, জার্মানিতে হ্যেল্ডার্লিন, নোভালিস, ফ্রান্সের নের্ভাল, গ্যাটে, আমেরিকার এডগার অ্যালানপো, হুইটম্যান, - এঁদের তুলনায় বোদলেয়ারে তিনি খুঁজে পেলেন কবিতা বিষয়ক এমন কিছু নতুন সূত্র, যা সমন্বিত হয়ে 'ভাবীকালের ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠলো'।[৪০] পরবর্তী ফরাশি কবিতায়, পরবর্তী পশ্চিমী কাব্যে শুধু নয়, বোদলেয়ারের কবিতার নান্দনিক সূত্র সমগ্রভাবে আধুনিক কবিতার উৎস হতে পারে - এমন-ই মনে করেন বুদ্ধদেব।

নির্দেশিকা

১. বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাকদীয়, 'কবিতা', পঞ্চদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬, ক্রমিক সংখ্যা ৬৩.

২. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৯, পৃঃ ২৩।

৩. তদেব, পৃ. ২৫।

৪. বসু, বুদ্ধদেব, অনুবাদকের বক্তব্য, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৯১, পৃ. ৭২।

৫. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ. ২৮০-২৮১।

৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শার্ল বোদলেয়ার ঃ তার কবিতা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ. ১

৭. তদেব, পৃ. ৩

৮. তদেব, পৃ. ৪

৯. তদেব, পৃ. ২

১০. তদেব, পৃ. ৫

১১. তদেব, পৃ. ৭

১২. তদেব, পৃ. ৩১

১৩. তদেব, পৃ. ৩১

১৪. তদেব, পৃ. ৪

১৫. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৯১, পৃ. ১১

১৬. তদেব, পৃ. ১৩

১৭. তদেব, পৃ. ৩৩

১৮. তদেব, পৃ. ৩৪

১৯. তদেব, পৃ. ৩৮

২০. তদেব, পৃ. ৪১

২১. তদেব, পৃ. ৪১

২২. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬

২৩. তদেব, পৃ. ৪৬

২৪. তদেব, পৃ. ৬৩-৬৪

২৫. তদেব, পৃ. ৬৪
২৬. তদেব, পৃ. ৩৩
২৭. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা, কলকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি., ১৯৮৯, পৃঃ ২৫।
২৮. তদেব, পৃ. ২০
২৯. তদেব, পৃ. ১৯
৩০. তদেব, পৃ. ২২
৩১. তদেব, পৃ. ২৩
৩২. মিত্র, মঞ্জুভাষ, আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব, কলকাতা, নবার্ক, ১৯৮৬, পৃ. ২২২
৩৩. আহ্‌মদ, শাহাবুদ্দিন, 'বুদ্ধদেব বসু ঃ বোদলেয়ার ও ল্য ফ্ল্যুর দ্যু মাল' এর অনুবাদ', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম, ১৯৭৪, নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃ. ৩৬
৩৪. Eliot, T.S., 'Baudelaire', selected essays, London, Faber & Faber Ltd., 1961, 3rd Enlarge Edition, page-426.
৩৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুরভি, শার্লবোদলেয়ার ঃ অনন্য স্রষ্টা, পরিশিষ্ট, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯২, পৃ. ১৫৯
৩৬. বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, শাল বোদলেয়ার ঃ তার কবিতা, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ. ৬
৩৭. তদেব, পৃ. ৫
৩৮. তদেব, পৃ. ১৯
৩৯. তদেব, পৃ. ২২
৪০. তদেব, পৃ. ৫-৬

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির শিরোনাম - 'এলিজি ঃ বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি'[১] কবিতার প্রথম পংক্তিটি এরকম—

তোমার নিকটে এসে বৃক্ষের ভরোসা পেতো কবি, ছায়া পেতো,
সচ্ছলতা পেতো সুন্দর, নির্ভরযোগ্য কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হিমানী
পেতে পেতে মনে হয় আজো পাবো সহসা সন্ধ্যায়, ক্ষণকাল
ব্যস্ত তুমি ..... ।[২]

এই কবিতার-ই অন্য একটি স্তবকে অন্য একটি পংক্তি —

কিন্তু তুমি, প্রান্তর যেমন সীমাহীন, পারহীন সমুদ্রের আলেখ্য
যেমন তেমন অব্যর্থ, দীর্ঘ, কবিতার অগ্রজ কুসুম।[৩]

এই কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেবকে বলেছেন 'কবিতার অগ্রজ কুসুম', বলেছেন, তাঁর কাছে এসে অন্য কবিরা 'বৃক্ষের ভরোসা পেতো', 'ছায়া পেতো'। আধুনিক বাংলা কবিতার আশ্রয় যেন তিনি। এক হিসেবে আধুনিক বাংলা কবিতার অভিভাবক ছিলেন তিনি। বাংলা সাহিত্যে এই অভিভাবকত্ব অর্জন করেছিলেন 'একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপর বুদ্ধদেব বসু।'[৪] নিজে একজন প্রধান কবি হয়েও তিনি সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের অবিরত উৎসাহিত করেছেন, প্রেরণা যুগিয়েছে লেখায়। বুদ্ধদেবের এই ভূমিকা আধুনিক বাংলাসাহিত্যে বিরল। বুদ্ধদেব সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য ঃ

আমার অবাক লাগে, আবিরাম নিজে লিখেও অন্যের লেখা সম্বন্ধে
কি করে একজন এতটা শ্রদ্ধা এতটা আগ্রহ দেখাবার ফুসরত করে
উঠতে পেরেছেন ! ..... সমকালীন লেখকদের মুক্তকণ্ঠে স্বাগত
জানানো, অঙ্কুরেই প্রতিভাকে চিহ্নিত করা, বুকদিয়ে আগলানো, -
সাহিত্যে এভাবে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজ আর
কে করেছেন ?[৫]

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলাসাহিত্যে তাঁর ভূমিকা পৃষ্ঠপোষকের নয়, প্রহরজাগা সান্ত্রীর কিংবা সেনাপতির।[৬] অজিত দত্ত লিখেছেন —

আমার কবিতা লেখার ক্ষমতায় আমার কোনো আস্থা ছিলোনা।
..... বুদ্ধদেবের সঙ্গে আলাপ হবার পর বুদ্ধদেব যখন আমার
লেখার প্রশংসা করলো, লেখার জন্য আমাকে রোজ তাগিদ
দিতে থাকলো, তখন থেকেই বলতে গেলে আমি কবিতা লেখার
মতো আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেলাম।[৭]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন - তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন নবীন কবিরা।

> একজন নবীন কবি কি করে জানবেন যে তাঁর কবিতা সক্ষমতার
> সীমারেখাটা স্পর্শ করেছে কি-না ? ..... বুদ্ধদেব বসুর মতন একজন
> কবির কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর আত্মবিশ্বাস অনেক দৃঢ় হয়।[৮]

কবিতা লেখায় সমকালীন কবিদের প্রেরণা যেমন দিয়েছেন তেমনি সমকালীন কবিতার বিচারও করেছেন বুদ্ধদেব। বিচার না বলে একে উপভোগ বলাই সংগত। কেননা, প্রচলিত অর্থে যাকে বিচার বলে, সেরকম কিছু ঘর্মাক্ত - কলেবর রচনা বুদ্ধদেবের একেবারেই নেই। ফলে, তাঁর রচনা বা সমালোচনা সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দেরই প্রকাশ। আর, তাঁর কৃতিত্ত্ব এইখানে যে, নিজের আনন্দকে তিনি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। তাঁর এই দক্ষতা তাঁর অপরূপ বাগবিন্যাস প্রণালীর জন্যে, এবং তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির জন্যেও। সমকালীন কবিদের রচনা থেকে তিনি এমন অনেক ব্যবহৃত শব্দ, মিল বা ভাবচ্ছবি আবিষ্কার করেন, এমন অনেক হীরকখণ্ড খুঁজে পান যা পাঠকের চোখেও মায়াবী আলোর ছোঁয়া লাগায়। তাঁর এই বৃত্তিটি নির্বাধ হয়ে উঠেছিলো বিশেষভাবে, ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাস থেকে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পরে যেসব কবিরা নতুন দৃষ্টি ও সুর নিয়ে এসেছিলেন, যাঁদের বলবার কথাও ছিল নতুন, তাঁদের বাহন ও প্রচারক রূপেই 'কবিতা' পত্রিকার যাত্রা শুরু হয়েছিল। অবশ্য, এরকম ভাবনার সূচনা হয়েছিলো আরো আটবছর আগে, ঢাকা শহরে যখন বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত তাঁদের 'প্রগতি' ছাপায় অক্ষরে প্রকাশ করলেন তখন থেকেই। কবিতার মতো 'প্রগতি'র ও উদ্দেশ্য ছিল নতুন সাহিত্য প্রকাশ করা, সর্বোপরি, প্রচার করা। 'প্রগতিতে'ই জীবনানন্দের কবিতা প্রথম আলোচিত হয়েছিল। কবিতা প্রকাশিত হলে —

> প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলার আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে
> এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনোদিন মুছবেনা।
> আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী
> বস্তু নয় - সে কথা ঐ চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালি পাঠক বর্গ
> অনুভব করেন। সেই সঙ্গে আবিস্কার করেন এমন সব কবিকে
> যাঁরা ভবিষ্যতে কবিতার নানা দিক বিজয় করেছেন।[৯]

প্রকৃতপক্ষে, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়- এই সব আধুনিক কবি 'কবিতা' পত্রিকার মাধ্যমেই পাঠকের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এঁদের অনেকের কবিতাই আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পাননি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো ক'রে আলোচনাও হয়নি।

> কবিতা পত্রিকাই তাঁদের প্রথম কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা
> নিয়ে আলোচনা করে।[১০]

'কবিতা'র প্রথম বছরেই ছাপা হয় জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'বনালতা সেন', সমর সেনের

'স্মৃতি' বিষ্ণু দে,র 'বিবমিষা', বুদ্ধদেবের 'চিল্কায় সকাল' সুধীন্দ্রনাথের 'জন্মান্তর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতা। 'কবিতা'র দ্বিতীয় বছরে জীবনানন্দ দাশের অনেকগুলি কবিতা এবং অন্যান্য অনেক কবির কবিতার সঙ্গে প্রকাশিত হয় সমর সেনের "কয়েকটি কবিতার" সমালোচনা। 'নবযৌবনের কবিতা' - এই শিরোনামে প্রকাশিত হয় লেখাটি। সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। এমনও মনে করা হয়েছে যে —

> বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না - করতেন এবং
> সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখতেন তাহ'লে
> তখনকার দিনের সমর সেন হয়তো অমন উৎসাহে অত কবিতা
> লিখতেন না এবং তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না [১১]

- এই বছরের-ই চৈত্র সংখ্যায় বুদ্ধদেবের আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের সমালোচনা। 'প্রকৃতির কবি'-এই শিরোনামে লেখা। জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা কবিতার একজন প্রধান কবি। কিন্তু, একথা বুদ্ধদেব-ই প্রথম বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন —

> ... জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান
> কবি ব'লে মনে করি, ...।[১২]

মোটকথা 'কবিতা'র প্রায় সমস্ত পৃষ্টাগুলিতে অধিকার বিস্তার করেছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার তরুণতম কবিরা। তাঁদের কবিতা যে শুধু প্রকাশিত হয়েছে, তাই নয়, তাঁদের কাব্যগ্রন্থগুলিও বস্তৃত ভাবে আলোচিত হয়েছে 'কবিতা'য়। কখনো জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ কবি স্বয়ং এই সব সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বিষয় হয়ে উঠেছেন। কখনো সুধীন্দ্রনাথের 'ক্রন্দসী', 'অর্কেষ্ট্রা', বিষ্ণু দে'র 'চোরা বালি', অমিয় চক্রবর্ত্তীর 'খসড়া', 'একমুঠো' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক', 'কবিতা'র পাতায় সমালোচিত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোকে স্বয়ং সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর এইসব সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধগুলি 'কবিতা' ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। পরে সেগুলি 'কালের পুতুল', 'সাহিত্যচর্চা', 'উত্তর তিরিশ', স্বদেশ ও সংস্কৃতি', 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' - প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া আছে 'An Acre of Green Grass'এ ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন এবং 'প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ' - এগুলিতেও আধুনিক কবি ও কবিতার সমালোচনা মূলতঃ জায়গা জুড়ে আছে। 'An Acre of Green Grass'এর প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই অবশ্য 'কালের পুতুলে'র প্রবন্ধ গুলির ইংরিজি প্রতিরূপ। কেবল শরৎচন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধটি 'কালের পুতুল'এ নেই। ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত 'প্রবন্ধ সংকলন' গ্রন্থে অধিকাংশ প্রবন্ধ পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। দু-একটি প্রবন্ধ পত্রিকা থেকে গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থভুক্ত এইসব প্রবন্ধগুলিতে বুদ্ধদেব মূলতঃ আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচার ও প্রসারের কথা বলেছেন। আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, এই কবিরা নতুন সুর এনেছেন। নতুনত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিরাও কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল। ঐতিহাসিক দিক

থেকে একই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও তাঁদের মধ্যে আছে

ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত প্রচুর পার্থক্য।[১৩]

আধুনিক কবিদের অন্তর্গত এই বিরোধ ও বৈচিত্র্য বুদ্ধদেবের প্রবন্ধে প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। আর, প্রতিপাদ্য হয়েছে আধুনিক কবিতার মূল ধারাটিকে বিশেষ ভাবে সনাক্ত করা। অবশ্য, এই আধুনিক কবিতাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকল ভাবে শনাক্ত করা যায়না।[১৪] তিনি আধুনিক কবিতাকে বলেছেন বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, সংশয়, ক্লান্তি ও সন্ধানের কবিতা। আবার,

এর-ই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ,
বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি।[১৫]

- আধুনিক কবিতার এই বহুগামী চরিত্র লক্ষণটি বুদ্ধদেব তাঁর প্রবন্ধে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কখনো বিভিন্ন কবির রচনায়, কখনো একই কবির বিভিন্ন সময়ের রচনার মধ্যে থেকে তিনি আধুনিক কবিতার অন্তর্বীজটির সন্ধান করেছেন। যা প্রায় তাঁর সমকালেই অঙ্কুরিত হয়ে, ক্রমে পত্রে -পুষ্পে বিকশিত হয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীন ও কিছু পূর্ববর্তী আধুনিক বাঙালি কবি ও কবিতা সমালোচনার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার এই তত্ত্ব ও চারিত্র্য স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন।

। ১ ।

বুদ্ধদেব-কৃত আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনায় প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'মাইকেল' নামের প্রবন্ধটির কথা। কেননা, 'মধুসূদন এক অর্থে আমাদের দেশের প্রথম আধুনিক কবি।'[১৬] মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেব একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কবিতা' দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৫৩) 'মাইকেল' নামে তা প্রকাশিত। পরে, সাহিত্যচর্চা গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে প্রবন্ধটি।

মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নেতিবাচক। তাঁর মতে, কবিকর্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন মধুসূদন। আধুনিক পাঠকের পক্ষে তাঁর রচনাবলীর আধিকাংশ প্রায় অপাঠ্য। তাঁর প্রহসন দুটি অনেকটাই তাঁর 'ছেলেমানুষি'।[১৭] 'মেঘনাদবধ' কাব্যটি হয়েছে ছাঁচে-ঢালা, কলে-তৈরী নির্দোষ নিস্প্রাণ সামগ্রী।[১৮] আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও মাইকেলের প্রভাব প্রায় শূন্য মাইকেলের রচনায় প্রথাবিরুদ্ধতা নেই, আছে চিরাচরিত প্রথার একান্ত অনুকরণ। রাম-রাবণ সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবনার বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন নি। রাক্ষস রাবণ, দুশ্চরিত্র রাবণের ধারনা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল এবং এজন্যই 'রাবণ সীতাহরণ করেছিলেন কেন'[১৯] এই প্রশ্ন কাব্যে উত্থাপন করলেন না কবি। রাবণ যেন তার চারিত্রিক অসততার জন্যই ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল। ফলে, প্রবল পরাক্রান্তের মহাসর্বনাশকে কেন্দ্র করে যে ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয়, রাবণ চরিত্রে তাও অনুপস্থিত। মাইকেলের রাবণ চরিত্রে মহৎ সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই।

মাইকেল মধুসূদনকে বুদ্ধদেব বাংলাভাষাতেও দক্ষ শিল্পী বলতে চাননি। আবাল্য মাতৃভাষাকে

অবজ্ঞা করেছেন তিনি। বাংলাসাহিত্যে তাঁর দক্ষতা আকস্মিক ঘটনা। এর সঙ্গে নিরন্তর অনুশীলণের কোনো যোগ নেই। মাইকেলের ভাষাকে তিনি বলেছেন - 'মৃত শব্দরাজিতে আর্কীণ মাধকেলি কলরোল',[২০] যা কেবল কানে বাজে কিন্তু মরমে প্রবেশ করেনা। সার্থক স্রষ্টার মতো কোনো ঐতিহ্যকেও আত্মস্যাৎ করতে পারেন নি মধুসূদন। হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অধিকার করতে না পেরে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন চিরাগত প্রথার অন্ধকূপে। তাই, তাঁর মেঘনাদ, প্রমীলা কিংবা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা কেউ-ই জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যের বীরনারীও চিরাচারিত প্রথার কাছে সমর্পিত-প্রাণ। তাঁরা কেউ-ই নারীত্ব বিষয়ে বিদ্রোহিনী নয়। ব্রজাঙ্গনা কাব্যেও চিরাচরিত প্রেম প্রকৃতি ঘুরে ফিরে এসেছে। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মাইকেল যশের অধিকারী হয়েছিলেন সে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে নবজন্মের যবনিকা উত্তোলন করেছে মাত্র। আসল পালার সূচনা রবীন্দ্রনাথ থেকে। মধুসূদন যদি এই ছন্দের যবনিকা উত্তোলন নাও করতেন, রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার যাত্রা শুরু হতে পারতো। মাইকেলের ছন্দ অত্যন্ত কড়া, কখনো নরম সুরে বাজেনা। এর কোনোখানে গান নেই, সমস্তটা বক্তৃতা। একে তিনি বাংলাসাহিত্যে 'নির্বীজ ঐশ্বর্যের উদাহরণ'[২১] বলেছেন। মাইকেলের জীবন ও সৃষ্টির মধ্যেই তিনি দেখেছেন কেবল অবিমিশ্র অপব্যয়।

মধুসূদন সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমালোচনা প্রসঙ্গে টি.এস. এলিয়ট-এর লেখা Milton সমালোচনার কথা উল্লেখযোগ্য মনে, হয়।[২২] এলিয়ট Milton এর উপর প্রথম যে প্রবন্ধটি লেখেন, অথাৎ Milton-I, তাতে তাঁর বক্তব্য হল মিল্টন কবি হিসেবে বিশেষ উঁচুদরের নন্ এই মত প্রকাশের পর সমালোচক মহল থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ওঠে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে Milton-II, এলিয়েট উল্লেখ করেছিলেন, যে, মিল্টন একেবারে নীচু দরের কবি নন্, কিছু কিছু ভালো imagery তাঁর রচনায় আছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকার করেছিলেন মিল্টন উঁচুদরের কবিই। একুশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন 'ভারতী' পত্রিকায়। পরিণত বয়সে 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪, আষাঢ়) প্রবন্ধে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। মধুসূদনকে অনন্য সাধারণ কবিপ্রতিভার অধিকারী বলতে কুণ্ঠিত হননি। এবং মেঘনাদবধের অসাধারণ শিল্পঋদ্ধির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'মেঘনাদ বধে'র দ্বিতীয় সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এতে তিনি দেখেছেন শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি। আধুনিককালে, মোহিতলাল মজুমদার মধুসূদন সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাঁর 'কবি শ্রী মধুসূদন' গ্রন্থে। মোহিতলাল 'মেঘনাদবধ'কে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একদিকে মধুসূদনের সুগভীর কবিকল্পনা, অন্যদিকে, মানবতাবোধ - মোহিতলালের বিবেচনায়, এই দুটি বস্তুই এই কাব্যের ব্যাপক সাফল্যের হেতুমূল।

> হোমারের মহাকাব্য হইতে তিনি সেই আদিম মানবতার রসপ্রেরণা
> লাভ করিয়াছিলেন। বাঙালি কবি কৃত্তিবাস ও কালিদাসের কাব্য
> হইতে-তিনি সেই মানবতায় অতি সরল ও সহজ রূপ সংগ্রহ
> করিয়াছিলেন। ..... মধুসূদনের কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব আছে।[২৩]

তাঁর বক্তব্য —

> মেঘনাদ বধে'র ভাষায়, যমক অনুপ্রাসের যে প্রাচুর্য প্রায় সর্বত্র আছে,
> তাহার কারণ শুধু শব্দালঙ্কার প্রীতি নয় - অব্যর্থশব্দধ্বনির দ্বারা
> ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টিও তাহার অভিপ্রায়।[২৪]

'মেঘনাদ বধ'- কাব্যের ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা।

> ছন্দে ও বাগবন্ধে, ধ্বনি ও রূপ ব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা
> অনুযায়ী যে বেশ বিন্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার অভ্যস্ত
> রুচি ও রীতি সংস্কার কে অনেকাংশে বর্জন করিতে হইয়াছে,
> ..... তাহার ফলে ভাষা শুধুই ভাষামাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র
> কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে।[২৫]

মোহিতলাল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে মধুসূদন-ই একমাত্র আধুনিক।

> রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়, বাংলাকাব্যে আধুনিকতা অতঃপর যে
> পূর্ণস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার আদি প্রবর্তক মধুসূদন।
> ..... তাহাতেই আধুনিক কাব্যমন্ত্রে বাঙালির প্রথম দীক্ষালাভ হইয়াছিল।[২৬]

অর্থাৎ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পুরোধা ব্যক্তি হিসেবেই তিনি মধুসূদনের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। মধুসূদন সম্পর্কে মোহিতলাল কিংবা বুদ্ধদেব পূর্ববর্তী সমালোচনা থেকেও আমরা জানি যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের অবদান অসামান্য। ফলে, মধুসূদন প্রতিভার মূল্যায়ণে বুদ্ধদেবের 'মাইকেল' প্রবন্ধটি আজ প্রায় গুরুত্বহীন।

। ২ ।

'কালের পুতুল' গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু।

১) প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য (১৯৪১),

২) প্রমথ চৌধুরী (১৯৪৬)[২৭]

'An Acre of Green Grass' এর 'Pramatha Chowdhury' প্রবন্ধটি মূলতঃ এই দুই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ। দুটি প্রবন্ধেই তিনি বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট অবদানের কথা বলেছেন। বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর স্থান নির্নয় করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর দেশবাসী সুবিচার করেনি। জীবিতকালে তাঁর অসাধারন কর্মের তুলনায় প্রতিষ্ঠা তিনি পাননি। মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি উদাসীনতা আরও একবার প্রমাণিত হ'ল। প্রায় আশি বছরের দীর্ঘ জীবন ও সাহিত্যসাধনায় তিনি বাংলাদেশে সমাদৃত হতে পারেননি।

বাংলাসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

গদ্যরচনাা ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর-ই প্রমথচৌধুরীর স্থান। গদ্যের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, অকারণ বিশেষণ প্রয়োগ প্রভৃতির ফলে গদ্যরূপের মধ্যে যে শৈথিল্য অনেক সময় এসে যায়, প্রমথ চৌধুরী সচেতনভাবে সেগুলিকে পরিহার করতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্পে, প্রবন্ধে, বাংলা গদ্যের যে পরিচ্ছন্ন, পরিমিত চেহারাটি রূপলাভ করেছে, তাঁকে অনুকরণ যোগ্য বলেছেন।

> প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আরো ব্যাপক হ'লে বাংলা গদ্যের অন্য
> একটি ধারা আমরা এতদিনে দেখতে পেতাম।[২৮]

বাংলাসাহিত্যে চলিত ভাষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। পরিচ্ছন্ন গদ্য রীতির সঙ্গে অনন্য সাধারণ স্টাইলের মেলবন্ধন ঘটালেন তিনি।

প্রমথ চৌধুরী অনুকরণযোগ্য লেখক হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি পাঠক তাঁকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেনি। 'সবুজ পত্র' এবং 'সবুজপত্র' -পরবর্তী অনেক লেখক প্রথম চৌধুরীর রচনা দ্বারা প্রভাবিত। প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না হয়েও অনেকে প্রমথ ভজনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই অসামানয ব্যক্তিত্বের কাচে ঋণ স্বীকার করেছেন।

> One feels that pramatha chowdhury is an alien in Rabindra nath's
> world, whereas Rabindra nath has free acess to pramathean
> drawing - room : he visits, dines and lingers, but does not stay. .....
> But to the last day, his respect for pramatha chawdhuri's intellect
> remained undiminished[২৯]

প্রমথ চৌধুরীর জগতে মানব স্বভাবের কৃত্রিম খণ্ডীকরণের স্থান নেই।[৩০] প্রমথ চৌধুরী এরকম এক অবিচল চরিত্র যে, তিনি স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ। পাঠক সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির উপরে এই নিরপেক্ষ শিল্পীর প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে না। Boris pasternak তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "Doctor zivago" তে লিখেছিলেন -

> Gregoriousness is always the refuge of mediocrities, ...
> Only individual seek the truth and they shun those whose sole
> concern is not the truth.[৩১]

অর্থ্যাৎ মূখবদ্ধতা মধ্যবর্তীর আশ্রয়। শিল্পের পথে প্রমথ চৌধুরী একলা-পথিক।

প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই সমালোচনা অনেকটা রবীন্দ্র দৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরীর অনুরূপ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রমথ চৌধুরী বিষয়ক আলাদা কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। চিঠিপত্র ৫ম খণ্ডে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিপত্রে তাঁর প্রমথ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথ চৌধুরীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যে ঋণস্বীকার করেছেন বুদ্ধদেবের এই বক্তব্যের প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -

> আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া

যেতে পারে। ... একজনের নাম খুব বড় করে আমার মনে পড়ে,
তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথের নাম আমার বিশেষ করে মনে
আসার কারন এই যে আমি তাঁর কাছে ঋণী।[৩২]

এছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থের ৪৫নং কবিতা প্রমথ চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন। 'ঘরে-বাইরে' উৎসর্গ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরীকে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রমথ চৌধুরীর শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন তাঁর পরিচয় ফুটে উঠেছে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি পত্রে -

... বিষয়কে সহজ করা, উপাদেয় করা অথচ পুষ্টিকর অংশে
কৃপণতা না করা, এ প্রমথ ছাড়া আর কারো দ্বারা হতে পারে না।[৩৩]
"তোমার কবিতার যে গুণ তোমার গদ্যেও তাই দেখি কোথাও ফাঁক
নেই এবং শৈথিল্য নেই, একেবারে ঠাসবুনানি। ..... তোমার
গদ্যরচনারীতির মধ্যে যে নৈপুন্য আছে আমাদের দেশের পাঠকেরা
তার পুরো দাম দিতে প্রস্তুত নয়।[৩৪]

দুটি চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিশিষ্টতার কথা বলেছেন। এবং তিনি মনে করেন পাঠকসমাজে প্রমথ চৌধুরী যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হতে পারছেন না, লেখক পাঠকের মধ্যে যে নিবিড় যোগ সৃষ্টি হচ্ছে না, তার মূলে লেখকের ত্রুটি নেই, আছে পাঠকের অনগ্রসরতা। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্যও অনেকটা এরকম। বুদ্ধদেবও লিখেছেন -

সেই অবিচল চরিত্রে যে সব লেখকের প্রতিষ্ঠা, যাঁরা পাঠক সংখ্যার
হ্রাস বৃদ্ধির উর্দ্ধে, প্রমথ চৌধুরী সেই বরণীয়দের অন্যতম।[৩৫]

রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির কথা বাদ দিলে বুদ্ধদেব বসুই প্রথম প্রমথ চৌধুরী'র সমালোচনা করে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন একথা বলা যায়। প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর খ্যাতি এবং কীর্তি সুমাত্রা সূত্রে আবদ্ধ নয় বলে আক্ষেপ করেছেন। বুদ্ধদেব বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য লেখকদের তুলনায় প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্বের, প্রতি এবং তাঁর ব্যতিক্রমী চারিত্র্যের প্রতি আলোকপাত করেছেন। সাহিত্যশিল্পী হিসেবে তিনিও যে যথেষ্ট মর্যদা পেতে পারেন সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

। ৩ ।

'কালের পুতুল' প্রবন্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ বিষয়ক মোট তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ক) জীবনানন্দ দাশ ঃ ধূসরপাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) খ) জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন (১৯৪৩), গ) জীবনানন্দ দাশের স্মরণে (১৯৫৫)।

'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে' প্রবন্ধটি 'কালের পুতুলে'র ১ম সংস্করণে (১৯৪৬) ছিলোনা, 'কালের

পুতুলে'র নতুন সংস্করণে (১৯৫৮) এটি যুক্ত করা হয়েছে। নতুন সংস্করণের ভূমিকায় বুদ্ধদেব নিজেই একথা উল্লেখ করছেন। এছাড়া, 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। কেননা, এই সম্পাদকীয় বক্তব্যের কিছুটা অংশ মূলতঃ বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ-সমালোচনা। কালানুক্রমিক দিক থেকে "জীবনানন্দ দাশের স্মরণে" প্রবন্ধটি সবশেষে লেখা হয়েছে, জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে ১৯৫৫ সালে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রবন্ধটিকেই আমি প্রথমে নিলাম। কারণ এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব জীবনানন্দের স্মৃতি-তর্পণ করতে গিয়ে এমন সব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, যা তাঁর সমালোচক জীবনের সূত্রপাত হিসেবে চিহ্নিত হ'তে পারে। অন্যদিকে, পাঠকের সঙ্গে জীবনানন্দকে সামগ্রিক ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রবন্ধটির শুরুতেই বুদ্ধদেব জানিয়েছেন যে, কল্লোল পত্রিকায় 'নীলিমা' কবিতাটি লিখে জীবনানন্দ দাশ স্মরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। 'কল্লোলে' প্রকাশিত ঐ কবিতায় এমন একটা সুর ছিলো যার জন্যে লেখককে ভুলতে পারা যায়নি। এরপর বুদ্ধদেব তাঁকে 'প্রগতি' পত্রিকায় আমন্ত্রণ জায়িয়েছেন। এবং তখন থেকে একের পর এক কবিতা লিখে জীবনানন্দ এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছেন। সমালোচক হিসবে বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকেই জীবনানন্দের এই স্বতন্ত্র জগৎ, অভিনব কবি কল্পনা বা জীবনানন্দের অদ্ভুত জগতের রূপ-ছবির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় পরিয়ে দিতে চেয়েছেন। 'প্রগতি'তে এইসব কবিতা প্রকাশকরা ছাড়াও নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও তিনি লক্ষ্য রাখতেন। প্রচারের ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতাও ছিলো। বিশেষ করে জীবনানন্দ ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। কিন্তু নীরব, 'নির্জন' কবি প্রতিবাদে ছিলেন নিঃশব্দ। জীবনানন্দ তাঁর কবি জীবনের সূচনা থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত নিন্দুকের নিন্দাবাণে জর্জরিত হয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় বক্তব্যে এইসব আক্রমণ প্রতিবোধের চেষ্টা করেছেন।

জীবনানন্দ সমালোচনায় বুদ্ধদেব তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপিত করেছেন —

ক) জীবনানন্দ বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন।

খ) তিনি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমান্টিক।

গ) তিনি বাংলাকাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একক বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল এবং এই উদ্‌ভ্রান্ত বিশৃঙ্খল যুগে 'ধ্যানী কবি'[৩৬] তিনি।

ঘ) জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির কবি এবং প্রকৃত কবি।

ঙ) বাংলা কাব্যধারায় জীবনানন্দ সুরের নতুনত্ব আনলেন।

চ) রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পষ্ট প্রভাব নেই জীবনানন্দে। বরং, শেলী, কীট্‌স, সুইনবার্ন ও প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের প্রভাবের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

ছ) তাঁর কবিতায় নির্জনতা যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে এক সম্পূর্ন রূপকথা - জগতের প্রতিবেশ।

জ) আমাদের ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল জীবনের এক আদিম বেদনা জীবনানন্দের কাব্যের ভিত্তি চরনা করেছে।

ঝ) জীবনানন্দের কাব্যে আছে অজস্র চিত্র রচনার বিশেষত্ব, উপমা, কল্পনা ও ইঙ্গিত প্রকাশ করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া।

ঞ) আধ্যাত্মিকতার বদলে আছে 'শারীরিক তথা অবয়ব সংক্রান্ত' বিষয়ের প্রাধাণ্য।

ট) বৌদ্ধিক চেতনার বদলে ইন্দ্রিয়পরতা বেশি এসেছে।

ঠ) ছন্দকে ইচ্ছেমতো ভেঙে ভেঙে, বাঁকিয়ে - চুরিয়ে, নিজের উপলব্ধির বাহন করেছেন কবি।

ড) জীবনানন্দের কবিতার আশ্চর্য ধ্বনিময়তা কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

ঢ) নাম শব্দ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহারেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল।

জীবনানন্দের, কবিতার মধ্যে বুদ্ধদেব শুনেছেন এক আশ্চর্য নতুন সুর - 'জলের মতো ঘুরে - ঘুরে একা কথা কওয়া।'[৩৭] ঘুর্ণায়মান জল স্রোতের মতোই সেই সুর ছড়িয়ে পড়ে, কানে এসে বাজে, মর্মে প্রবেশ করে। অনুভব - বেদ্য, মর্মগ্রাহ্য এই সুরের মধ্যে বুদ্ধদেব খাঁটি কবিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৪৩ সালে লেখা 'জীবনানন্দ দাশ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি, প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন জীবনানন্দের নির্জনতা। আধুনিক বাংলাকাব্যে এই বিশিষ্ট্য বিশেষ মাত্রা পেয়েছে জীবনানন্দে। আধুনিক বাংলাকাব্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটির উপর বুদ্ধদেব আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, জীবনানন্দ কে বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের আলোচনা চলতে পারেনা। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য রচনায় এক 'বিষন্ন গাম্ভীর্য, লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব। তিনি যে 'নির্জনতম' কবি, একথা বুদ্ধদেবই প্রথম বলেছেন। আধুনিক কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থাকলেও এই আন্দোলন কবিকে স্পর্শ করেনি। এতে কবির আত্মকেন্দ্রিকতা স্পষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু, এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় এক আত্মনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন চরিত্রবান কবিকে। এই কবিত্ব বুদ্ধদেব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন "বনলতা সেন" কাব্য গ্রন্থে। ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে -

> আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই যে
> একজন চিরকালের কবিকে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার
> দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই ... সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে
> কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।[৩৮]

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৪২ সালে। ১৯৪৩-এ বুদ্ধদেব লিখলেন "জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতাসেন" প্রবন্ধটি। এরপরে জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী')১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮), বেরিয়েছে। আরও পরে, 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৩৫০) লিখিত হয়েছে। কিন্তু, ১৯৪৬ সাল নাগাদ - যখন 'মহাপৃথিবী' বেরিয়ে গেছে, 'সাতটি তারার তিমির'এর কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে - 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার সম্পাদকীয় বক্তব্যে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা হ'য়ে গেলো অন্যরকম। তিনি সেখানে বললেন -

> জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল ? ... জীবনানন্দ দাশ
> আমাদের নির্জনতম স্বভাবের কবি। এই নির্জনতার বিশিষ্টতাই তাঁর

প্রাক্তন রচনাকে দীপ্যমাণ করেছিলো। মনে মনে এখনো তিনি
নির্জনের নির্ঝর, তাঁর চিত্ততন্ত্রী এখনো স্বপ্নের অনুকম্পায়ী।
কিন্তু, পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট, কুখ্যাত আইভরি টাওয়ারের
নির্লজ্জ অধিবাসী, সেইজন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক
রচনার বিষয়ীভূত ক'রে তিনি এই টেই প্রামণ করবার প্রাণান্তকর
চেষ্টা করছেন যে তিনি 'পেছিয়ে' পড়েননি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়।
এর ফলে তাঁর প্রতিশ্রুত ভক্তের চক্ষেও তাঁর কবিতার সম্মুখীন
হওয়া সহজ আর নেই। দুর্বোধ ব'লে আপত্তি নয় ; নিঃসুর ব'লে
আপত্তি, নিঃস্বাদ ব'লে।[৩৯]

বাস্তবিক্, এই পর্বে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা গেলো। কবিতার বিষয় হিসেবে উঠে এলো ইতিহাস, সমাজ, সামাজিকতা। বুদ্ধদেব যেন জীবনানন্দের এই ধারার কবিতা গুলিকে মানতে পারছেন না। তাঁর রুচির কাছে এগুলির অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ। উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও বুদ্ধদেব এখানে খানিকটা যেন সীমাবদ্ধ। জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। আসলে, শুদ্ধশিল্পবাদী বুদ্ধদেব শিল্পীর সামিাজিক দায়বদ্ধতা মেনে নিতে পারেননি। তিনি নিজে অবশ্য একসময় প্রগতি লেখক সংঘে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয়।

১৯৩৮ সালে কলকাতার আশুতোষ হলে নিখিলভারত প্রগতি লেখক
সংঘের যখন সম্মেলন হয়, তার সভাপতি মণ্ডলীতে .... বাঙালী
কবিদের মধ্যে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু।[৪০]

১৯৪২ সাল নাগাদ প্রগতি লেখক সংঘের কার্যকলাপ নানাভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এর পর, বুদ্ধদেবের সঙ্গে এই সংঘের যোগ ছিল কি-না সেখবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের জগৎ যে পাল্টে গেলো তা বোঝা যায়। কেননা, কবি এবং কবিতার প্রতি তাঁর প্রত্যাশার চেহারা ভিন্ন হয়ে গেলো ততদিনে। ১৯৪২ সালে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো '২২শে শ্রাবণ' নামে এক পয়সায় একটি সিরিজের একটি পুস্তিকা। এর প্রথম কবিতাটি ছিলো - 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', লিখেছেন - বুদ্ধদেব বসু। একে, ভাবনা-চিন্তার দিক থেকে বেশ প্রগতিশীল বলেছেন নরেশ গুহ।[৪১] 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম সংস্করণে কবিতাটিকে স্থান দিয়েছিলেন কবি। কিন্তু, দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কবিতাটিকে তিনি নিঃশব্দে বর্জন করেছেন। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র দে'জ সংস্করণের সম্পাদনা করেছেন নরেশ গুহ। এতে তিনি যে নতুন দশটি কবিতা নির্বাচিত করেছেন তার মধ্যে দুটি হ'ল 'যামিনী রায় কে' এবং ''রবীন্দ্রনাথের প্রতি''। নরেশ গুহ লিখেছেন -

.... কবিতা দুটি একটু আলাদা জাতের রচনা। সতর্ক পাঠক লক্ষ
করবেন, এদের মধ্যে সমাজচেতনার মতো একধরনের সাময়িক

প্রবণতার ছাপ আছে, যেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বুদ্ধদেব বসুকেও
ক্ষণিকের জনয নাড়া দিয়েছিলো।[৪২]

এই সমাজ-চেতনা যে "ক্ষনিকের জন্য"ই বুদ্ধদেবকে নাড়া দিয়েছিলো, একথা ঠিক। কেননা, ১৯৪২ পরবর্তী কোনো রচনায় আর তাঁর এই চেতনায় পরিচয় পরিস্ফুট হয়নি। বরং এর পরে দেখি, তিনি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতার বিশ্বাস সমপূর্ণ খারিজ করে দিয়ে 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতা লিখলেন ১৯৫৫ সালে। সেখানে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে ছিলেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আশার বাণী শুনিয়েছেন কি শোনান নি, সেটা তাঁর বড় পরিচয় নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ নিরিবিলিতে আরো অন্য কথা বলেছেন তাঁর কবিতায় যার অনুরণন কখনো থামবে না।[৪৩] কবিতা ও শিল্প বিষয়ে তাঁর এই ধারনার জন্যই হয়তো জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতাকে বুদ্ধদেব মেনে নিতে পারেন নি।

জীবনানন্দের একজন বিশিষ্ট সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তিনি 'কবি জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে জীবনানন্দের আলোচনা করেছেন। এর আগে 'নিরুক্ত', 'পূর্বাশা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর জীবনানন্দ বিষয়ক সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি কিন্তু জীবনানন্দের কবিতার কোনো বিশেষ পর্বের অনুরাগী ছিলেন না। বরং তাঁর সমগ্র কাব্য-পর্ব স্বতন্ত্র আবেদন নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর কাছে। আর জীবনানন্দের কবিতার যে সমালোচনা বুদ্ধদেব করেছেন, সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের নিজের বক্তব্য -

আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি 'প্রগতি'তে
এবং পরে 'কবিতা'য় প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে 'বনলতা সেন'-এর
পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও
পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।[৪৪]

এখনেই জীবনানন্দ লিখেছেন -

'নিরুক্ত' ও 'পূর্বাশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার
শেষের দিকের কবিতায় আমার পরিপার্শ্বিক চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ
করেছে।[৪৫]

আসলে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি যে একদিন 'সাতটি তারার তিমির' পার হয়ে "বেলা - অবেলা কালবেলা'র পথ বেয়ে 'শত জল ঝর্ণার ধ্বনি'[৪৬] শুনে ছিলেন, সেই পর্বে জীবনানন্দের কবিতার আস্বাদনে বুদ্ধদেব অনুপস্থিত। 'সাতটি তারার তিমির' প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু কবিতাগুলি লেখা হচ্ছিল অনেকদিন ধরে। যখন চারপাশে যুদ্ধ - দক্ষির-পূর্ব এশিয়ার উপনিবেশগুলি ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, যখন এশিয়ায় অগণন শকুন উড্ডীন ও লোভাতুর, তখন জীবনানন্দের কবিতায় বারে বারে ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা, বালি, হঙকঙ, সাংহাই প্রভৃতির উল্লেখ অকরণ নয় মোটে। তবে, 'কবিতা'র (১৩৫৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা) সম্পাদকীয় মন্তব্যটুকু বাদ দিলে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা হয়েছে সম্পূর্ণ ইতিবাচক। একজন কবিকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে, কবি-জীবনের শুরুতে কবিকে চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে, - 'বনলতা সেনে'র পরিণত কবির সঠিক মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সমালোচক বুদ্ধদেব যে অসীম দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতেই হয়।

। ৪ ।

বাংলাকাব্যে বিশশতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক নাগাদ রবীন্দ্র বলয় অতিক্রম করে কবিতা লেখায় সচেষ্ট হয়েছিলেন একদল তরুণ কবি। এই তরুণ কবি-দলে মোহিতলাল, নজরুলের সঙ্গে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। এই তিন কবিই নতুন সুর শোনলেন বাংলা কাব্যে। এবং যতীন্দ্রনাথে এই নতুনত্ব দেখা দিল একটু ভিন্নভাবে। সেই সময় তিনি আমাদের অভিনিবেশ দাবি করলেন প্রায় উল্টো রকমের সুর শুনিয়ে।[৪৬] এই সুরকে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন -

> সহজ, টাটকা, আটপৌরে।[৪৭]

রুক্ষ, ধুসর জীবনের যে অপূর্ব কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন, 'মরীচিকা' (১৩৩০), 'মরুশিখা' (১৩৩৪), 'মরুমায়া' (১৩৩৭) -এ জাতীয় কাব্য-নামে তার ব্যঞ্জনা গভীরতর রূপে প্রকাশ পেয়েছিলো।

কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে কী দিয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে উত্তরসূরী কবিকুল কী পেলেন, মেটেকথা, বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান কী—এর একটা সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ করেছেন বুদ্ধদেব। লিখেছেন — উত্তরসূরী কবিদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন,

> আবেগের রুদ্ধশ্বাস জগৎথেকে নেমে এসেও কবিতা বেঁচে থাকতে পারে।[৪৮]

কবিতার প্রকরণ বিষয়েও উত্তরসূরী কবির কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন যতীন্দ্রনাথ।

> পরিশীলিত ভাষা ও সুবিন্যস্ত ছন্দের বাইরে চলে এলেও কবিতার
> জাত যায় না।[৪৯]

শুধু ভাষা ও ছন্দই নয় নতুনত্ব ছিল তাঁর কবিতার পংক্তিতেও।

> এক একটি আলো-জ্বলা, রেশ-তোলা পংক্তি।[৫০]

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। রবীন্দ্র জীবনাদর্শ থেক তা ভিন্ন, ভিন্ন মোহিতলাল থেকেও। বুদ্ধদেব তাতে প্রথম দেখেছেন ব্যঙ্গোক্তি, সংশয়, নেতিবাদ। মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার অচল অনড় ভিত্তি নড়ে উঠলো। কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথের চিন্তা চেতনা রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্নতর হলো। সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হল, তা রূপের দিক থেকে ভাবের দিক থেকে নয়। আর সেই প্রভাবও ক্ষণিক এবং অদূরস্পর্শী। তথাপি তিনি প্রশংসনীয় 'রবীন্দ্রনাথের মতো' লিখতেন না বলে। এটি সেই সময়ের বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি প্রধান ঘটনা।

যতীন্দ্রনাথের সম্পর্কে বুদ্ধদেবের যাবতীয় বক্তব্য মেনে নিয়েও একথা বলতেই হবে, যে, একজন কবির পক্ষে শুধুমাত্র রবীন্দ্র-বলয় অতিক্রম করাই একমাত্র লক্ষ্য, এরকম ভাবলে কবির বিশেষত্বকেই খর্ব করা হয়। কবির বক্তব্য আসলে, সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত থেকে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের শুভ ও মঙ্গলবোধের ধারনা কিছুতে নষ্ট হয় না। কিন্তু, যতীন্দ্রনাথের তাতেই সন্দেহ হ'ল। রবীন্দ্রনাথও দুঃখকে অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর চোখে দুঃখ শেষ পর্যন্ত আনন্দলাভের একটা অপরিহার্য ধাপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দরূপ খুঁজেছেন, সেখানে

প্রথম কাব্য 'মরীচিকায়' (১৯২৩) যতীন্দ্রনাথ খুঁজে চলেছেন 'দুঃখের রুদ্রমূর্ত্তি'।[৫১]

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বব্যাপী অমৃতত্ত্বের কথা বললেন, যতীন্দ্রনাথ তাতেই দেখলেন সর্বব্যাপী দুঃখ। এই বিশিষ্টতাই যতীন্দ্রনাথকে কবি হিসেবে স্বতন্ত্র করে তোলে। বুদ্ধদেবের আগে যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর প্রবন্ধটি 'কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', ১৩৫৪ সালে লেখা।[৫২] যতীন্দ্রনাথ সমালোচনায় এই দুই কবি সমালোচকের সদৃশ্য আছে, পার্থক্য ও আছে। যতীন্দ্রনাথের ভাষা প্রসঙ্গে মোহিতলাল লিখেছেন —

> ভাষার সকল রীতিকে লংঘন করিয়াই, এই যে একটি অনবদ্য
> বাক্‌ভঙ্গীর সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ঐ এক কবির কবিপ্রাণের ভাষা -
> আর কোনো কবির সাধারণ কবিতার ভাষা উহা নহে।[৫৩]

যতীন্দ্রনাথের উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে মোহিতলাল লিখেছেন -

> .... উপমা ও দৃষ্টান্তের অব্যর্থতা, সময়ে সময়ে কাব্যরসকেও
> অতিক্রম করিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত ও চমকিত করে।[৫৪]

ভাষা, চিত্রকল্প বিষয়ে বুদ্ধদেবের বক্তব্যও অনেকটা মোহিতলালের অনুসারী। তবে, মোহিতলালের সমালোচনার সঙ্গে পার্থক্য এসেছে অন্য দিক থেকে। বুদ্ধদেব যতীন্দ্রনাথের কবিতায় যে সংশয় ও নেতিবাদ লক্ষ্য করেছেন, মোহিতলাল তাঁর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবুদ্ধি। যতীন্দ্রনাথের অস্তিক্যবাদের কথা দ্বর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় —

> .... এই মরুচারী কবি দুঃখ, বেদনা, বিষন্নতা ও নৈরাশ্য নিয়েই
> স্বগতোক্তি করেননি। সর্বোপরি যতীন্দ্র নাথ ছিলেন সৌন্দর্যরসিক ও
> ঈশ্বর-চেতনায় দৃঢ়বিশ্বাসী মানবতাবাদী কবি।[৫৫]

মোহিতলালের সঙ্গে বুদ্ধদেবের সমালোচনার পার্থক্য থাকলেও এই দুই কবি সমালোচকই রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় যতীন্দ্রনাথের স্থান নির্ণয় করেছেন। এবং তাঁদের বক্তব্য মূলতঃ ইতিবাচক।

। ৫ ।

'An Acre of Green Grass' -এর ইংজেরী প্রবন্ধটি বাদে নজরুল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু একটিমাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটি ১৯৪৪ সালে লেখা। পরে "কালের পুতুল" প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে কবি নজরুলের কবিত্বশক্তি, বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান, তাঁর বিশেষত্ব, সঙ্গীতে তাঁর অবদান ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে নজরুলের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ তুলে ধরেছেন তিনি।

দেশজোড়া এক অস্থির আবর্তের মধ্যে নজরুল আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যে। গান্ধীজী অসহযোগ করছেন। জাতীয় আন্দোলন তখন তুঙ্গে। দেশবাসীও এই আন্দোলনে প্রবলভাবে সাড়া দিচ্ছে। নজরুলের কবিতা সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন — অসহযেগের অগ্নিদীক্ষার পর সমস্ত মনপ্রাণ

যা কামনা করছিলো, এ যেন তাই, দেশব্যাপী উদ্দীপনার এই হল বাণী।[৫৬] নজরুলের কবিতা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হ'লে

তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিল।[৫৭]

দেশ ও দেশবাসীর উদ্দীপনাকে কবিতায় বাণীবদ্ধ করে নজরুল খুব তাড়াতাড়ি বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এত অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোনো কবি হননি। কবি হিসেবে তিনি 'জাত বোহেমিয়ান'।[৫৮] এলোমেলো, বিশৃঙ্খলা ও বেনিয়মের মাঝে তিনি কবিতা লিখতেন, গান গাইতেন। নজরুল তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে নজরুল সবচেয়ে বড় কবি। সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিল তাঁর কবিতায়। তা সত্ত্বেও, তাঁর স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। অতি অল্প সময়ে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করছেন তিনি। এই লোকপ্রিয়তার কারন তিনি চড়া গলায় কবি। 'An Acre of Green Grass'-এর ইংরেজী প্রবন্ধটিতে ও বলেছেন -

Nazrul I repeat, is a loud poet; his poetry is boisterous.[৫৯]

এই বিশেষত্বের জন্য ইংরেজী সাহিত্যের কিপলিং-এর সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। কিপলিঙের মতো তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন।

নজরুলের রচনার কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর লেখা কখনও ফাঁকা আওয়াজ সর্বস্ব হয়েছে। অনেক সময় এর মধ্যে কবিত্বশক্তিরও অভাব ঘটেছে। প্রেমের বা প্রকৃতির বিষয়ে কবিতায় এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে। একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবালুতায় আবিল, "অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে রুদ্ধস্রোত।"[৬০] গদ্যলেখক হয়ে জন্মান নি নজরুল। গদ্যে তাঁর অতিমুখর মনের অসংযত বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচনার আর একটি প্রধান ত্রুটি হল অদম্য স্বতস্ফুর্ততা। এই স্বর্তঃ স্ফুর্ততা তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি।

যা কিছু তিনি লিখেছেন, লিখেছেন দ্রুতবেগে ; ভাবতে বুঝতে
সংশোধন করতে কখনো তিনি থামেন নি, কোথায় থামতে হবে
দিশে পান নি।[৬১]

তাঁর কবিত্বশক্তিতে আছে পরিমিতিবোধের অভাব। তাঁর রচনার উদ্দাম বেগ দুর্দমনীয় গতি সঠিক মাত্রায় রূপায়িত হয়নি। এদিক থেকে বায় রণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ধরা পড়ে। তাঁর লেখার মধ্যে পরিণতির কোনো ইতিহাস নেই।

প্রতিভাবান বালকের মতো লিখেছেন তিনি।[৬২]

তাঁর প্রতিভা ছিল, সম্পদ ছিল, কিন্তু সাহিতয কর্মে সে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার নেই।

সঙ্গীত শিল্পী নজরুলের মূল্যায়ণও করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে, নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়ীত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাঁর গানের। স্বদেশী গান তথা বীরত্বব্যঞ্জক গানের ক্ষেত্রে

রবীন্দ্রনাথের পরেই নজরুলের স্থান। সংগীত রচয়িতা নজরুলের প্রশংসা করলেও একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছেন বুদ্ধদেব। ত্রুটিটি হল — 'দুরতিক্রম্য রুচির দোষ।'[৬৩]

নজরুল প্রতিভার মূল্যায়ণে বুদ্ধদেব তাঁকে কবি ও সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর গানের সম্ভার অল্প হলেও তা অক্ষয়। বাংলা কবিতার ইতিহাসেও তাঁর আসন স্থায়ী। কেননা, তাঁর কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। 'ধুমকেতু' সম্পাদক নজরুলকে আশীর্বাদ করেছিলেন।[৬৪] রবীন্দ্রবলয় থেকে যে শক্তিতে নজরুল বেড়িয়ে এসেছিলেন সেই শক্তিমানকে কবিগুরু অভিনন্দন জানিয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদারও নজরুলের গুণগ্রাহী ছিলেন। কবি নজরুল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন -

> বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ
> অনুভব করিনাই .....।[৬৫]

বুদ্ধদেব-পূর্ববতী রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের বক্তব্যের সঙ্গে বুদ্ধদেব অনেকটাই একমত। তবে বুদ্ধদেব যত বিস্তৃতভাবে সমালোচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে নজরুলের স্থান নির্নয় করেছেন তেমনটি রবীন্দ্রনাথ, এমনকি মোহিতলালও করেননি।

। ৬ ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেব মোট পাঁচটি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থে আছে তিনটি —

ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫)

খ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী (১৯৩৭)

গ) সুধীন্দ্রনাথ দেত্তর কবিতা (১৯৪৫)

এছাড়া, 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে আছে -

ক) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৬০) - প্রবন্ধ । সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লেখা এটি। প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকয় 'কবির মৃত্যু' এই শিরোনামে প্রকাশিতও হয়েছিলো ১৯৬০ সালের ২৫শে জুন সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই প্রবন্ধটির রচনাকালও ১৯৬০। এই গ্রন্থেই আছে আর একটি প্রবন্ধ 'সুধীন্দ্র দত্ত ঃ কবি' (১৯৬০)। এটি মূলতঃ - নাভানা কর্তৃক প্রকাশিত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহে ভূমিকা। প্রথম দুটি প্রবন্ধে কবি হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের সাধারণ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব। তাছাড়া, 'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী' তে সুধীন্দ্রনাথের কবিসত্তার বিশেষ পরিচয় প্রসঙ্গে দুটি কাব্যের মূল্যায়ণ করেছেন তিনি। তৃতীয় প্রবন্ধে তিনি সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেষ্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী'র মধ্যে এক অন্তর্নিহিত যোগসূত্রের কথা বলেছেন। এবং সামগ্রিকভাবে কবি সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে লেখা 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' (১৯৬০) প্রবন্ধে কবি সুধীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, ব্যক্তিত্বও প্রতিভা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া, সমকালীন দুই কবি জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথের পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেবের মূল বক্তব্য এরকম — সুধীন্দ্রনাথ বুদ্ধিনির্ভর কবি। গীতিকবিতার সহজ স্ফূর্ত্তি নেই তাঁর রচনায়। তাঁর শব্দ ব্যবহার শিক্ষিত ও যথাযথ। চিন্তা ও যত্নপ্রসূত। সংস্কৃতে যাকে বলা হ'তো 'শাস্ত্র কবি'[৬৬] তাঁকে তাই বলতে ইচ্ছে করে। কবিতাকে জটিল ও দুর্গম করেন তিনি। ভাষাকে নানা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দে ও পরিভাষায় আকীর্ন করে তোলেন। তাঁর রচনাবিন্যাসে অন্যমনস্কতার কোনো স্থান নেই। তাঁর কাব্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা ও দেহবিলাসিতা আছে। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে মোহিতলালের তুলনা চলে। অবিরত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, মননশীলতার জন্য তাঁকে 'বীরকবি'[৬৭] বলাযায়। তিনি 'স্বভাব কবি নন্, স্বাভাবিক কবি'।[৬৮] কবিত্বশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি নিয়ন্তর পরিশ্রম করেছেন। বাংলাভাষায় কবিতার পংক্তি ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষণ করে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিতেন। তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুত নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেঅগ্রসর হননি।

সুধীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব তাঁর প্রাকরণিক দক্ষতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর ধারনায় যথেষ্ট স্পষ্টতা ছিল। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তাঁর শূন্যস্থান অপূরনীয়। 'অর্কেষ্টা' কাব্যে তিনি 'কবি যতটা, কারিগর ঢের বেশি।'[৬৯] ছন্দের নিখুঁত ব্যবহার ও আঠারো মাত্রার পয়ার নিয়ে তাঁর দুঃসাহসী পরীক্ষা বিস্ময়কর। তাঁর 'অকেষ্টা' কাব্যের তুলনায় "ক্রন্দসী" আরও পরিণত। তিনি আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যগের শ্রেষ্ঠ কবি।[৭০] কাব্যাদর্শের দিক থেকে তিনি রোমান্টিক এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক।[৭১] তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ।[৭২] অল্পমাত্র আয়াষে সে দুরূহতা অতিক্রম করা যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান দুই কবি সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ। এই দুই কবির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

> একদিকে স্বজ্ঞা ও সুতীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয় ও আর একদিকে সুতীক্ষ্ণ মেধা
> ও জগতের সংস্কৃতি।[৭৩]

দুই কবির মধ্যে মেরুপ্রমাণ পার্থক্য থাকলেও আধুনিক মানুষের অন্তর্গত চৈতণ্যের দ্বন্দ্বে দুজন-ই ক্ষতবিক্ষত দুজন-ই শেষ পর্যন্ত অন্ধকার থেকে আলোয় পথ খুঁজেছেন।

সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বুদ্ধদেব মূলতঃ সুধীন্দ্রনাথের ইতিবাচক সমালোচনা করলেও কিছু সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কবিতার গম্ভীর ধ্বনিগৌরব সত্ত্বেও পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অভিভূত হওয়া যায়না। প্রতি পংক্তির অর্থগ্রহণের জন্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে রাখতে হয়। তাই সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আর পাঠকের উপভোগের মধ্যে একটা ব্যবধান থেকেই যায়। যে জাদুতে কবিতার বাক্য মন্ত্রের মতো ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে, যাতে জীবনের কোনো গূঢ় প্রদেশ উদভাসিত হয় বাক্যের সেই 'ঐন্দ্রজালিক সাধনার পথে'[৭৪] তিনি চলেন না।

কবি সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথও। অবশ্য, পৃথক কোনো প্রবন্ধ লেখেননি তিনি। সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং বুদ্ধদেবকে লেখা চিঠি পত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। সুধীন্দ্রনাথের "স্বগত" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর ১১-ই এপ্রিল, ১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্ত্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি —

> সুধীন্দ্রের লেখা দুরূহ এ বাণীর সুর অনবধানে চড়ে যাচ্ছে।
> তাহলেও সংস্কারাটয় একেবারেই মূল নেই এও বলতে পারিনে।[৭৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সুধীন্দ্রনাথের ভাষাকে যাঁরা 'দুরূহ' বলেন তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে একমত হ'তে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁদের মতকে উড়িয়েও দিতে চাননি। তিনি সুধীন্দ্রনাথকে 'মনন-বিলাসী'[৭৬] কবি বলেছেন। ১৯৩৯ সালে অমিয় চক্রবর্ত্তী কে লেখা চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন, তা বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে পৃথক, এমন বলা যায় না। তাছাড়া, বুদ্ধদেবের "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেষ্টা" প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে ১৯৩৫ সালে। যেখানে তিনি সুধীন্দ্রনাথকে 'বুদ্ধিনির্ভর'[৭৭] কবি বলেছেন। তাঁর "সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী" ১৯৩৭- সালে লেখা। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্রে সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা করলেও একথা বলা যেতে পারে যে, সুধীন্দ্রনাথের মূল্যায়ণে বুদ্ধদেবের প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ন।

। ৭ ।

অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাব্য বিষয়ে বুদ্ধদেব তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'কালের পুতুল' গ্রন্থে।

ক) 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ খসড়া' (১৯৩৮)

খ) 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ একমুঠো' (১৯৪০)

এবং গ) 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল' (১৯৫৫)

প্রথম দুটি পুস্তক সমালোচনা। তৃতীয় রচনাটিতে আছে কবি অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাব্যের সামগ্রিক সমালোচনা। তাঁর কাব্যের পালাবদল ; এক-একটি মোড়-ফেরা, রূপান্তর - বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। প্রথম প্রবন্ধেই 'খসড়া'র কবিকে 'আধুনিক কবিদের অন্যতম'[৭৮] বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। 'একমুঠো' প্রকাশিত হলে, একে বুদ্ধদেব 'খসড়া'র 'দ্বিতীয় অধ্যায়'[৭৯] বলেছেন। তৃতীয় প্রবন্ধ 'অয়িম চক্রবর্ত্তীর পালাবদল' - নামটি-ই তাৎপর্যপূর্ণ। অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবি স্বভাবের পর্বে পর্বে যে রূপান্তর ঘটে গেছে, যে ভাবগত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেচে, সেই চলমান কবিস্বভাবের একটি স্থিরচিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। অমিয় চক্রবর্ত্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'খসড়া' থেকে 'একমুঠো', 'পারাপার', 'পালাবদল'-এর যাবতীয় রূপ-রূপান্তরের কথা আছে এখানে। প্রবন্ধটির নাম ও দিয়েছেন তাই 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল।

বুদ্ধদেবের মতে আধুনিকতার যাবতীয় লক্ষ্য ছড়িয়ে আছে অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। আধুনিক কবির শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি কবিতার আসরে এসেছেন। 'খসড়ায়' কবির বিশেষত্ব ছিল দৃষ্টি

ভঙ্গি'র বহির্মুখিতা, 'একমুঠো' তে কবির এই বিশেষত্বকেই তিনি বলেছেন 'সর্বদেশীয়'।[৮০] বর্ষা বিষয়ক কবিতা লেখায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে "আধ্যাত্মিক কবি তিনি।"[৮১] তাঁর কাব্যে বিচিত্র প্রসঙ্গের জটিলতার মধ্যেও আছে এক বিরাট সংগতি। বাংলাভাষায় প্রেমের কবিতা রচনায় তাঁর স্থান বিশিষ্ট। দুঃখের কথা, বেদনার কথার মধ্যেও কখনো কখনো কৌতুক সৃষ্টি করেছেন তিনি। চার মহাদেশ - জোড়া তাঁর কাব্যের পটভূমি।[৮২] তাঁর রচনায় দৈহিক প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। 'রক্ত মাংসের সংক্রাম সবচেয়ে"[৮৩] কম তাঁর কবিতায়।

কলাকৌশলের দিক থেকে তিনি অনেকদূর অগ্রসর কবি। তাঁর কবিতায় ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সার্থক হয়েছে। তাঁর কবিতার উপমা রূপকগুলি আধুনিক মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁর কবিতার পরিভাষাও এযুগের। ভাষার ব্যবহারে তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে, ভাষাগত কিছু ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেছেন বুদ্ধদেব।

ক) 'পারাপার' ও 'পালাবদলে'র কবিতায় তল প্রত্যয়ের ব্যবহার পৌণঃপুনিক।[৮৪]

খ) কোথাও কোথাও 'স্মরণী', 'আনন্ত', 'আনন্তিক' প্রভৃতি অভিনব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।[৮৫]

গ) 'ধ্যানতা', 'পুণ্যতা', 'সংসর্গতা' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োজনও 'ধ্যান', সংসর্গ', 'পুণ্য' দিয়ে চলতে পারে।

তাহালেও, বিষয়গত ও ভাষাগত দিক থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তী আধুনিক। তিনি আত্মসচেতন কবি। এই আত্মসচেতনতা আধুনিকতার-ই লক্ষণ। আধুনিকতার বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রূপায়িত হয়েছে তাঁর কবিতায়।

বুদ্ধদেব বসুর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমিয় চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত কাছের মানুষে ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছিলেন।[৮৬]

> নবজাতক' কাব্য -গ্রন্থনের ভার অমিয়চন্দ্রের উপর-ই দিয়েছিলুম।
> নিশ্চিত ছিলুম, কারন দেশবিদেশের সাহিত্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর
> সঞ্চরণ।[৮৭]

তিনিও মনে করেন, এদেশের কবিতায় বিদেশের আবহ লক্ষণীয় মাত্রা পেলো অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায়। অমিয় চক্রবর্ত্তীর মেজাজের সঙ্গে হপকিন্সের মেজাজের মিল লক্ষ্য করে দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন -

> উভয় কবিই উচ্ছাস অপছন্দ করেন ... প্রয়াস চিহ্নহীন আত্মসমাহিত
> সারল্যের দিব্য বিভাই তাঁদের কাব্যের সম্পদ।[৮৮]

প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে এই দুই কবির-ই আস্থা ছিলোনা। সুইনবার্ণের অতিকথন দোষ থেকে কাব্যের উদ্ধারের জন্য হপ্‌কিন্স যেমন ছন্দের নব নব শৈলী আবিষ্কার করেছিলেন ও ব্যাকরণ বিভ্রাট ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রানুসরণ থেকে বাংলাকাব্যের মুক্তির জন্য অমিয় চক্রবর্ত্তীও তেমনি করেছেন।[৮৯] অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় 'স্বেচ্ছাকৃত শব্দার্থবিপর্যয় কে তিনি আধুনিক বাংলাকাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত

করেছেন। তবে, দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' - এর প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ সালে, তাঁর বহু পূর্বে ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেই অমিয় চক্রবর্ত্তী বিষয়ে বুদ্ধদেবের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। অমিয় চক্রবর্ত্তী যে নিয়মিত ছন্দের বাইরে গিয়েও কবিতা লিখেছেন, একথা বুদ্ধদেব-ই প্রথম বলেছেন। তিনি-ই প্রথম অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অসম পংক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন, অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় আছে সংশয়ের দোটানা। বারংবার বিশ্বাসের শৈথিল্য তাঁর অন্তরের এই গভীরতর উপলব্ধিকে দোলায়িত করেছে।[৯০] - এই সংশয় দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন, বেদনা - বিক্ষোভের আলোড়ন ও অস্থিরতা, এই গভীর অশান্তি আধুনিক যুগোত্থিত। এই লক্ষণ অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একথা যেমন দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন, বুদ্ধদেব তারও আগেই অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতার এই বিশেষত্বকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছেন।

। ৮ ।

সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭) প্রবন্ধে সমর সেনের স্বাতন্ত্র্য, অভিনবত্ব ইত্যাদির সঙ্গে সমর সেনের কয়েকটি কবিতার স্বরূপ স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। এবং বাংলা সাহিত্যে 'কয়েকটি' কবিতা'র স্থান নির্ণয় করেছেন তিনি। এর মধ্যেই সন্ধান করেছেন তার পরবর্তী পালাবদলেরও ইশারা।

বুদ্ধদেবের মতে, সমর সেনের কবিতায় একধরনের বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। এই বিদ্রোহ বিশেষতঃ রীতির দিক থেকে।[৯১] তাঁর কবিতা কেবল গদ্যে রচিত। তাঁর গদ্যচ্ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়। কবিদের প্রথানুগ সৌন্দর্য সাধনায় সমর সেন ব্যতিক্রম। সমকালীন সমাজশক্তির ক্ষয়, অবক্ষয়, দুর্বলতা, পঙ্কিলতা, ব্যভিচার - এসবের ফলে, ক্রমাগত মানবজীবনের ভারসাম্যহীনতার দ্রষ্টা তিনি। এসব উপেক্ষা করে, স্থানিক ও সাময়িক ঘটনায় দৃক্‌পাত না করে জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে গুরুত্ব দিতে পারেননি কবি। পারিপার্শ্বিক জীবন ও প্রতিবেশের উদ্দাম ব্যভিচার ও বিকৃতি কবিকে পীড়িত করেছে। এই বিকৃতির ফলে, তাঁর কবিতার লক্ষণ হিসেবে বড় হয়ে উঠেছে এক অসুস্থতাবোধ। কখনো বা আধুনিক নগর জীবনের প্রায় অনুপুঙ্খ ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। এতে কবির শক্তি ও পরিণতির স্তর খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সময়ের রঙ ধরা পড়েছে কবির কাব্যে। 'কয়েকটি কবিতা'র মধ্যেই তিনি একটি পালাবদলের আভাস খুঁজে পেয়েছেন। এই কাব্যে বিষন্ন নাবিকের গানে তিনি সেই মোড় ফেরার সূচনা লক্ষ্য করেছেন। 'কয়েকটি কবিতা' আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। বুদ্ধদেব নিজে একে 'কাল প্রভাবে কিছু বেশী আধুনিক'[৯২] বলেছেন। আধুনিক যুগের ক্লান্তি, অবসাদ, ক্ষয় অনেক বেশী ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়। কবি হিসেবে বুদ্ধদেব এই আধুনিকতার বিকার, বিকৃতি ও অবক্ষয়ের দ্রষ্টা। সমালোচক হিসেবে এই ক্ষয়শীল আধুনিকতার নিরীখে সমর সেনের কবিতার বিচার করেছেন।

'কবিতা' পত্রিকায় সমর সেনের কবিতা প্রথম প্রকাশিতা হ'লে বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৩৫ সালের

তরা অক্টোবর (শান্তিনিকেতন থেকে) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> সমর সেনের কবিতা কয়টিতে রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য
> প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এর লেখা ট্যাঁকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।[৯৩]

সমর সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কয়েকটি' কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। একটি চিঠিতে[৯৪] সমর সেন কবিগুরুর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। 'কয়েকটি কবিতা' প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত জানা যায়নি। তবে, সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ' বেরোবার পর ১১.০৩.৪০ তারিখে লেখা সমর সেনের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন —

> তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে, সে
> আমরা অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারনের কাছে এর ম্যাপ এখনো
> স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি। সুতরাং এখানে তোমার আসন অল্প
> লোকের কাছেই স্বীকৃত হ'তে বাধ্য।[৯৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, সমর সেনের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যে আশা পোষণ করতেন, তা পূর্ন হয়নি। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার যে সংকলন প্রকাশ করেছিলেন, তাতে সমর সেনের কবিতা সংকলিতও হয়নি। কিন্তু 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় 'নবযৌবনের কবিতা' নাম দিয়ে 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা লিখলেন।[৯৬] এবং তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থেই শক্তি ও পরিণতির স্তর খুঁজে পেলেন।

সমরসেন সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সমর্থন মেলে অন্য সমালোচকদের বক্তব্যে। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন

> The second fact about Samar Sen's pieces is the newness of their
> mood and content.[৯৭]

তিনি বলেছেন —

> Today, therefore, Samar Sen is an up-to-date representative poet.[৯৮]

বুদ্ধদেবের ভাষায় 'শহরের কবি', 'কলকাতার কবি' সমর সেন। মহাশ্বেতা দেবী লিখেছিলেন - "মানসিকতায় অসম্ভব রকম খাঁটি আর্বান মানুষ" তিনি। আবার, বুদ্ধদেব যেমন সমর সেনের কবিতার হতাশা-নৈরাশ্য-অবক্ষয় ক্লান্তির মধ্যে একটা উত্তরণের আলোকবর্তিকা দেখেছিলেন-তেমনি শঙ্খঘোষ ও লিখেছেন —

> .... তাঁর কবিতা নিছক 'ডেকাডেন্স' এর বিমর্ষতা থেকে উত্তীর্ণ
> হয়ে আসে, সেইটে আছে বলেই স্তব্ধ রাত্রের একাকিত্বের মধ্যেও
> আশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তাঁর কবিতার বিরহী নায়ক.... ।[৯৯]

তাহলেও, সমর সেনের কবিতায় আধুনিক জীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, শূন্যতা - এক বিরাট নেতিবাদ জায়গা জুড়ে আছে।

নেতির বর্নহীন শূন্যতায় বাস করে অস্তিত্ব ও সদর্থকতা সম্বন্ধে সে
হয়ে ওঠে আদ্যোপান্ত সংশয়ী।[১০০]

অনিশ্চিত, অনিকেত, ক্লান্ত, বিষন্ন দিন-রাত্রি - শূন্যগর্ভ 'না' এর জগৎ তাঁর কবিতার মূল প্রসঙ্গ। মাঝে মাঝে —

জাহাজের অদ্ভুত শব্দ, মাস্তুলের দীর্ঘ রেখা যদিও কোনো হতত্তরদূর
দিগন্তের দিকে আহ্বান জানায়, তবু, সচেতন জ্ঞানপাপী মন জানে,
কোনো মহত্তর দিগন্ত নেই। দূর সমুদ্র থেকেও যে গান ভেসে আসে,
সে বিষন্ন নাবিকের গান, বা নাবিকের বিষন্ন গান।[১০১]

বুদ্ধদেব বসুও মনে করেছিলেন -

রোমান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোমান্টিক হ'তে পারেননি
ব'লে সমরসেন দীর্ঘশ্বাস ফেঁলেছিলেন 'কয়েকটি কবিতা'য়।[১০২]

কেননা,

এই কবির অবিকল চৈতণ্য জানে বিষন্নতাই, নিঃসঙ্গতাই অনিবারনীয়
পরিণাম-পরিণাম নিরাশা।[১০৩]

তাই, বারবার ফিরে আসা এই বিষন্নতার বোধ, ক্লান্তি সংশয় আধুনিক সময়-স্বভাবকেই মূর্ত করে তোলে। সমর সেন প্রবলভাবেই আধুনিক কবি। বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় সমর সেনের কবিতার এই বিশেষ দিকটির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বুদ্ধদেব-পরবর্তী সমালোচকবর্গের বক্তব্যও তাঁর সমালোচনার পরিধির বাইরে যেতে পারেনি।

। ৯ ।

বিষ্ণুদে বিষয়ক একটি মাত্র প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু। প্রবন্ধটির নাম 'বিষ্ণুদে ঃ চোরাবালি' (১৯৩৮)। এটি মূলতঃ পুস্তক সমালোচনা। চোরাবালি 'কাব্যগ্রন্থে বিষ্ণুদে'র অসাধারন দক্ষতার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব। 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতটির স্থান নির্ণয় করেছেন বর্তমান বাংলাসাহিত্যে। কবি হিসেবে বিষ্ণুদের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

'পরিচয়' - পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত বিষ্ণুদে'র 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতাটিকে তিনি একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলেছেন। তাঁর মতে এই কবিতা কেবল বাংলাভাষাতেই নয়, পৃথিবীর যেকোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয়।[১০৪] 'ঘোড়সত্তয়ার' কবিতায় ধ্বনির উত্থান - পতন, অনিয়মিত মিল, আকস্মিম অনুপ্রাস, নাট্য ও গীতির মিশ্রণ ইত্যাদি গুণের জন্য —

পুরো কবিতাটি জটিল ও গম্ভীর সংগীতের মতো মনের মধ্যে
হানা দিতে থাকে।[১০৫]

এছাড়া, এই কবিতাটি বোঝার জন্য পৃথক প্রযত্নেরও দরকার হয়না। এটি এই কবিতার অন্যতম গৌরব। বিষ্ণুদে'র 'ওফেলিয়া', 'ক্রেসিডা' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে তিনি বলেছেন ধ্বনি-নির্ভর, এদের কাছে অর্থের প্রত্যাশা নেই। শুধুমাত্র ধ্বনির উপর বিষ্ণুদের স্বচ্ছন্দ প্রভুত্বের জন্য বাংলা কাব্যজগতে বিষ্ণুদে'র আসন স্থায়ী হ'তে পারে বলে মনে করেন তিনি।

'চোরাবালি'র কবি হিসেবে বিষ্ণুদে'র শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতা ও শৈথিল্যের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। যেমন পয়ার রচনায় বিষ্ণুদের কৃতিত্ব অনেক কম। 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেবের বক্তব্য -

> যেকোনো অবস্থাতেই একটি কাব্যগ্রন্থ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ পরিচয়
> বহন করে - তাকে কেউ হাতে ধ'রে নিয়ে এসে সভায় বসিয়ে দিয়ে
> গেলো এটা কাব্য-প্রেমিকের কাছে বাহুল্য ব'লে বোধ হয়।[১০৬]

বিষ্ণুদে'র কাব্যে ব্যবহৃত অত্যধিক অপ্রকলিত, দুর্বোধ্য কিছু শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গেও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। 'ক্রতুকৃতম্', 'অপাপবিদ্ধমস্নাবির', 'সোৎপ্রাসপাশ'[১০৭] ইত্যাদি কথাগুলোর জমকালো আওয়াজ প্রীতিকর হলেও, এ জাতীয় শব্দ অভিধান দেখার অন্তরায়। সাধারণ অভিধানে এসব শব্দ সবসময় পাওয়াও যায়না। ফলে, পাঠক এসব শব্দে বিভ্রান্ত হতে পারেন। সমকালীন অন্য কবিদের তুলনায় বিষ্ণুদে-র প্রতি তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট কম। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছিলেন যে, বিষ্ণুদে-র অল্প বলার চাতুরী তাঁকে মুগ্ধ করে।[১০৮] বিষ্ণুদে সমালোচনায় তিনি নিজেও যেন সেই আর্ট বজায় রেখেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকবিতায় একজন প্রধান কবি বিষ্ণুদে। তাঁকে রবীন্দ্রোত্তর অন্যতম "মূলাধার কবি"[১০৯] ও বলা হয়। তিনি বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। কিন্তু জীবনদর্শনে তাঁদের সঙ্গে আছে মেরুপ্রমাণ ভিন্নতা। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে তিনিও বুঝেছিলেন - রবীন্দ্র-অনুসরণে এর মুক্তি নেই। তাহলেও, বুদ্ধদেব তাঁর সম্পর্কে মিতবাক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুদে-র 'রাজায়-রাজা' প্রবন্ধটি। বুদ্ধদেবের প্রতি বিষ্ণুদে-র প্রতিকূল মনোভাবের পরিচয় আছে এখানে। তাছাড়া, বিষ্ণুদে-র 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্যে' প্রবন্ধে ও বুদ্ধদেবের প্রতি বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন বিষ্ণুদে। যে কারনেই হোক, সমকালীন এই কবি সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

> আপনার কোনো কোনো কবিতা আমি ভালো বুঝতে পারি না।[১১০]

তবে, বুদ্ধদেবের বক্তব্য একেবারে অভিনব নয়। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বিষ্ণুদে কে লিখেছিলেন—

> তোমার নতুন লেখা বইখানি পড়তে চেষ্টা করিনি, তা ঠিক নয়।
> কিন্তু তোমার রচনাকে এমন দুর্ভেদ্য কেল্লায় বাসা দিয়েছো যে,
> আমার মন দেয়ালে ঠেকেই ফেরে।[১১১]

১৯৩৫ সালে 'কবিতা' পত্রিকা বেরোবার পর, এই বছরের ৩রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও তিনি লিখেছেন —

> বিষ্ণুদে-র কবিত্বশক্তি আছে, কিন্তু তাঁকে মুদ্রাদোষে পেয়েছে,
> সেটা দুর্বলতা। বিদেশী পৌরাণিক বা ভৌগোলিক উপমা কোনো
> বিশেষ কবিতার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতায় আসতেও পারে, কিন্তু, এগুলি
> প্রায়-ই যদি তার রচনায় পরিকীর্ণ হয়ে আচমকা হুঁচট লাগাতে থাকে,
> তবে বলতেই হবে, এটা জবরদস্তি।[১১২]

বুদ্ধদেব তাঁর সমালোচনায় বিষ্ণুদে-র এই মুদ্রাদোষের কথা অবশ্য বলেন নি।

আসলে, বিষ্ণুদে তাঁর কাব্যে বিশ্বসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক বহু প্রসঙ্গ আপন ভাবনা প্রকাশের আধার রূপে ব্যবহার করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে এই সাঙ্গীকরণ অভিনব। বিষ্ণুদে-পূর্ববর্তী অন্য কোনো কবিই এই নির্মিতির কথা ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথও নন। এই অনর্জিত সংস্কার এবং কাব্যপাঠে বিশ্বসাহিত্য সাঙ্গীকরণের অনভ্যাস বিষ্ণুদে বিষয়ক এরকম সমালোচনার একটি কারণ হতে পারে। বিষ্ণুদে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের লেখা নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বিষ্ণুদে-র কবিতা পাঠে অথবা বিষ্ণুদেকে বোঝার পক্ষে খুব সহায়ক হতে পারেনি।

। ১০ ।

সুকান্ত সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। 'কবিতা' দ্বাদশবর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৫৪) 'সুকান্ত' প্রথম প্রকাশিত হয়।

সুকান্তের কবিতা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন - 'মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের কিশোর সুকান্তের কবিতা দেখে বুদ্ধদেব বিস্মিত হয়েছিলেন।[১১৩] তাঁর এই বয়সের কবিতাগুলিই পরে 'পূর্বাভাস' কাব্যে ছাপা হয়েছিলো। সুকান্ত সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য

> সে একটি ভালো লাইন লিখলে উৎসাহ পেয়েছি নিজের কাজে।
> ... ছন্দে ভুল নেই, হাতের লেখা সুন্দর, যা বলতে চায় স্পষ্ট
> ক'রেই বলে।[১১৪]

একজন কবির পক্ষে এগুলি বিশেষ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা নাহলেও এত কম বয়সী কিশোর কবির পক্ষে এসবই উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে বুদ্ধদেবের। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নামের আদ্যক্ষরে যেমন মিল আছে, তেমনি,

> .... কী প্রসঙ্গে , কী আঙ্গিকে, কী অঙ্গীকারে পদাতিকের একান্ত
> অনুগামী সে।[১১৫]

রাজনৈতিক পদ্য লিখে নিজের শক্তির অপচয় করেছে সে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও রাজনৈতিক

মতবাদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা ছিল। সুকান্তের ক্ষেত্রে —

তা হয়ে উঠেছিলো সুচিন্তিত দাসত্ব।[১১৬]

অথচ, তাঁর কবিত্বশক্তি ছিলো। অনেক উদ্দেশ্যহীন কবিত্বময় পংক্তি তিনি লিখেছেন। পরে, তিনি শুধু-ই রাজনৈতিক মতাদর্শ-প্রধান কবিতা লিখেছেন। সামাজিক শাসন - শোষণ, শাসক-শাসিতে সম্পর্ক তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। 'সিগারেট', 'রাণার', 'সিঁড়ি', 'কলম' তাঁর এই মনোভাবের প্রতীক কবিতা। এগুলিও কবিতাই। কিন্তু, বুদ্ধদেব এর চেয়ে ভালো কবিতার আভাস পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। সম্ভাবনা রূপায়িত হওয়ার আগেই সুকান্ত উৎসর্গ করলেন নিজেকে। বুদ্ধদেবের ভাষায়—

কোনো মতাবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, শক্তিশালী কবির ও
কীরকম অপমৃত্যু ঘটে, তারই উদাহরণ সুকান্ত।[১১৭]

তাঁর কবিত্বে কুঁড়ি ধরেই ঝ'রে গেলে। সুকান্ত সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য —

কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হ'তে পারার
আগেই মরলো সে।[১১৮]

তাই তিনি তাঁর দ্বিগুণিত দুঃখও প্রকাশ করেছেন 'সুকান্ত' প্রবন্ধে।

সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য[১১৯] এই তরুণতম কবি কিশোরের মৃত্যুর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের অকালমৃত কবি কীটসের তুলনা করেছেন। অসহনীয় দারিদ্রের জন্য সুকান্তের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন চ্যাটারটনের। তিনি লক্ষ্য করেছেন সুকান্তের মধ্যে এক 'অপূর্ব-বস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'[১২০]। সুকান্তকে তিনি 'আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম জনগণের কবি'[১২১] বলেছেন। বুদ্ধদেব বসু জনগণের কবি হিসেবে প্রথমতঃ 'পদাতিকে'র কবিকেই চিহ্নিত করেছেন। সুকান্ত কে বলেছেন 'পদাতিকে'র 'অনুগামী কবি'।[১২২] বুদ্ধদেবের মতে, কবি হওয়ার বিরাট সম্ভাবনা তাঁর ছিল। সে সম্ভাবনা রূপায়িত হবার আগেই সুকান্ত মারা গেলেন। কিন্তু, জগদীশ ভট্টাচার্য এই কিশোর কবির রচনার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন - এ যুগের প্রধান তিনটি চিত্তবৃত্তির প্রকাশ।[১২৩] দেখেছেন - ১) জনজীবন চেতনা ২) সমপ্রাণতা ৩) শুভকর্ম প্রেরণার কবি কে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —

জীবনের অভিজ্ঞতাকে ক্ষমতায় বেঁধে সুকান্ত যখন কবিতার
বিদ্যুৎশক্তিকে কল-কারখানায়, খেতে, খামারে, ঘরে ঘরে সবে
পৌঁছে দিতে শুরু করেছে ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে
গেল। আরম্ভেই সমাপ্তির এই শোকে বাংলাসাহিত্য চিরদিন
দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।[১২৪]

তাঁর আরেকটি বক্তব্য —

সুকান্তর যেসব কবিতা প'ড়ে আমরা চমকাই, সুকান্তের পক্ষে
সেসবই আরম্ভ মাত্র।[১২৫]

তবু, বুদ্ধদেবের মতো, একথা বলতেই হবে যে, এই কিশোর কবি তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত জীবনে যে অসামান্য কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার পূর্ণতা দেখা গেলোনা। সময় পেলেন না কবি। বাংলা কবিতার চিরাচরিত পথ থেকে দূরে এসে কবিতার মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র। পূর্ববর্তী সমরসেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়-ই একটা নতুন মূল্যবোধ ও চেতনা কাজ করতে শুরু করেছিলো। গণমনের সুর তাঁরাও ধরেছিলেন। কিন্তু, শুধু মাত্র গণ-চেতনার বাণী সম্বল করে, জ্ঞান- বিজ্ঞানের পথ না মাড়িয়ে সুকান্ত অতি অল্পবয়সেই কবিতায় যে শিল্পসিদ্ধি ঘটিয়েছেন, তা বিরল দৃষ্টান্ত। এদিক থেকে তাঁর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এক অপরিমেয় ক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আধুনিক বাংলা কবিতার একটি পর্বে ব্যক্তি চৈতণ্যের চেয়ে সমাজ-চৈতন্য প্রধান হয়ে উঠেছিলো। সুকান্তের কবিতা এই সমগ্র সমাজ-চৈতণ্যের-ই ধারক। অবশ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় -, "পরিণতির চেয়ে প্রতিশ্রুতির পাল্লাই ভারী"[১২৬] করেছেন তিনি। এদিকে থেকে বুদ্ধদেব-পরবর্তী সুকান্ত সমালোচনাও বুদ্ধদেবের বক্তব্য থেকে খুব দূরবর্তী নয়।

। ১১ ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ও বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ একটি। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ পদাতিক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। অত্যন্ত অল্পবয়সে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি নির্মাণ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সেইসঙ্গে জনপ্রিয় হয়েছেন। কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং লোকপ্রিয়তা অনেকসময়-ই একসঙ্গে দেখা যায়না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বুদ্ধদেব একজন শক্তিমান কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে লিখেছেন -

ক) সুভাষ মুখোপাধ্যায়-ই প্রথম বাঙালি কবি, যিনি প্রেমের কবিতা না লিখে কাব্য-জীবন শুরু করেছিলেন।

খ) প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লেখেননি। যে সমরসেন কে বুদ্ধদেব বলেছেন -

> আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি [১২৭]

সেই সমর সেন-এর প্রথম কবিতাগুলিতে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রেম-প্রকৃতির মধুর সুরভি ছুঁয়ে গেছে।

গ) সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনব কবি। তিনি অভিনব শুধু এই কারনে যে, সমর সেনের পরে এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী ; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, ... সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই জন্য।[১২৮]

ঘ) সময়-স্বতাবের কারনে আধুনিক কবিতার প্রধনা দুটি সুর হয়ে উঠেছিল নৈরাশ্য ও বিদ্রূপ। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সমস্যা সংকটের মধ্যেও নতুন প্রতিশ্রুতির বাণীবাহক। একারণেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় —

ব্যঙ্গনিপুণ হয়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ
দিয়েছে তা আশার উল্লাস।[১২৯]

ঙ) প্রবল বিশ্বাসের বোধ থেকেই তাঁর কাব্যে এসেছে সরলতা। 'পদাতিকে'র কবি কোনোরকম ঘোরপ্যাঁচ না করে বক্তব্যকে সরাসরি পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

চ) 'পদাতিকে'র অনেক কবিতায় একটা উচ্চস্বর, বক্তৃতার ঢং লক্ষ্য করা গেছে।

কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা বলেও তাঁর কণ্ঠস্বর
বিকৃত হয়নি ; যে ছন্দ তাঁর কবিতাগুলোকে দোলাচ্ছে, নষ্ট হয়নি
তার সুমিতি।[১৩০]

ছ) সৎবুদ্ধিসম্পন্ন কবিকে শেষ পর্যন্ত ফিরতেই হয় কবিতার জটিল কলাকৌশল ইঙ্গিত ব্যঞ্জনার দিকে। 'পদাতিকে'ই লক্ষ্যণীয় -

সরলতার পাশাপাশি জটিলতা, নিঃসঙ্কোচ, উচ্চ-ঘোষণার
পাশে-পাশে ব্যঙ্গের চাতুরী, ধ্বনির বিচ্ছুরিত আভা।[১৩১]

জ) সমসাময়িক বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছ থেকে কবিতার পাঠ নিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারো অক্ষরের উপর মকশো-করা নয়।

ঝ) সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব গৌণ। তথাপি 'পদাতিকে'র বিষয়গত বৈশিষ্ট্য হলো - এতে বিষয়'বা বিশ্বাস শুকনো নীতি রূপে পর্যবসিত হয়নি। তাতে সরসতা সঞ্চারিত করেছেন কবি।

ঞ) তাঁর কবিতায় কখনো কখনো সাময়িক প্রসঙ্গ ও 'সংবাদ পত্রের-তথ্যে' এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন বুদ্ধদেব।

.... তথ্যকে আবেগের তাপে গালিয়ে নিয়ে সুভাষ তাকে চিত্ররূপ দিয়েছেন।[১৩২]

চ) তাঁর কবিতার কৃৎকৌশল সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন, তাঁর 'ছন্দের জ্ঞান নিখুঁত'। নতুন ধ্বনি অন্বেষণেও তাঁর ঝোঁক প্রবল। পয়ারে হসন্ত শব্দের ব্যবহারও অভাবনীয়। কবিতার কলাকৌশলে তাঁর দখল অসামান্য। 'পদাতিকে'র মতো ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ কবিদেরও শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

'পদাতিকে' বুদ্ধদেব দেখেছেন দু ধরনের কবিতা —

১। জনপ্রিয় কবি গণ-মনের জন্য লিখেছেন সরল, চড়া গলার কবিতা।

২। অন্যদিকে আছে, জটিল বিন্যাসের সংস্কৃতিবান কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যুগ্ম শক্তির পরিচয় আছে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কবির পক্ষে দুদিক বজায় রাখা চলবে না, একদিক ছাড়তে হবে। জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করা যাঁর কর্তব্য, তিনি তা করবেন, মানুষ ও কর্মী হিসেবে, কবি হিসেবে নয়। যিনি কবি, কবিতার উৎকর্ষই হবে তাঁর সাধনা। হয় কবি, নয় কর্মী হতে হবে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে

তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন - "তিনি কোন পথ বেছে নেবেন ?"

অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কথা মনে রেখেও বলা যায়, মার্কসবাদী সমাজ-চৈতণ্য, গণমনের সুর, হতাশা-নৈরাশ্যের বদলে সাম্যবাদের স্বপ্ন চোখে নিয়ে কবিতার আসরে জায়গা করে, নিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'পদাতিক' এই বিশ্বাস ও স্বপ্নের কাব্য। বিশেষ প্রত্যয়ের কাব্য। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "চিরফুট" এর কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৪১-'৪৬ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বসুদ্ধ কালীন এই সময়ে ভারতবর্ষে দেখা দিল বিয়াল্লিশএর আগষ্ট আন্দোলন, তেতাল্লিশ-এর মণ্বন্তর পঁয়তাল্লিশ-এ নাগাসাকি-হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ। দেশের মানুষের এই বিপদের ঘনঘটা ও তোলপড়ের দিনে 'পদাতিকে'র স্বপ্ন সংগ্রামে রূপ নিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তেজনার দিনগুলিতে তঁর কাব্যেও দেখা দিল বিপ্লবের ভাষা। 'চিরকুট', 'অগ্নিকোণ'-এ এই বিপ্লবের ধ্বনি শোনা গেল। এর পর দীর্ঘদিন কবি নীরব। ১৯৫৮ সালে, অর্থাৎ প্রায় একদশক পরে প্রকাশিত হ'ল তাঁর 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থ। দলীয় রাজনীতির দাবি মেটাতে কবি রচনা করলেন জনতাতোষণ নির্বাচনী ইশ্‌তাহার।[১৩৩] জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

> জীবনের নিগূঢ় প্রেরণা থেকে যাঁর কাব্যের ফুল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে
> ফুটে উঠবে, সেই মহৎ কবিকে রাজনীতির প্রয়োজনে রসনারোচন
> পদ্যরচনায় শক্তি বিনিয়োগ করতে দেখলে আফশোসের শেষ
> থাকেনা।[১৩৪]

কিন্তু এই কাব্যেই নবজন্ম হ'ল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। তাই, বিপ্লবী ও সংগ্রামী কবির কাব্যেও ফুল ফুটুক না ফুটুক বসন্ত এল। "ফুল ফুটুক" কাব্য শেষ হয়েছে আশাবাদে। পদাতিক কবি মাটিতে লীন হওয়ার আগে তাঁর ভালোবাসা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন মানুষের কাছে। বিপ্লব ও স্বপ্নে বিশ্বাসী কবি শেষপর্যন্ত কিন্তু কোনো মতবাদে আর আবদ্ধ থাকতে পারেননি। তাই, সমাজচৈতণ্য ও ব্যক্তিচৈতণ্য কখনো একাকার হয়ে যায়, কখনো বা নিছক ব্যক্তিচৈতণ্যের গভীর থেকে উঠে আসে এক-একটি রূপকল্প। "যতদূরে যাই" কাব্যে আলো-আঁধার, স্বপ্ন - বাস্তবের এক অপূর্ব মেশামেশি জায়গা পেতে থাকে। আর, "এই ভাই", "ছেলে গেছে বনে" - ১৯৭১-'৭২ এর মধ্যে লেখা এই দুই কাব্যে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাংস্কৃতিক সংকটে বিষন্ন কবিকে পাই। জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন -

> কিন্তু পরিণত সুভাষের কাছে পাঠকের আরো কি-এক প্রত্যাশা যেন
> অপূর্ণ রয়ে যাচ্ছে।[১৩৫]

কবির কাছে পাঠকের প্রত্যাশা সীমাহীন ; বিশেষতঃ যে কবির সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ নিবিড়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় মার্ক্সীয় মতবাদে বিশ্বাসী কবি, সাম্যবাদের কবি, বিপ্লব-বিশ্বাস ও প্রতিবাদের কবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কবি, শিল্পী, এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কবি-শিল্পীর অন্তর্গত তাগিদেই তিনি মতাবাদের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে এক চিরন্তন শাস্বত চেতনায় উত্তরিত হয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে তাই মূল্যগর্ভ মনে হয়। কেননা, যিনি প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী, তিনি কোনো মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, - একথা তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন।

। ১২ ।

বুদ্ধদেব তাঁর সমকালীন অপ্রধান কবিদের কবিতা নিয়েও সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। 'নিশিকান্ত ঃ অলকানন্দা' (১৯৪০) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব কবি নিশিকান্ত-এর কৃতিত্বের কথা বলেছেন। তিনি নিশিকান্ত-এর কবিতাকে ধর্মসাধনার ফল ও উপায় হিসেবে না দেখে কবিতা হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন। 'অলকানন্দা'র কবিতাগুলির যথেষ্ট কাব্যমূল্যের কথা তিনি উল্লেখকরেছেন। তাঁর মতে, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয় - এমন জনের কাছেও 'অলকানন্দা'র কবিতা ভালো লাগতে পারে।

বুদ্ধদেবের সমকালীন আর এক কবি দীনেশ রঞ্জন দাশ। বুদ্ধদেব অবশ্য লেখক হিসেবে নয়, সম্পাদক হিসেবে তাঁর গুরুত্বপূর্ন ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। গোকুল চন্দ্রের পরে,

> দীনেশ রঞ্জন 'কল্লোল' কে শুধু যে বাঁচিয়ে রাখলেন তা নয়,
> নানাভাবে পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন।[১৩৬]

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এঁদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'কল্লোলে'র অবদান ছিলো। নজরুলের গজল গানও প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোলে'। মোটকথা, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলাদেশের যে লেখক-শিল্পীরা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই 'কল্লোল'কে অবলম্বন ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন। এদিক থেকে সাহিত্য পত্র হিসেবে 'কল্লোল' এবং এর সম্পাদক হিসেবে দীনেশরঞ্জন দাশ স্মরণযোগ্য।

'কালের পুতুল' প্রবন্ধ গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু অন্নদাশংকর ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমটি হ'লো - 'অন্নদাশংকর ঃ নূতন রাধা' (১৯৪২), অন্যটি, 'পুনশ্চ' (১৯৪৫)। 'পুনশ্চ' প্রবন্ধ অবশ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধের-ই বর্দ্ধিত অংশ। 'পুনশ্চ' নামের মধ্যেই তাঁর ইঙ্গিত আছে। অন্নদাশংকরের 'নূতন রাধা' মূলতঃ তাঁর প্রথম পর্যয়ের কাব্য গ্রন্থ। বুদ্ধদেবের ভাষায় —

> তাঁর কবিজীবনের প্রথম পর্যায়ের অভিজ্ঞান।[১৩৭]

অন্নদাশংকরের কাব্যরীতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন 'একটি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল মনোহর গদ্যরীতির তিনি অধিকারী।'[১৩৮] তাঁর মতে, 'নূতন রাধা' প'ড়ে মনে হয় তাঁর কবিত্বশক্তি যেন গদ্য শক্তির প্রসারের চাপে খানিকটা কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। বুদ্ধদেবের বক্তব্যঃ অন্নদাশংকরের 'নূতন রাধা'য় কাঁচা হাতের ছাপ স্পষ্ট।[১৩৯] 'পুনশ্চ' (১৯৪৫) প্রবন্ধে বুদ্ধদেব জানালেন, 'উড়কি ধানের মুড়কি' লিখে যে অন্নদাশংকর ছড়াকে আবিষ্কার করেছিলেন, এরপর ছড়ার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। ছোটোদের পত্রিকায় প্রকাশিত অন্নদাশংকরের ছড়াগুলিকে বুদ্ধদেব "বয়স্কপাঠ্য" বলেছেন। কারন, কোনো সাধারন শিশু এর পূর্ণরস গ্রহণ করতে পারবে না। অন্নদাশংকরের এই ছড়াগুলির বৈশিষ্ট্য বুদ্ধদেব উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন ছোটো এবং আঁটো সাঁটো ছড়াগুলি "লঘু অথচ অত্যন্ত তরল নয়"।[১৪০] বলেছেন, - এগুলি চটুল হলেও সৌজন্য সম্মত। ছড়াগুলির অপূর্ব কারুকুশলতার কথা বলেছেন বুদ্ধদেব।

দুজন তরুণ মৃত কবির উদ্দেশ্যে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব। কবি দুজন হলেন সুকুমার

সরকার এবং ফাল্গুনী রায়। দুটি প্রবন্ধেই এই দুই স্বল্পায়ু কবির সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব। কবি হিসেবে ফাল্গুনী রায়ের বিশেষত্ব, তাঁর দোষত্রুটি ইত্যাদির সঙ্গে ফাল্গুনী রায়ের কবিতার একটি সামগ্রিক মূল্যায়ণ তুলে ধরেছেন তিনি। অন্যদিকে, কল্লোল যুগের একজন অপ্রধান কবি হিসেবে সুকুমার সরকারের ও একটি নাতিদীর্ঘ মূল্যায়ণ উপস্থাপিত করেছেন তিনি।

ফাল্গুনী রায় সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্য হ'লো —

ক) ফাল্গুনীর কবিতায় তারুণ্যের সমস্ত লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য স্ফুট হয়েছিলো।

খ) পরিণত বয়সে পৌঁছুবার আগেই ফাল্গুনীর মৃত্যু হ'ল ; তাই তাঁর বাল্য রচনাগুলিই বাংলাসাহিত্যে তাঁর পরিচয়ের চিহ্ন বহন করছে।

গ) তাঁর কবিতায় শক্তি ও সম্পদ - দুই-ই আছে।

ঘ) ফাল্গুনীর কবিতার মধ্যে তিনি "জাত-কবি"-র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। ফাল্গুনীর কবিতা পড়লে যথার্থ বোঝা যায় যে, তিনি বাক্-প্রেমিক। কথার প্রেমে আত্মহারা কবি নিজেকে সংযত করতে পারেন না।

৪। ফাল্গুনীর কবিতা অগোছালো, এলোমেলো হলেও এর ভাষার উজ্জ্বলতা প্রাণশক্তিকে প্রকাশ করেছে।

সুকুমার সরকার বিষয়ক প্রবন্ধে কবি সুকুমার সরকারের কবিতার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর জীবন ও কবিতার একটি নিবিড় সংযোগ চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধদেব।

'নতুন কবিতা' শিরোনামে বুদ্ধদেব মনীশ ঘটকের 'শিলালিপি' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। এটি মূলতঃ পুস্তক সমালোচনা হলেও এতে মনীশ ঘটকের কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক যুবনাশ্ব-এর আত্মনাম মনীশ ঘটক। সমকালীন লেখকদের প্রতি বুদ্ধদেব যে সর্বদাই Appreciation ধর্মী সমালোচনা করেননি, মনীশ ঘটকের 'শিলালিপি' সমালোচনা -এর একটি প্রমাণ।

মনীশ ঘটকের কবিত্বশক্তিকে স্বীকার করতে পারেননি বুদ্ধদেব। 'শিলালিপি'র কবিতাগুলি প্রসঙ্গে লিখেছেন কিছু আছে ছন্দে, কিছু আছে গদ্যে, এবং এই দুই রীতি মিলেমিশেই আছে, তাদের আলাদা ক'রে দেয়া হয়নি। তার উপর আবার কোনো কবিতা ব্যঙ্গের, কোনোটি নিছক বর্ণনার, অন্য কোনোটি হৃদয়াবেগের। হৃদয়াবেগ না ব'লে শরীরাবেগ বললেই ভালো হয়, কেননা মীনশবাবুর কবিতার সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্বার, দুর্জয়।[১৪১] বুদ্ধদেব এমনও উল্লেখ করেছেন -

> প্রসঙ্গ নিয়ে কদাচ আমি কলহ করিনে, তবে 'শিলালিপি'তে
> নারী দেহের পৌনঃপুণিক বর্ণনা খানিকটা অপরিণত মনোভাবের
> পরিচয় দেয় ব'লেই একথা বলতে হ'লো।[১৪২]

কবি কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মৈনাক' কাব্যের সমালোচনা বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন 'কবিতা' আষাঢ়, ১৩৪৭ সংখ্যায়। 'মৈনাক' রচনাকালে কামাক্ষী প্রসাদ রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত কবি। বুদ্ধদেব মনে করেন

মৈনাক' বইটির স্বল্পসংখ্যক কবিতাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই তাঁর
খ্যাতিকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করবে।[১৪৩]

কবি হিসেবে কামাক্ষী প্রসাদকে তিনি অনেকটা রোম্যান্টিক মনের অধিকারী বলেই মনে করেন। তাঁর মনে, 'মৈনাকে' সার্থক রচনার সংখ্যাই বেশি। এবং সমস্ত বইটি প'ড়ে সন্দেহমাত্র থাকেনা যে কামাক্ষী প্রসাদ অচিরে আরো বেশি উৎকর্ষের অধিকারী হবেন।

। ১৩ ।

আধুনিক বাংলা কবিতা ও বাঙালি কবিদের সমালোচনায় বুদ্ধদেবের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কবিতার জগতে নতুন কবিদের স্বাগত জানাতে তাঁর প্রচেষ্টা লক্ষণীয় মাত্রা পেয়েছে। 'উত্তরধিকার' পত্রিকায় লেখা হয়েছে —

সমালোচক বুদ্ধদেব বসুকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কবিতায়
নব্যাগন্তুকদের ঠাঁই করে দিয়েছেন তিনি সম্পাদক হিসেবে, প্রতিষ্ঠিত
করে দিয়েছেন সমালোচনা করে।[১৪৪]

বুদ্ধদেবের নিজেরও বক্তব্য —

স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলনা ; ..... আমার
সমকালীন কবিদের গুণকীর্জর আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম।[১৪৫]

তাঁর আগে অথবা পরে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে আর কেউই সমকালীন কবিদের নিয়ে তৎপর হয়ে ওঠেননি। জীবনানন্দ তাঁর 'কবিতার কথা'য় আধুনিক কবি ও কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেও সমকালীন কবিদের প্রতি এতো উৎসাহ দেখান নি। বিষ্ণুদে-র নামোচ্চারণ পর্যন্ত করেননি তিনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দের কবিতা পছন্দ করতেন না। আমিয় চক্রবর্ত্তী বুদ্ধদেবের কবিতা বিষয়ে নিরুৎসাহ প্রকাশ করেছেন।[১৪৬] বিষ্ণু দে-র সঙ্গে বুদ্ধদেবের আদর্শগত বিরোধ ছিল। কিন্তু, বুদ্ধদেব সমকালীন কবিদের একই সঙ্গে 'কবিতা' পত্রিকায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, সেই জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্ত্তী, সমর সেন, এমনকি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল সুকান্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায় - এঁদের সকলের কবিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন বুদ্ধদেব। এঁদের নতুনত্ব, অভিনবত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব স্ফুট করেছেন পাঠকের কাছে। দেখাতে চেয়েছেন এঁরা প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিষয় ও প্রকরণগত দিক থেকে এঁদের পার্থক্য আছে, কিন্তু এঁরা প্রত্যেকে নতুন। জীবনানন্দের কবিতা 'কল্লোলে, প্রথম প্রকাশিত হ'লে, সেখানেই তিনি আধুনিক কবিতার এই বিরাট প্রতিভাকে সনাক্ত করেছিলেন। অবশ্য, জীবনানন্দের শেষ পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলিকে অভিনন্দিত করেন নি বুদ্ধদেব।[১৪৭] আসলে, জীবনানন্দের শেষ পর্বের কাব্যগুলিতে যে ধারা বদলের ইশারা পাওয়া যায়, তাতে জীবনানন্দ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের সামগ্রিক বোধ হঠাৎ-ই যেন

বাধাপ্রাপ্ত হ'লো। ততদিনে কবিতা-মনস্ক পাঠকের কাছে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক গভীরতা ও নতুন কাব্য-অভিজ্ঞতার বিস্তারও ঘটেগেছে। তাঁর আত্মলীনতার মধ্যেই বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছেন তাঁর নিজস্ব শক্তির পরিচয়। কিন্তু, 'সাতটি তারার তিমির', 'বেলা-অবেলা কালবেলা'র কবি সমাজমনস্ক। প্রবল সমাজবোধতাড়িত কবিতা লিখলেন তিনি এই সময়ে।

এই মানসিকতার গড়ন জীবনানন্দের আত্মলীনতা থেকে কিছু পৃথক।[১৪৮]

সমাজ - সংস্পর্শজাত আবেগের যে অভিজ্ঞতা এই সময় রূপ লাভ করেছে জীবনানন্দের কবিতায় বুদ্ধদেব তা মেনে নিতে পারেননি। 'ব্যক্তিগতকেই শুদ্ধ মনে করার প্রেরণা কাজ ক'রেছিলো'[১৪৯] তাঁর মধ্যে। বুদ্ধদেবের কবিতা ও প্রবন্ধাবলী পড়েও ম'নে হয় তিনি কবিতায় প্রেম, বিষাদ, আনন্দ, সৌন্দর্য এবং অন্যান্য আবেগকে যতটা স্পর্শ করতে চান, তত্ত্ব বা চিন্তাভাবনাকে ততটা প্রকাশিত দেখতে চাননা।

একেবারে কাব্য-নাট্যগুলির যুগে এসে বুদ্ধদেব বসুকে আত্মস্থ
করতে দেখা যায় জীবনতত্ত্ব আর জীবন-আবেগের ফলবান মিশ্রণ।
সে অনেক পরের কথা।[১৫০]

একারনেও হয়তো বুদ্ধদেব জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতাগুলির সদর্থক সমালোচনা করতে পারেনি যাহোক, মূলতঃ জীবনানন্দকে পাঠকের সামনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বুদ্ধদেব। চিনিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের 'নির্জনতম' কবিকে, স্বতন্ত্র স্বভাবের কবিকে। কবি নিজেই উচ্চারণ করেছিলেন —

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রা দোষে
আমি একা হতেছি আলাদা ?[১৫১]

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র এই স্বতন্ত্র বোধের কবিকে চিহ্নিত করে বুদ্ধদেব লিখেছেন - 'আমাদের এই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো সময়ের মধ্যে জীবনানন্দ একজন আত্মমগ্ন শিল্পী।'[১৫২] সামগ্রিকভাবে দেখলে বুদ্ধদেবের জীবনানন্দ সমালোচনা যথেষ্টই মূল্যবান।

সমকালীন কবিদের সমালোচনায় বুদ্ধদেব অকৃপণ ছিলেন। তাহলেও প্রশ্ন উঠেছে তাঁর বিষ্ণুদে সমালোচনা নিয়ে। একই সময়ের কবিদের নিয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন 'কেন বিষ্ণুদে নয়, ...।'[১৫৩] এমনও মনে করা হয় যে, নিজেরই সমকালীন কবি বিষ্ণুদে সম্পর্কে বুদ্ধদেবের এই অপেক্ষাকৃত অনাগ্রহের কারন কিছুটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত, কিছুটা বা ব্যক্তিগত। রাজনীতির দিক থেকে বিষ্ণু দে মার্কসবাদে বিশ্বাসী, আর, বুদ্ধদেব সাহিত্যের বিশুদ্ধতায় আস্থাশীল। নন্দন তাত্ত্বিক এই পার্থক্যের জন্যই তাঁর প্রবন্ধ নন্দনতাত্ত্বিক এই পার্থক্যের জন্যই তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহে (ভারবি সংস্করণ, ১৯৬৬) বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ এলোইনা। মার্কসীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল কবিদের তিনি এই সংকলন গ্রন্থে বর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে, উল্লেখ্য মনে করি যে, যেকোনো লেখক বা সমালোচকের নিজের অভিরুচি,

মানসিক ধাঁচ অনুযায়ী পছন্দ অপছন্দ থাকবেই। বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তীর কবিতা বিষয়ে যতটা উচ্ছ্বাসিত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও কম গুরুত্ব দেননি তিনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' প্রকাশিত হলে বুদ্ধদেব 'কবিতা'র পাতায় যে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন, সে সম্বন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজের বক্তব্য —

> পদাতিক'-এর আলোচনা 'কবিতা'য় প্রকাশিত হওয়ার পর
> অনেকেই আশংকা করেছিলেন, অতি প্রশংসায় ছেলেটির মাথা
> ঘুরে যাবে।[১৫৪]

তিনি আরও লিখেছেন —

> নিরুত্তাপ আশ্রয়ের চেয়ে নতুন লেখকদের লেখায় পক্ষে বরং
> স্বাস্থ্যকর ঈষদুষ্ণ প্রশ্রয়।[১৫৫]

নিছক রাজনীতির কারনে তিনি কোনো লেখক শিল্পীর প্রতি কখনো অনুদার ছিলেন না। আজন্ম রোমান্টিক কবি বুদ্ধদেবের অন্তর্গত প্রকৃতির জন্যে তিনি কোনো মতবাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় ননি। তাঁর নিজের মধ্যেও চলেছিলো একটা রূপান্তরের প্রক্রিয়া। কবিতা, জগৎ ও জীবন বিষয়ে তাঁর ধারনাও একটি স্থির বিন্দুতে আটকে থাকেনি। উপলব্ধির পথে তিনি ক্রমাগত উত্তরিত হ'তে চেয়েছেন 'অন্য কোনোখানে'। ক্রমাগত পা বাড়িয়েছেন অনিশ্চিতির পথে। তাঁর এই অতৃপ্তির বোধ থেকেই জীবনের শেষ পর্বে তিনি হয়তো পরিক্রমা করেছেন রামায়ণ - মহাভারত - বাল্মীকির যুগে, প্রাক্-পৌরানিক পুরাকথার বৃত্তে। ব্যক্তি বুদ্ধদেবের এই প্রবণতার জন্যেও তিনি হয়তো একটি স্থির প্রত্যয়ের মধ্যে বাধা পড়েননি। ক্রমাগত বিরোধ - বৈচিত্র্যের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন অভীষ্ট সত্যকে। লক্ষ্য করেছেন কত বিচিত্র প্রবণতা ও সত্যের বিচিত্র গতিমুখ। সমকালীন কবি ও কবিতাসমালোচনার ক্ষেত্রেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য-ই স্পষ্ট হয়েছে। কখনো তিনি সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুদের মতো কবি-ও তাঁদের কবিতা সমালোচনায় বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছেন। আবার, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্ত্তী-র কবিতা-র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন তিনি। রাজনীতি বা কবিতার মৌল প্রেরণাগত পার্থক্য তাঁকে ততটা বিচলিত করেনা। বরং খুঁজে নিতে চান শিল্প হিসেবে তার মূল্যকে। আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু সময়ের মধ্যে এঁরা কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল হয়েছেন - এটি যেমন তিনি লক্ষ্য করেছেন, তেমনি, দেখাতে চেয়েছেন এঁদের ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য কে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার যে বিচিত্র প্রবণতা-ঋদ্ধ একটি স্বতন্ত্র ধারা বাংলা কবিতার ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে ক্ষীণতন্বী হয়ে দেখা দিয়েছিলো, তার গতিপথ প্রস্তুত করলেন। স্বঘোষিতভাবেই উচ্চারণ করলেন যে রবীন্দ্রোত্তর এই কবিরা আধুনিক, আধুনিকতার বিচিত্র লক্ষণ তাঁদের কবিতার শরীরে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র ভূমিকায় লিখেছেন—

> আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো -
> একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে ব্যাপারটাকে
> সমগ্রভাবে দেখতে।[১৫৬]

এই কবিদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ কোনটা তা তর্কের বিষয়। কিন্তু,

> কোনো একটা সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে তাতে সন্দেহ নেই, সেটাকে
> অনুভব করা যায়, ... ।[১৫৭]

অনুভূতিবেদ্য সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থির কোনো বিশিষ্ট নাম উল্লেখ করেননি বুদ্ধদেব। বার-বার শুধু বলেছেন এঁরা স্বতন্ত্র, এঁরা নতুন, এঁরা অভিনব। বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে এই অভিনবত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ থেকে মোড়-ফেরা, একটা বিরাট পালাবদল। নাম দিতে হলে, বলতে হয়, এরই নাম আধুনিকতা।

অন্যান্য সমালোচনা

বুদ্ধদেবের সাহিত্য সমালোচনায় উপরোক্ত চারটি বর্গ ছাড়াও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য লেখক শিল্পীদের নিয়েও তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। 'An Acre of Green Grass' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'Sarat Chandra Chattopadhyay' নামের প্রবন্ধ। ইংরেজী সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক ডিকেন্সের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে তুলনা করেছেন তিনি। ডিকেন্সের মতো, তিনি জনগণের প্রিয় লেখক। এবং এদিক থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের তুলনায়ও খ্যাতির শিখর স্পর্শ করে আছেন। সমস্ত শ্রেনীর পাঠকদের কাছেই তিনি আদরণীয়। 'Sarat Chandra Chattopadhyay' প্রবন্ধে চল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন -

> It would not be strange in Bengal to come upon a man ...
> who has read no books at all except a few of Sarat Chandra's.

'কবিতা' পত্রিকা পৌষ, ১৩৬৩, একবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধটি লিখেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর মতে একশ বছরের কথা সাহিত্যে স্পষ্ট দুটো ভাগ। একদিকে সরল বাস্তবের প্রতি ঝোঁক, অন্যদিকে অতিরঞ্জন, উদ্দেশ্যময় বিকৃতি এককথায় কাব্যধর্মের দিকে আগ্রহ। এই বাস্তবতাবাদে আবদ্ধ হয়ে আছে বাংলা কথাসাহিত্যের অনেকটা অংশ। 'কল্লোল, পত্রিকার মূল মন্ত্র ছিল এই বাস্তবতা। আবার, কোনো কোনো লেখক ভেবেছিলেন কেবল বাস্তবতাবাদে তৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যের এই সময়ে আর্বিভূত হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রচনায় কোনো সচেতন বিদ্রোহ ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'কল্লোলের সর্বশেষ 'পরিপক্ক ফল' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক শক্তিকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে পূর্ববর্তীকালের রচনাগুলিকে কবিত্বগুনে সমৃদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সেখান থেকে প্রথমে বাস্তবতাবাদ পর প্রকৃতিবাদে তাঁর স্থায়ী প্রতিষ্ঠা। এরপর আস্তে আস্তে এমন এক প্রদেশ তিনি দখল করে নেন যেখানে চোর, ভিখিরি, কুষ্ঠরোগ, কেরানি, কেরানির বৌ, প্রত্যেকেই উঠে এসেছে। এই প্রদেশের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তথাপি, বুদ্ধদেবের মতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক চেতনাকে মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা আক্রান্ত হতে দেননি। বিশ শতকের বাংলাদেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তু নিষ্ঠায় দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম।

'কবিতা' পত্রিকা চৈত্র ১৩৫২, একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় নবীনচন্দ্র সেন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছেন বুদ্ধদেব। প্রবন্ধটির নাম 'নবীনচন্দ্র সেন'। কবি নবীনচন্দ্র সেন এককালে বহু পাঠকের হৃদয় জয় করলেও আজ তার নাম বিস্মৃতপ্রায়। এর কারন সন্ধান করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বলেন যে, আজকের দিনে মহাকাব্যের আসন নিয়েছে উপন্যাস। আর তাই, নবীনচন্দ্র কাব্য পাঠকের যে আগ্রহটি পূরণ করতেন তাঁর স্বল্প পরিসর গল্পের মাধ্যমে, আজ তা অবিশ্রান্ত এগিয়ে চলেছে। উপন্যাসের দিনে নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব তাই বুদ্ধদেবের মতে স্মৃতি সঞ্চারী মঙ্গলাচরণ কারণ, এই উৎসব কবি নবীনচন্দ্রের মূল্য নিরূপণে আমাদের সাহায্য করবে।

'কবিতা' পত্রিকা, আষাঢ় ১৩৬৬, বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪ - এ নাট্যকার শিশির কুমার ভাদুড়ী বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, প্রবন্ধটির শিরোনাম 'শিশির কুমার ভাদুড়ী'। প্রবন্ধটির সূচনাতেই তিনি জানান যে, বাংলাদেশে এমন একটি সময় ছিল যখন প্রত্যেকেই বিচিত্র; পরিবর্তনশীল বিষয় নিয়ে ছিলেন উৎসাহিত। কিন্তু শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয় বিষয়ে প্রায় সকলেরই ছিল সীমাহীন উচ্ছ্বাস। তিনি সে সময় প্রায় প্রবাদবাক্যে, রূপকথায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ের প্রথম থেকে শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত কোথাও ছিল না আড়ষ্টতা, আদ্যন্ত ছিল এক সুরে বাঁধা। তবুও তাঁর নাট্যমন্দির টেঁকে নি। এরপর তাঁকে দেখতে পাই রংমহলে, শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি, সেভাবেই মূর্ত করে তোলেন। তবে 'শেষ রচনা', 'যোগাযোগ' এগুলিতে তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তথাপি প্রথম বিশ শতকের বাঙালী জীবনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

এছাড়া, 'কবিতা' কার্ত্তিক ১৩৪৯, অষ্টম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'যোগেশচন্দ্র চৌধুরী' প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। 'কবিতা, চৈত্র, ১৩৬৬, বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩ - এ প্রকাশিত হয়েছে 'রাজশেখর বসু' প্রবন্ধ। 'কবিতা, ১৩৪৯, ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় শিল্পী সোমেন চন্দ তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের বিষয় হয়েছেন। 'কবিতা' চৈত্র ১৩৫৭, ষষ্ঠদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় সম্পাদকীয় বক্তব্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু তাঁর আলোচ্য হয়েছে। এছাড়াও কিছু পূর্ববর্তীকালের অথবা সমকালের লেখক, শিল্পী অথবা তাঁদের রচনার প্রতি আগ্রহ বোধ করেছেন তিনি।

নির্দেশিকা

১। চট্টোপাধ্যায়, শক্তি, 'এলিজিঃ বুদ্ধদেবের স্মৃতির প্রতি', উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পা) ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ১০৩.

২। তদেব, পৃঃ ১০৩

৩। তদেব, পৃঃ ১০৩

৪। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, 'প্রকৃতি ও সংস্কৃতি ' উত্তরাধিকার, নীলিমা ইব্রাহিম (সম্পা) ১৯৭৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ২০১.

৫। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২১.

৬। তদেব, পৃঃ ১০৩।

৭। দত্ত, অজিত, 'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২৪.

৮। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'আমাদের ঋণ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ২৪.

৯। চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষী প্রসাদ, কবিতার সাত বছর, বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা), কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮ পৃঃ ৬৬-৬৭.

১০। তদেব, পৃঃ ৬৭.

১১। তদেব, পৃঃ ৬৮.

১২। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশঃ ধুসর পাণ্ডুলিপি' কালের পুতুল কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৩৩.

১৩। বসু, বুদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা, কলিকাতা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ৭.

১৪। তদেব, পৃঃ ৮.

১৫। তদেব, পৃঃ ৮.

১৬। মজুমদার, মোহিতলাল, কবিশ্রী মধুসূদন, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৬৫, পৃঃ ২৮

১৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'মাইকেল', সাহিত্যচর্চা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল ১৯৫৪ পৃঃ ২৫.

১৮। তদেব, পৃঃ ২৬.

১৯। তদেব, পৃঃ ২৯.

২০। তদেব, পৃঃ ৩২.

২১। তদেব, পৃঃ ৩৮.

২২। Eliot, T.S, Milton I & Milton II, On Poetry and Poets. London, Faber and Faber, 1st published 1957.

২৩। মজুমদার, মোহিতলাল, কবিশ্রী মধুসূদন, কলিকাতা, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৬৫, পৃঃ ২০.

২৪। তদেব, পৃঃ ১৩২.

২৫। তদেব, পৃঃ ১২৩.

২৬। তদেব, পৃঃ ১২০.

২৭। বসু, বুদ্ধদেব, প্রমথ চৌধুরী, 'কবিতা', দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৩ তে প্রকাশিত।

২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী ও বাংলা গদ্য', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৬.

২৯। Bose, Bnddhadev, 'Paramatha Chowdhury', An Acre of Green Grass, Calcutta, Papyrus, 1948. Page -28.

৩০। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ২০.

৩১। Doctor Zivago, Boris Pasternak, New York, Ballantine Books, First edition, March 1981. Page-9.

৩২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের স্বরূপ, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪তম খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃঃ ৫৩০-৫৩১.

৩৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, ৫ম খন্ড, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ ১৩৫২, পৃঃ ১১৭.

৩৪। তদেব, পৃঃ ১৬৯-৭০.

৩৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'প্রমথ চৌধুরী' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ২১.

৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশের স্মরণে', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৬.

৩৭। দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ', ধূসর পান্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, কলিকাতা বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রঃ লিঃ, ১ম সংস্করন, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃঃ ৩৮.

৩৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন,' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৩৮.

৩৯। বসু, বুদ্ধদেব, সম্পাদকীয় 'কবিতা' ১২শ বর্ষ, ১৩৫৩-৫৪ এর আশ্বিন সংখ্যা-

৪০। গুহ, নরেশ, 'ছিলেনা বনের মৃগ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৪২.

৪১। তদেব, পৃঃ ৪৩.

৪২। গুহ, নরেশ, ভূমিকা, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, বুদ্ধদেব বসু, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩, পৃঃ ৭.

৪৩। গুহ, নরেশ, 'ছিলেনা বনের মৃগ', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পা) কলিকাতা, বর্ণালী, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ৪৫.

৪৪। সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী (সম্পাদিত), ঢাকা, মুক্তধারা, ১৩৮৪, পৃঃ ১৩২.

৪৫। তদেব, পৃঃ ৫৫.

৪৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১৩২.

৪৭। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৪৮। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৪৯। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৫০। তদেব, পৃঃ ১৩২.

৫১। সিংহ, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১লা জুলাই,১৯৮৬, পৃঃ ১২৭.

৫২। মজুমদার, মোহিতলাল 'যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', কলিকাতা বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, এপ্রিল ১৯৭৪, পৃঃ ১৪৫।

৫৩। তদেব, পৃঃ ১৫৯.

৫৪। তদেব, পৃঃ ১৬৬.

৫৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার, ভূমিকা, 'শত বর্ষের আলোকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত', সুনীল কান্তি সেন (সম্পাদনা)।

৫৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'নজরুল ইসলাম', কালের পুতুল কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২৫.

৫৭। তদেব, পৃঃ ১২৫.

৫৮. তদেব, পৃঃ ১২৬.

৫৯। Bose, Buddhadev, An Acre of Green Grass. Calcutta, Pupyrus, 1948, Page-52.

৬০। বসু, বুদ্ধদেব, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ১২৯.

৬১। তদেব, পৃঃ ১৩০.

৬২। তদেব, পৃঃ ১৩০.

৬৩। তদেব, পৃঃ ১৩১.

৬৪। খান, আজাহার উদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, ডি.এম. লাইব্রেরী, ১৯৬৯, পৃঃ ৩২৬.

৬৫। মজুমদার, মোহিতলাল, পত্রসংখ্যা-১, মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, আজহার উদ্দিন খান, ভবতোষ দত্ত (সংকলিত ও সম্পাদিত), কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৯, পৃঃ ২.

৬৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,

জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬

৬৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৬৭

৬৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কবি' সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮০

৬৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৪

৭০। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮৯

৭১। বসু, বুদ্ধদেব, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ডিসেম্বর, ১৯৬২, পৃঃ ৮৭

৭২। তদেব, পৃঃ ৮৮

৭৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৭৪

৭৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ ক্রন্দসী', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৯

৭৫। হালদার, নিরঞ্জন (সম্পাদিত) সুধীন্দ্রনাথ, কলিকাতা রামায়নী প্রকাশ ভবন, ১ম প্রকাশ, জুন ১৯৭৫ পৃঃ ২১৭

৭৬। তদেব, পৃঃ ২১৮

৭৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অর্কেস্ট্রা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৬৪

৭৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তীঃ খসড়া', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৪

৭৯। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ একমুঠো', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৬

৮০। তদেব, পৃঃ ৯৬

৮১। বসু, বুদ্ধদেব, 'অমিয় চক্রবর্ত্তীর পালাবদল', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৯৯

৮২। তদেব, পৃঃ ১০৬

৮৩। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮৪। তদেব, পৃঃ ১০২

৮৫। তদেব, পৃঃ ১০১

৮৬। ভাদুড়ি, পিনাকী, উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮৮ পৃঃ ১৫৩

৮৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, নবজাতক, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৬৮

৮৮। ত্রিপাঠী, দীপ্তি, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা, দে'জ পাবলিশিং, আগষ্ট ১৯৫৮ পৃঃ ৩২৮

৮৯। তদেব, পৃঃ ৩২৮

৯০। তদেব, পৃঃ ৩৬৭

৯১। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃ কয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৫৭

৯২। তদেব, পৃঃ ৫৮

৯৩। বসু, বদ্ধদেব, 'রবীন্দ্রনাথের চিঠি ঃ বদ্ধদেব বসুকে', বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ ১৩৮৪ পৃঃ ৫৮৩

৯৪। সমর সেনঃ বিশেষ সংখ্যা, অনুষ্টুপ, সংকলিত চিঠি, সম্পাদক পুলক চন্দ, ১৯৮৮

৯৫। অনুষ্টুপ, সমরসেনের বিশেষ সংখ্যা, ১৯৮৮, দ্বাবিংশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক পুলক চন্দ,

৯৬। বসু, বুদ্ধদেব 'নবযৌবনের কবিতা', 'কবিতা' (সম্পাদিত), আষাঢ় ১৩৪৪, দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৫১-৬০

৯৭। Mukhopadhaya, Dhurjatiprasad, 'A Modern Poet but not Progressive',অনুষ্টুপ, সমর সেন ঃ বিশেষ সংখ্যা, পরিশিষ্ট- পৃঃ ১২

৯৮। তদেব, পরিশিষ্ট - পৃঃ ১৪

৯৯। ঘোষ, শঙ্খ, নিঃশব্দতার ছন্দ, অনুষ্টুপ, সমর সেন, বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ১৪

১০০। সিকদার, অশ্রুকুমার, মূল্যায়ণ প্রসঙ্গঃ সমর সেনের মদন ভস্মের প্রার্থনা, কলমের ফ্রন্ট, বিশেষ সমর সেন সংখ্যা, বর্ষ - ৮, সংখ্যা -৯, পৃঃ ৩৪

১০১। তদেব, পৃঃ ৩৬

১০২। বসু, বুদ্ধদেব, নতুন সংস্করণের ভুমিকা, কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯.

১০৩। সিকদার, অশ্রুকুমার, মূল্যায়ণ প্রসঙ্গঃ সমর সেনের মদন ভস্মের প্রার্থনা, কলমের ফ্রন্ট, বিশেষ সমর সেন সংখ্যা, বর্ষ - ৮, সংখ্যা - ৯, পৃঃ ৩৬।

১০৪। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

১০৫। তদেব, পৃঃ ৭৬

১০৬। তদেব, পৃঃ ৭৮

১০৭। তদেব, পৃঃ ৭৯

১০৮। বসু, বুদ্ধদেব ভূমিকা 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (সম্পাদিত) কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স

প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৫৪ পৃঃ ছয়।

১০৯। মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, একালের বাংলা কবিতাঃ নিবিড় পাঠ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯২

১১০। বসু, বুদ্ধদেব, 'বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ. পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯, পৃঃ ৪৩

১১১। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২, পৃঃ ১৭ (বিষ্ণু দে কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি।)

১১২। বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, তৃতীয় খন্ড, রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বুদ্ধদেবকে লেখা,কলকাতা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, ১ম সংস্করণ -১৩৮৪ পৃঃ ৫৮৩

১১৩। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ভুমিকা সুকান্ত সমগ্র কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৪

১১৪।বসু, বুদ্ধদেব, 'সুকান্ত', 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদনা),১২ শ বর্ষ, ১৩৫৩-৫৪ সংস্থা পৃঃ ২৪৬-২৪৭

১১৫। তদেব, পৃঃ ২৪৭

১১৬। তদেব, পৃঃ ২৪৮

১১৭। তদেব, পৃঃ ২৫০

১১৮। তদেব, ২৫১ পৃঃ

১১৯। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩৩৯

১২০। তদেব, পৃঃ ৩৪০

১২১। তদেব, পৃঃ ৩৪১

১২২। বসু , বুদ্ধদেব, 'সুকান্ত' , 'কবিতা', বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত),১৩৫৩-৫৪ সংখ্যা, পৃঃ ২৪৭

১২৩। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩৩৯

১২৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, ভুমিকা, সুকান্ত সমগ্র, কলকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৭৪

১২৫। তদেব, ভূমিকা

১২৬। তদেব, ভূমিকা,

১২৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'সমর সেন ঃকয়েকটি কবিতা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশাস প্রাঃ লিঃ,পৃঃ ৬০

১২৮। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ঃ পদাতিক' কালের পুতুল , কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুযারী ১৯৫৯

১২৯। তদেব, পৃঃ ৮২

১৩০। তদেব, পৃঃ ৮৪

১৩১। তদেব, পৃঃ ৮৪

১৩২। তদেব, পৃঃ ৯০

১৩৩। ভট্টাচার্য, জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কবি, কলকাতা, ভারবি, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ পৃঃ ৩০৩

১৩৪। তদেব, পৃঃ ৩০৪

১৩৫। তদেব, পৃঃ ৩২৫

১৩৬। বসু, বুদ্ধদেব, 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯

১৩৭। বসু, বুদ্ধদেব, 'অন্নাদাশঙ্করঃ নূতন রাধা', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ১১৪

১৩৮। তদেব, পৃঃ ১১৪

১৩৯। তদেব, পৃঃ ১১৫

১৪০। বসু, বুদ্ধদেব, ' পুনশ্চ,' কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ. এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ জানুযারী ১৯৫৯, পৃঃ ১১৮

১৪১। বসু, বদ্ধদেব, 'নতুন কবিতা,' কবিতা আশ্বিন ১৩৪৬ - আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৫

১৪২। তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮

১৪৩। বসু, বুদ্ধদেব, 'নতুন কবিতা', কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৭, পৃঃ ৪৭

১৪৪। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, উত্তরাধিকার, নীলীমা ইব্রাহিম (সম্পাদিত), ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪ এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃঃ ৯৪.

১৪৫। বসু, বুদ্ধদেব, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত', সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ৯৪.

১৪৬। দাশ গুপ্ত, প্রণবেন্দু, 'বুদ্ধদেব বসু, রুচি ও শিক্ষা', বুদ্ধদেব বসুঃ নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, বর্ণালী মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ১১৫.

১৪৭। বসু, বদ্ধদেব, সম্পাদকীয়, 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৫৩,

১৪৮। চক্রবর্ত্তী, সুমিতা, 'বাংলা কবিতাঃ জীবনানন্দের উত্তরাধিকার', জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৭, পৃঃ ১৬৬.

১৪৯। তদেব, পৃঃ ১৬৭.

১৫০। চক্রবর্ত্তী, সুমিতা, 'জীবনানন্দের কবি সমালোচকরা', জীবনানন্দ ঃ সমাজ ও সমকাল, কলিকাতা, সাহিত্যলোক, ১ম সংস্করণ, মার্চ ১৯৮৭, পৃঃ ১৩১.

১৫১। দাশ জীবনানন্দ, 'বোধ', ধূসর পান্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ, ১ম খন্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃঃ ৭০.

১৫২। বসু, বদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে', কালের পুতুল, কলিকাতা, নিউ.এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ১৯৫৯ পৃঃ ৫৬.

১৫৩। মুখোপাধ্যায়, পবিত্র, কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, অন্বেষা, কলিকাতা, ১৯৮১

১৫৪। মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, 'শাপভ্রষ্ট দেবশিশু', বুদ্ধদেব বসু ঃ, নানা প্রসঙ্গ, আনন্দ রায় (সম্পাদনা), কলিকাতা, বর্ণালী মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ২০.

১৫৫। তদেব, পৃঃ ১৬৭.

১৫৬। বসু, বদ্ধদেব, ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পাদিত) কলিকাতা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১ম সংস্করণ মার্চ ১৯৫৪, পৃঃ ছয়.

১৫৭। তদেব, পৃঃ আট-নয়।